বিনয় ঘোষ

বাংলার বিদ্বৎসমাজ

বাংলার বিদ্বৎসমাজ

বাংলার বিদ্বৎসমাজ

বিনয় ঘোষ

প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৪৮

প্রকাশক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন। কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট

শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত

মুদ্রক

লীলা ঘোষ

তাপসী প্রিণ্টার্স

৩ শিবু বিশ্বাস লেন। কলিকাতা-৬

'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' দ্বিতীয় সংস্করণ আরও অনেক আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য বইয়ের কাজের চাপে এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য তা যথাসময়ে করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য আমি দুঃখিত এবং আগ্রহী পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

বর্তমান 'দ্বিতীয়' সংস্করণে অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করা হল। বিভিন্ন অধ্যায়ের পাঠ্যবিষয়ের কিছু-কিছু সংশোধন করেছি। সংযোজিত তথ্যের কিছুটা অংশ পরিশিষ্ট ২ থেকে ৬-এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

অসুস্থতার জন্য নিজে ভাল করে প্রুফ পড়তে অথবা সংশোধন করতে পারিনি। সেজন্য কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে গেল, বিশেষ করে বানানে। সেজন্য পাঠকরা মার্জনা করবেন।

বিনয় ঘোষ

বাংলার বিদ্বজ্জন ও বিদ্বৎসভা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি হল 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, চতুরঙ্গ, এক্ষণ প্রভৃতি পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল বাংলা ১৩৬৬ সন থেকে সন পর্যন্ত বিস্তৃত। 'বিদ্যা বিদ্বান বিদ্যালয় বিদ্যার্থীবিদ্রোহ' নামে এই গ্রন্থের শেষ রচনাটি 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সনে। দীর্ঘ সতের-আঠার বছরের ব্যবধানে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, ঐতিহাসিক তথ্যের ও যুক্তির, যদিও প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সম্পাদনকালে যথাসম্ভব সেই ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকে আধুনিক যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিকাশকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলার বিদ্বৎসমাজের নানাবিধ সমস্যা, সামাজিক চরিত্র ও ঐতিহাসিক ভূমিকার বিশ্লেষণ করা এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

বিনয় ঘোষ

বিষয়সূচী

উৎসর্গ

বাংলার তরুণ ছাত্রছাত্রীদের

বাংলার বিদ্বৎসমাজ

রাজা স্বদেশে পূজিত হন, বিদ্বান পূজিত হন সর্বত্র। চাণক্যের নামে প্রচলিত এই লোককথার তাৎপর্য আর-কেউ না বুঝলেও, বাঙালীরা অন্তত মর্মে মর্মে বোঝেন। বাংলার বাইরে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, বাঙালীরা সাধারণত 'বাবু' ও 'বিদ্বান' বলে পরিচিত। 'বিদ্বান' বলে বাঙালীর অহংকারও আছে। তার জন্য তাঁরা সর্বত্র সম্মানিতও হন। সুতরাং চাণক্যের কথা তাঁদের পক্ষেই সর্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করা স্বাভাবিক। বিদ্বান যে সর্বত্র পূজিত হন, তার ঐতিহাসিক সাক্ষী সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন প্রবাসী বাঙালী সমাজ। কথায় বলে, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ বল বুদ্ধির বল, বিদ্যার বল,—অর্থের বল নয়। প্রধানত এই বিদ্যাবুদ্ধির বলে বলীয়ান হয়ে, সেকালের দু-একজন পণ্ডিতের মতো, একালের বিদ্বান বাঙালীরা যে দলে-দলে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তা নয়, বাণিজ্যের বলেও অনেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। পরে বংশানুক্রমে পণ্যের বাণিজ্য বিদ্যার বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। সেকালের দু-একজন পণ্ডিতের মতো বলেছি, কারণ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো পণ্ডিত সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন না। একালের শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় অনেক বেশি। সেকালের বাঙালী পণ্ডিতসমাজ, আর একালের বাঙালী বিদ্বৎসমাজের মধ্যে পার্থক্য দু-দিক থেকেই আছে, গুণের দিক থেকে এবং সংখ্যার দিক থেকে। একালে বাঙালীরাই সর্বপ্রথম আধুনিক 'বিদ্বান' হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সবচেয়ে বেশি পান। বিদ্বান বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে এবং কেবল স্বদেশে নয়, বাংলার বাইরেও তাঁরা জয়যাত্রা করেন। চাণক্যের বাক্য তাঁদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। অবশ্য নবযুগের রাজা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পোষকতায়।

চাণক্যের বাক্যের চাকচিক্য বাইরে যতটা আছে, অন্তঃসার ততটা নেই। ইতিহাসে অন্তত তার প্রমাণ নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, স্বদেশে পূজিত হন রাজা এবং বিদ্বান প্রথমে রাজার পূজা করে পরে দেশপূজ্য হন। রাজা যাঁকে সম্মানিত করেন, প্রজারাও তাঁকে মর্যাদা দেন। রাজসম্মান আগে, প্রজার সম্মান পরে। চাণক্য যে-যুগের কথা বলেছেন, সে-যুগে সাধারণ মানুষের

স্বতন্ত্রভাবে কাউকে সম্মানিত করবার অধিকারই ছিল না। বিদ্যা পাণ্ডিত্য প্রতিভা সবই রাজস্বীকৃতির মুখাপেক্ষী ছিল। রাজসভার বাইরে, অথবা রাজার অমাত্য-আমলাগোষ্ঠির বাইরে তার বিশেষ কোনো মূল্য ছিল না। থাকবার কথাও নয়, কারণ মূল্য বা মর্যাদা দেবে কারা? বিদ্যা সম্বন্ধে এবং বিদ্বানের স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্বন্ধে সাধারণের কোনো বোধশক্তিই ছিল না। বিদ্যার অধিকারও ছিল জাতিগত ও কুলগত। সেকালের পণ্ডিতসমাজ এই বিশেষ জাতি ও কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের চেয়ে কুল-কৌলীন্যের মর্যাদা ছিল তাঁদের বেশি। সাধারণ সমাজের কাছ থেকে তাঁরা যে মর্যাদা পেতেন, তা প্রধানত কুলকৌলীন্যের মর্যাদা। ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য এবং সর্বাগ্রে পূজ্য, পণ্ডিত হন বা না হন। পণ্ডিত হলে সকলের তিনি 'পণ্ডিতমশাই', কিন্তু প্রণম্য ও শ্রদ্ধেয় তিনি ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশধর গণ্ডমূর্খ হলেও প্রণম্য এবং পণ্ডিতের তুল্য পূজনীয়। সুতরাং সেকালের পণ্ডিতসমাজ দেশের ও দশের কাছে যে সমাদর ও সম্মান পেতেন, তার অনেকটাই কুলগত। কেবল পাণ্ডিত্যের খাতিরে সম্মান পাওয়া তখনকার সমাজে সম্ভব ছিল না এবং পণ্ডিত বা বিদ্বান হওয়ারও সুযোগ ছিল না সকলের।

'কাল বলতে ছিল সেকাল' এবং 'সেকালে সবই ভাল ছিল'—এই যাঁদের বদ্ধমূল ধারণা, তাঁরা হয়ত এখনই বেদ উপনিষদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে আমার এই যুক্তি খণ্ডন করতে চাইবেন এবং বলবেন যে শূদ্রদেরও সেকালে বিদ্যার অধিকার ছিল, অব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেকে পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁরা সমাজে সমাদৃতও হতেন। উপনিষদে দেখা যায়, অনেক গূঢ়তত্ত্ব ক্ষত্রিয়দেরই শুধু জানা ছিল এবং ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিষ্যত্ব স্বীকার করে সেই সব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতেন। মহাভারতে দেখা যায়, শূদ্রাগর্ভজাত মহামতি বিদুরের জ্ঞানবিদ্যার তুলনা নেই। তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সূতজাতীয় লোমহর্ষণ, সঞ্জয় এবং সৌতির জ্ঞানও কম ছিল না। সৌতি মহাভারতের প্রচারক ছিলেন। এরকম বিচ্ছিন্ন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু এরকম উদাহরণ কয়েকটি একত্র করে সেযুগের কোনো নির্দিষ্ট সমাজনীতি রচনা করা যায় না। সমাজ-অনুসৃত প্রচলিত প্রথা ও রীতির মধ্যেই প্রত্যেক যুগের সমাজনীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেই প্রথা অনুযায়ী সেযুগে শূদ্রের শাস্ত্রবিদ্যায় অধিকার ছিল না। মহামতি বিদুরই একথা একবার তত্ত্বালোচনা

প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বিদুরের কাছে নানাবিধ নীতিবাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র মুগ্ধ হয়ে বলেন: 'আরও যদি কিছু বলবার থাকে, বলো শুনি।' বিদুর বলেন: 'রাজন! সনৎকুমার বলেছেন, মৃত্যু বলে কিছু নেই। তিনিই আপনাকে সেই গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবেন'। ধৃতরাষ্ট্র বলেন, 'কেন, তুমি কি জান না? যদি জান তো তুমিই বলো।' বিদুর উত্তর দিলেন: 'আমি শূদ্রার গর্ভে জন্মেছি, জানলেও আমি প্রকাশ করতে পারব না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে অতি গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করলেও, দেবতাদের নিন্দনীয় হতে হয় না'। বিদুর সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বলেই সমাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে শূদ্র যদি দৈবক্রমে পণ্ডিতও হয়, তাহলেও সমাজে তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার কোনো অধিকার নেই। এই ছিল সেকালের সমাজনীতি। সেকালের পণ্ডিতসমাজ বলতে ব্রাহ্মণসমাজকেই বোঝাত এবং পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কুলমহিমা থেকে বিচ্ছিন্ন পাণ্ডিত্যের স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা লোকসমাজে স্বীকৃত হত না। কুলকৌলীন্য ছিল মুখ্য, বিদ্যাগৌরব ছিল গৌণ।

মহামতি বিদুরের যুগ থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে এই কুলাধিপত্যই প্রায় অপ্রতিহত ছিল বলা চলে। বিদ্যাসাগরের যুগের আগেই অবশ্য এই একচ্ছত্র কুলাধিকারের দুর্গ-প্রাকারে আঘাত হানা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে সংস্কৃত কলেজ কলকাতা শহরে স্থাপন করেছিলেন, সেখানেও ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানদের ছাড়া অন্য কারও পড়বার অধিকার ছিল না। শাসনশৃঙ্খলার স্বার্থেই চিরাচরিত সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘকাল আপস করে চলেছিলেন। সংস্কৃত-শিক্ষা সম্পর্কিত কুলগত সংস্কার ইংরেজরাও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অবশেষে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই এই সংস্কার দূর করতে হল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে কায়স্থদের এবং পরে ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্যান্য জাতির হিন্দুদের সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষার অধিকার দান করেন।* সুতরাং বিদুরের যুগ পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন নেই, বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্তই যথেষ্ট। বিদ্যার ক্ষেত্রে কুলাধিকার উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভাঙতে আরম্ভ করে বাংলা দেশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেও বলা যেতে

---

* যদিও কার্যত এই অধিকার সকল বর্ণের হিন্দুদের দান করতে আরও বেশি সময় লেগেছিল। দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিশিষ্ট, ১৯৭৩)।

পারে। বিদ্বৎসমাজের সীমানা ব্রাহ্মণবৈদ্যসমাজের বাইরে ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। নবযুগের বাংলার নতুন বিদ্বৎসমাজের বিকাশ হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ব্রাহ্মণপ্রধান পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে নবযুগের বাংলার এই বিদ্বৎসমাজের চরিত্রগত পার্থক্য ঐতিহাসিক, একথা স্বীকার করতেই হবে।

বাংলার বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করার আগে আরও একটু অবতরণিকার প্রয়োজন আছে। ইংরেজিতে 'intelligentsia' বলে যে কথা আছে, তা রুশদের প্রবর্তিত। 'ইণ্টলিজেনসিয়ার' বাংলা প্রতিশব্দ আমি 'বিদ্বৎসমাজ' করেছি। 'শ্রেণী' বলে সূচিত না করার কারণ আছে। সমাজবিজ্ঞানে 'শ্রেণী' কথার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। 'শ্রেণীচেতনা' মূলত আর্থনীতিক স্বার্থের একতাবোধ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়। কেবল কার্ল মার্ক্স নন, একথা তাঁর পরবর্তী ভিন্নমতাবলম্বী সমাজবিজ্ঞানীরাও মোটামুটি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber) মার্ক্সীয় সমাজনীতির অনেক সূত্রই অভ্রান্ত বলে মেনে নেননি। 'শ্রেণী' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'class situation', 'status-group' ইত্যাদি অনেক প্রকারের গোষ্ঠীচেতনাবোধের সূক্ষ্ম বিচার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যন্ত সামাজিক 'শ্রেণী' ও আর্থনীতিক স্বার্থের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। অবশেষে তিনি 'শ্রেণীর' সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে :[১]

> We may speak of a 'class' when (1) a number of people have in common a specific causal component of their life chances, in so far as (2) this component is represented exclusively by economic interests in the possession of goods and opportunities for income···

এ-ব্যাখ্যার মধ্যে বাক্যবিন্যাস ও বাচনভঙ্গির কৌশলটাই বড় হয়ে উঠেছে, বক্তব্য তেমন প্রাঞ্জল হয়নি। মার্ক্স এরকম কোনো কৌশলের আশ্রয় নেবার প্রয়োজনবোধ করেননি। সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকের স্বার্থচেতনা দিয়ে তিনি 'শ্রেণী' শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানী নানাবিধ বাক্য প্রয়োগে 'শ্রেণী' কথার ব্যাখ্যা করেও, এই একই সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছেন। তার কারণ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপদ্ধতি ভিন্ন হলেও, যদি সে-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলে তার ফলাফল ভিন্ন হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রেও প্রায় তাই হয়েছে। 'ইণ্টেলিজেনসিয়া' বা বিদ্বানদের কোনো সমাজবিজ্ঞানীই স্বতন্ত্র শ্রেণীমর্যাদা (class-status) দেননি, কেউ 'গ্রুপ স্টেটাস', কেউ 'কমিউনিটি স্টেটাস' দিয়েছেন। কার্ল মার্ক্স 'বিদ্বৎজনদের' মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের ঐতিহাসিক চরিত্রের সুস্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে 'মধ্যশ্রেণী' সম্বন্ধে তিনি গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে গেছেন। অবশ্য তার পরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং মধ্যশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মনোভাবের তারতম্যও সর্বক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। বিদ্বৎজনেরাও এই পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সেকথা পরে বিবেচ্য। আপাতত দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্বৎজনেরা কোনো স্বতন্ত্র 'শ্রেণী' নন এবং এ-সম্বন্ধে সকলমতের সমাজবিজ্ঞানীরাই প্রায় একমত। অ্যালফ্রেড হেবার 'freischwebende intelligenz'-এর কথা বলেছেন, অর্থাৎ "ইণ্টেলিজেন্‌সিয়া' মানে 'socially unattached free intelligentsia.' এ যুগের আর-একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম 'ইণ্টেলিজেন্‌সিয়া' সম্পর্কে বলেছেন—'This unanchored, relatively classless stratum'. রবার্টো মিচেল্‌স বলেছেন—'intellectuals are the officers and subalterns of all arms and of all armies'. ঐতিহাসিক টয়েন্‌বি কালসমুদ্র মন্থন করে শেষ পর্যন্ত একটি বিষের পাত্র বিদ্বৎজনদের সামনে তুলে ধরে বলেছেন—'an intelligentsia is born to be unhappy'—এবং কটাক্ষ করে বলেছেন—'the intelligentsia is a class of liason officers.'

সহজ ভাষায়, বিদ্বৎজনের অবস্থা হলো, 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে', কতকটা তার মতো সারাজীবন সাধ্যমতো বিদ্যার কেরামতি দেখিয়ে সমাজের কাছ থেকে তিনি যা পান, তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না। শেষজীবনে তাঁর মনে হয়, সমাজের তরী যেন তাঁকে তীরে নিক্ষেপ করে, পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলে গেছে। সমাজের মধ্যে থেকেও তিনি যেন এক জনমানবশূন্য দ্বীপে নির্বাসিত। একথা যত মনে হয় তত অতৃপ্তি বাড়ে, আক্রোশ বাড়ে, অভিমান বাড়ে। বিদ্বৎজনদের এই অতৃপ্তিকে টয়েন্‌বি তাই 'congenital unhappiness' বলতেও কুণ্ঠিত হননি।[২]

এ-হেন বিদ্বৎজনদের কেবল আর্থনীতিক স্বার্থে শ্রেণীবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নয় বলে আমি তাঁদের 'সমাজ'-বদ্ধ করেছি। ঠিক শ্রেণীচেতনা বলে কিছু না থাকলেও, তাঁদের গোষ্ঠীচেতনা বলে কিছু আছে মনে হয়। সেটা শিক্ষার চেতনা, বিদ্যার্জনের চেতনা। সমাজবদ্ধতার দিক থেকে এই চেতনার অবশ্যই মূল্য আছে। একে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। বিজ্ঞানীরাও করেননি। কার্ল ম্যানহাইম এই চেতনার বন্ধনশক্তি সম্বন্ধে বলেছেন:[৩]

> **Although they are too differentiated to be regarded as a single class, there is, however, one unifying sociological bond between all groups of intellectuals, namely education, which binds them together in a striking way.**

'আমরা কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছি এবং সেই শিক্ষাকে সমাজের কাজে নিয়োগ করেছি'—এ-বোধ সর্বস্তরের বিদ্বানদের মধ্যে আছে। সাধারণ গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক সাহিত্যিক সাংবাদিক বৈজ্ঞানিক, একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী সকলের মধ্যে বিদ্যার্জনের একটা একাত্মভূতি আছে। এই একাত্মভূতি থেকে সকল স্তরের বিদ্বৎজনের মধ্যে একটা সহানু-ভূতির ভাব সঞ্চারিত হয়। এই সহানুভূতি থেকেই তাঁদের মধ্যে 'সমাজ'-বোধ আসে। ব্রাহ্মণসমাজ বৈদ্যসমাজ কায়স্থসমাজ যেমন 'কমিউনিটি'-বোধ থেকে গড়ে ওঠে (শ্রেণীবোধ থেকে নয়), বিদ্বৎসমাজেরও কতকটা সেইরকম বিকাশ হয়। 'সমাজ' কথার এই অর্থে, বিদ্বৎজনদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র 'বিদ্বৎসমাজের' কথা ভাবা যেতে পারে। বাংলার বিদ্বৎসমাজের কথা ভাবলেও ভুল হয় না। **'Officers and Subalterns of all arms and of all armies'**-এর মধ্যে শ্রেণীগত ঐক্য না থাকলেও, সমাজগত একতাবোধ থাকতে বাধা নেই। বৈদ্যসমাজে যেমন 'প্রলেটারিয়েট' বৈদ্যের প্রতি 'ক্যাপিটালিস্ট' বৈদ্যের একটা অদৃশ্য সহানুভূতি থাকে, ব্রাহ্মণসমাজে যেমন সব ব্রাহ্মণের সমান **class-status** না থাকা সত্ত্বেও একটা সমাজবোধ থাকে, বিদ্বৎসমাজেও তেমনি অফিসার ও সাব-অল্টার্ন, ক্যাপটেন ও জমাদার, গোলন্দাজ ও পদাতিক, সর্বস্তরের মধ্যে, শ্রেণীবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে একটা সমাজবোধের বন্ধন থাকতে পারে এবং আছেও। তবে এই সমাজবোধের বন্ধন যে শ্রেণীবোধের বন্ধনের তুলনায় অনেক বেশি শিথিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখন প্রশ্ন হল, বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবেন কারা? কিসের মাপকাঠিতে তাঁদের বিদ্বৎসমাজের মধ্যে গণ্য করা হবে? যে-বিদ্বৎজনদের নিয়ে 'বিদ্বৎসমাজ' গঠিত, সেই বিদ্বৎজন কাদের বলব? আলোচনা করতে হলে, 'বিদ্বৎজন' সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট নির্দিষ্ট ধারণা থাকা দরকার, কোনো অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায় না। 'শিক্ষা' যদি মাপকাঠি হয়, তাহলে স্বল্পশিক্ষিত থেকে উচ্চশিক্ষিত সকলেই কি 'বিদ্বৎজন'? তার চেয়েও বড় কথা, শিক্ষিত বা বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদ্বৎসমাজভুক্ত হবার যোগ্য কি না?

রবার্টো মিচেল্‌স 'বিদ্বৎজন' কথার ব্যাখ্যা করেছেন ঘুরিয়ে। তিনি বলেছেন:[৪]

> **Intellectuals are persons possessing knowledge or in a narrower sense those whose judgment, based on reflection and knowledge, derives less directly and exclusively from sensory perception than in the case of non-intellectuals.**

অর্থাৎ, প্রকৃত বিদ্বৎজন তাঁরাই, যাঁরা বিচার-বিশ্লেষণে চিন্তাশীলতা ও মননশীলতার পরিচয় দেন বেশি, এবং সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল অনেক কম। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যাঁরা জ্ঞানলাভ করেন, তাঁরা স্থূল সাধারণ ব্যক্তি। আর যাঁরা ষষ্ঠেন্দ্রিয় 'মগজের' সাহায্যে চিন্তা ও মনন করে জ্ঞানবৃদ্ধি করেন, তাঁরাই বিদ্বৎজন। আমাদের ঘরোয়া আটপৌরে কথায় বলা যায়, চোর পালালে যাঁদের বুদ্ধি বাড়ে তাঁরা বুদ্ধিমান নন, চোরের চিন্তায় যাঁদের বুদ্ধি বাড়ে, যাঁরা চুরির দুর্ভোগ ভোগেন না, তাঁরাই প্রকৃত 'বুদ্ধিমান'। ঠেকে বা ঠকে না শিখে যাঁরা ভেবেচিন্তে শেখেন, মিচেলের মতে, তাঁরাই 'ইন্টিলেকচুয়াল' বলে গণ্য হবার যোগ্য। মিচেলের এই ডেফিনিশন, মনেহয়, নিতান্তই 'টেকনিক্যাল' এবং অত্যন্ত 'ফর্মাল'। ব্যাখ্যা ভুল না হলেও, ব্যাখ্যানের ভঙ্গিমায় বিভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশি। বরং কার্ল ম্যানহাইম অনেকটা সহজবোধ্য ভাষায় একথার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন:[৫]

> **In every society there are social groups whose special task it is to provide an interpretation of the world for that society. We call these the 'intelligentsia.'**

প্রত্যেক সমাজে নানাগোষ্ঠীভুক্ত এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁদের কাজ হল সেই সমাজের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করা এবং ব্যাখ্যা করা।

যাঁরা সমাজের এই জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেন, তাঁরাই বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। তাঁরাই প্রকৃত বিদ্বৎজন।

এদিক থেকে বিচার করলে কেবল বিদ্যার মানদণ্ড দিয়ে বিদ্বৎজনের বিচার করা যায় না। অ্যাকাডেমিসিয়ান, অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা রত্ন, এঁরা 'টিপিক্যাল' বিদ্বৎজন বলে গণ্য হলেও, মিচেলের ভাষায় বলা যায়—'it would be wrong to define intellectuals in terms of academic examinations'. পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র যদি ডেপুটি বা সিবিলিয়ান হন এবং কেবল চাকরিই করেন, তাহলে তিনি আমাদের এই সংজ্ঞা অনুসারে 'বিদ্বৎজন' নন। সিবিলিয়ান ইণ্টিলেকচ্যুয়াল নন শুনলে অনেকে হয়ত স্তম্ভিত হবেন। কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করে বোঝার প্রয়োজন আছে। সিবিলিয়ান বা ডেপুটি যদি চাকরি করেও বিদ্যাচর্চা করেন, মনন করেন, সামাজিক জীবনে তার প্রয়োগ করেন, তাহলে তিনি 'বিদ্বৎজন'। অর্থাৎ সামাজিক অর্থে 'বিদ্বৎজন'। সামান্য একজন স্বল্পবেতনের কেরানী যদি মানসিক সংগ্রামে, আদর্শগত সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহলে নিষ্ক্রিয় সিবিলিয়ান অথবা অকর্মণ্য ডেপুটির তুলনায় 'বিদ্বৎজন' বলে গণ্য হবার দাবি তাঁর অনেক বেশি। ধনবিজ্ঞানের ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট কোনো ছাত্র যদি পরবর্তী জীবনে পাটের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজ পরিবারে বা পরিচিত মহলে 'বিদ্বৎজন' বলে গণ্য হলেও, সমাজের কাছে তিনি 'বিদ্বৎজন' বলে গণ্য হবার যোগ্য নন। বিদ্বান হলেই বিদ্বৎসমাজভুক্ত হয় না। পাঠশালা পর্যন্ত পড়েছেন এরকম self-educated কোনো সাহিত্যিক অনেক উচ্চশিক্ষিত চিন্তালস অ্যাকাডেমিসিয়ানের চেয়ে দেশের বিদ্বৎসমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রভাবশালী ব্যক্তি হতে পারেন। 'শিক্ষিত' আর 'বিদ্বৎজন' এক নন। 'বিদ্যার ভুড়্‌ভুড়ি' বলে একটা কথা আছে আমাদের দেশে। মহাবিদ্বান কেউ যদি অগাধ জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে থাকেন এবং কেবল ভুড়ভুড়ি কাটেন, যদি তাঁকে দেখা না যায়, তাঁর চিন্তাভাবনার কথা জানা না যায়, তাহলে তিনি জ্ঞানতপস্বী 'স্কলার' হলেও, সামাজিক অর্থে 'ইণ্টিলেকচ্যুয়াল' নন। মিচেল্‌স তাই বলেছেন: [৬]

> ...those who have merely accumulated knowledge are not true intellectuals. The scholar must possess priestly qualities and fulfil priestly functions, including political

> **activity. His knowledge, as Fichte says, 'should be truly applied for society's use'···**

এর মধ্যে **'priestly qualities'** এবং **'priestly functions'** কথা দুটির গুরুত্ব খুব বেশি। অধীত ও অর্জিত বিদ্যা নিয়ে 'স্কলার' হওয়া যায়, কিন্তু 'ইন্টিলেকচুয়াল' হওয়া যায় না। পুরোহিতের গুণ থাকা চায়, পুরোহিতের কর্তব্য করা চায়, তবে বিদ্বৎজন হওয়া সম্ভব। পুরোহিতের গুণ কি, কর্তব্যই বা কি? প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে পুরোহিতের কাজ ছিল, সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা, তাদের মনের ক্ষুধাতৃষ্ণা (পেটের নয়) পরিতৃপ্ত করা। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা তখন ধর্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মচিন্তার বাঁধা সড়কে চালিত হত। পুরোহিতের কর্তব্য ছিল, এই বাঁধা সড়কটি পাহারা দেওয়া। তার জন্য তিনি শাস্ত্রবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা আয়ত্ত করতেন, এবং সামাজিক চিন্তার গতানুগতিক সড়কটি পাহারা দিয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করতেন। গৃহে বসে কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন করে তাঁর কর্তব্য শেষ হত না। একালের বিদ্বৎজনের কর্তব্য সেকালের পুরোহিতের কর্তব্যের অনুরূপ। বিদ্বান হয়ে এই কর্তব্য পালন যদি তিনি না করেন, তাহলে তিনি বিদ্বৎসমাজের একজন বলে গণ্য হবেন না। সমাজের চিন্তাধারাকে যিনি পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন, নিজে চিন্তা করে অন্যের চিন্তার উদ্রেক করেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিদ্যা আয়ত্ত করতে কুণ্ঠিত হন না, তিনিই আদর্শ বিদ্বৎজন। উচ্চশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত আত্মশিক্ষিত ও আজীবন শিক্ষার্থী, সকলেই এই অর্থে বিদ্বৎসমাজের মধ্যে গণ্য হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। মিচেল্‌স-এর মতে এঁরা সকলেই বিদ্বৎজন বা ইন্টিলেকচুয়াল—

> **In so far as they assimilate the materials of knowledge and employ them in mental labour, in so far as they are vocationally concerned with things of the mind.**

শেষ কথাটিই সবচেয়ে সহজ—'vocationally **concerned with things of the mind'** যিনি, তিনিই **intellectual** হবার যোগ্য। সমাজের হাটে যিনি নিজের মনন ও মানুষের মন নিয়ে কারবার করেন, তিনিই বিদ্বৎজন এবং দেশের বিদ্বৎসমাজের একজন। তা যিনি করেন না, তিনি বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু বিদ্বৎসমাজের একজন বলে গণ্য হবার যোগ্য নন।

বিদ্বৎজনের প্রধান কাজ হল তাহলে, সমাজের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা, সামাজিক নীতি আদর্শ ও জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করা, বুঝিয়ে দেওয়া। সমাজ যত স্থিতিশীল হয়, সামাজিক গড়ন যত অচলায়তনের মতো অটল অনড় হয়ে ওঠে, ততই বিদ্বৎজনদের স্তরটি সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট হতে থাকে এবং ক্রমে বিদ্বৎসমাজ একটি সামাজিক 'জাতিতে' পরিণত হয়। আদিম সমাজের জাদুকর থেকে মধ্যযুগের সমাজের পুরোহিত যাজকসম্প্রদায় ও পণ্ডিতসমাজ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে তাই সেকালে ব্রাহ্মণসমাজে ও পণ্ডিতসমাজে কোনো পার্থক্য ছিল না। 'ব্রাহ্মণ' বলতে 'পণ্ডিত' এবং 'পণ্ডিত' বলতে 'ব্রাহ্মণ' বোঝাত। বিদ্বৎসমাজ যখন জাতিগত মর্যাদা পেতেন, তখন সমাজমানসের উপর তাঁরা সহজেই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন। তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারা ও জ্ঞানবিদ্যাও ক্রমে সঙ্কীর্ণ ও প্রাণহীন হয়ে উঠত। প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকত না। সমাজবিচ্ছিন্ন চিরায়ত্ত বিদ্যা 'স্কলাস্টিক' ও 'অ্যাকাডেমিক' হতে বাধ্য। ম্যানহাইম একে 'monopolistic type of thought' বলেছেন। এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, 'scholasticism'-এ পরিণতি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, ম্যানহাইমের ভাষায়—'its relative remoteness from the open conflicts of everyday life'. এই কারণেও এই জাতীয় বিদ্যা ও চিন্তাধারা ক্রমে 'scholastic' ও 'academic' হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ম্যানহাইমের উক্তি প্রণিধেয় বলে উদ্ধৃত করছি :[৭]

> This type of thought does not arise primarily from the struggle with concrete problems of life, nor from trial and error, nor from experiences in mastering nature and society, but rather much more from its own need for systematisation, which always refers the facts which emerge in the religious as well as in other spheres of life, back to given traditional and intellectually controlled premises.

চিন্তার উদ্রেক হয় প্রত্যক্ষ জীবনসংগ্রাম থেকে। জীবনসংগ্রাম কেবল জীবিকাসংগ্রাম নয়, একথা মনে রাখা দরকার। জীবনের ও সমাজের

নানাবিধ সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ম্যানহাইম বলেছেন, 'স্কলাষ্টিক' চিন্তা এরকম কোনো জীবনসমস্যার প্রত্যক্ষ ঘাতপ্রতিঘাত থেকে সৃষ্টি হয় না। সমাজ-জীবন থেকে সে-চিন্তা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এমনকি প্রাকৃতিক জীবন থেকেও। ভুলভ্রান্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে চিন্তাধারার পুনর্জীবনলাভের সম্ভাবনা থাকে না। প্রধানত নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থরক্ষার খাতিরে সেই চিন্তা ও বিদ্যা 'শাস্ত্রের' মধ্যে দৃঢ়বিন্যস্ত করার প্রয়োজন হয়, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে নয়। সেই শাস্ত্রবিদ্যা দিয়ে চিরদিন একভাবে সব সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়। এই কাজই সেকালের পণ্ডিতসমাজ করতেন। সেকালের স্থিতিশীল অচল অটল সমাজের তাঁরা ছিলেন যোগ্য প্রতিনিধি ও মুখপাত্র। পণ্ডিতসমাজের যেমন, পাণ্ডিত্যেরও তেমনি কোনো পরিবর্তন হত না। সমাজ, সমাজের পণ্ডিত, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, সবই ছিল স্থিতিশীল গতানুগতিক।

একালের বিদ্বৎসমাজের বিকাশ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে। ধনদৌলত ও বাণিজ্যের অবাধ মুক্তি-অভিযানের দিনে বিদ্যার ও বিদ্বানের নতুন জয়যাত্রা শুরু হল। অবাধ বাণিজ্য ও ধনতন্ত্রের প্রাথমিক অগ্রগতির সঙ্গে আবির্ভাব হল নতুন প্রগতিশীল বিদ্বৎসমাজের। তাঁরা যে বিদ্যার সাধনা করতে লাগলেন, তার সবচেয়ে বড় আদর্শ হল প্রখর বিচারবুদ্ধি, নির্মল-যুক্তি ও উদার মানবমূল্যবোধ। *Nobilitas* নয়, ***Humanitas*** হল নবযুগের আদর্শ। নতুন জ্ঞানবিদ্যাকে বলা হত 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যা। এই হিউম্যানিজম্ কি? অনেকে এই 'হিউম্যানিজম্' কথার ভুল অর্থ করে থাকেন। 'মানবতাবোধ' বলতে আমরা যা বুঝি, 'হিউম্যানিজম্' ঠিক তা নয়। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন এই 'হিউম্যানিজম' সম্বন্ধে বলেছেন :[৮]

> Humanism here represented an ideology which played a closely defined part in the bourgeoisie's struggle for emancipation and power. The concept of a 'humanist' knowledge concerned with truths applicable to humanity in general, with an ethical system based upon personal *virtus* (i.e., the ability gained by an individual's own endeavour), implies the negation of all privileges based upon birth and Estate; it implies the negation of the belief in supranatural powers which had been taught by the clergy···

উদীয়মান ধনিক-বণিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ হল ‘হিউম্যানিজম্’। হিউম্যানিস্ট জ্ঞান সেই সত্যের জ্ঞান, যা সমগ্র মানবসমাজে প্রযোজ্য। হিউম্যানিজম্ জন্মগত ও জমিদারীগত কোনোও সামাজিক অধিকারে ও ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না। ‘জমিদারীগত’ অধিকার আর ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তির’ অধিকার অভিন্ন নয়। ‘জমিদারীগত’ কথাটি সেইজন্য আমি ব্যবহার করেছি। জমিদারী স্বোপার্জিত সম্পত্তি নয়, সম্রাটের নিজস্ব স্বার্থে উপহার-দেওয়া সম্পত্তি, লুটতরাজ-করা সম্পত্তি। জমিদারীর আয় প্রধানত ‘unearned income’, ব্যক্তিগত কায়িক বা মানসিক মেহনতের আয় নয়। বংশানুক্রমে জমিদারী ভোগ করা হয়। জমিদারের মর্যাদা জমিদারীর জন্য, ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য নয়। ক্যাপিটালিস্ট তা নন। ‘Surplus value’ মুনাফারূপে আত্মসাৎ করে যতই তিনি ধনিক হন না কেন, ‘এনট্রেপ্রেনার’ হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত বুদ্ধি সাহস মেহনত, সবকিছুর মূল্য আছে, অন্তত ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়পর্বে। জমিদারের জন্মগত অধিকার ছাড়া কিছু নেই। জমিদারের মতো, সেকালের সমাজে বিদ্যারও জন্মগত ও বংশগত অধিকারটা বড় ছিল। সেযুগে ধনপতি সদাগরদের যেমন কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না, তেমনি কোনো অব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যও স্বীকৃত হত না। নবযুগের ‘হিউম্যানিজম্’ এই বংশগত ও বৃত্তিগত অধিকার অস্বীকার করে, সর্বক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও ক্ষমতাকে খানিকটা অন্তত স্বীকৃতি দিল। হিউম্যানিজমের মূলমন্ত্র হল ব্যক্তিমর্যাদা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কুলকৌলীন্য নয়, ব্যক্তিগত ‘achievement’ হল নবযুগের সামাজিক মর্যাদার প্রধান মানদণ্ড। বিত্তের ক্ষেত্রে যেমন, বিদ্যার ক্ষেত্রেও তেমনি এই ব্যক্তিগত ‘achievement’-এর মানদণ্ড বড় হয়ে উঠল। পুরাতন পণ্ডিতসমাজ ভেঙে, নানাজাতিবর্ণের বিদ্বানদের নিয়ে নতুন বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠতে থাকল। বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দী হল এই নবযুগের বিদ্বৎসমাজের বিকাশের কাল। ‘হিউম্যানিজম্’ এবং ব্যক্তিগত ‘এন্টারপ্রাইজ’ ও ‘অ্যাচিভমেন্ট’ তাই দেখা যায় নবযুগের বাঙালী বিদ্বৎসমাজেরও মূলমন্ত্র।

নতুন সামাজিক পরিবেশে বিদ্বৎজন বাছাইয়ের এই নতুন মানদণ্ডের আলোচনাপ্রসঙ্গে কার্ল ম্যানহাইম্ বলেছেন যে ইতিহাসে দেখা যায়, প্রধানত তিনটি নীতি অনুসারে, প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, বিদ্বৎসমাজের বাছাই চলেছে। কুলকৌলীন্যের নীতি, সম্পত্তির মালিকানার নীতি এবং

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নীতি। ক্রমে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপর জোর দেওয়ার দিকেই আধুনিক গণতন্ত্রের ঝোঁক বেশি। ঝোঁক বেশি বলে সেটাই একমাত্র সত্য বা মানদণ্ড হয়ে ওঠেনি। কুল ও সম্পত্তির জোর গণতন্ত্রের যুগেও আছে, কেবল ব্যক্তির গুণ বা প্রতিভাই সব নয়। ম্যানহাইমের উক্তি উদ্ধৃত করছি :৯

> If one calls to mind the essential methods of selecting elites, which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished : Selection on the basis of *blood*, *property*, and *achievement*. Aristocratic Society·· chose its elites primarily on the blood principle. Bourgeois society gradually introduced as a supplement, the principle of wealth · . It is, of course, true that the principle of achievement was combined with the two other principles in earlier periods, but it is important contribution of modern democracy (as long as it is vigorous) that the achievement principle increasingly tends to become the criterion of social success. Seen as a whole, modern democracy is a selective machinery combining all three principles.

ম্যানহাইম বলেছেন যে অভিজাত সমাজের কৌলীন্যনীতির সঙ্গে বুর্জোয়া-সমাজে 'supplement' হিসেবে ধনাধিকারের নীতি যোগ করা হয়েছিল, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নীতি যে একেবারে যুক্ত ছিল না তা নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের গোড়ার দিকে অন্তত ছিল। কিন্তু গণতন্ত্রের যুগে ক্রমেই তৃতীয় নীতি প্রবল হচ্ছে, এইটাই উল্লেখ্য। গণতন্ত্র সম্বন্ধে একথা বলেও তিনি বন্ধনীর মধ্যে 'as long as it is vigorous' কথাটি যোগ করতে ভোলেননি। শেষকালে বলেছেন, গণতন্ত্রের যুগে, বিদ্বৎসমাজের নির্বাচনে তিনটি নীতিরই একত্র প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থাৎ আধুনিক যুগেও আমরা যেমন বহু প্রাচীন সংস্কার একেবারে বর্জন করতে পারিনি, উত্তরাধিকারসূত্রে সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে অনেক আবর্জনাও বহন করে চলেছি, তেমনি গণতন্ত্রের যুগেও অ্যারিস্টক্রাসির নীতি একেবারে বর্জন করতে পারিনি। আজও উচ্চবংশের ও বিত্তবানের সন্তান বিদ্বৎসমাজে যত সহজে প্রতিষ্ঠা পান, অনভিজাতবংশের দরিদ্রের সন্তান, তার চেয়ে শতগুণ বেশি যোগ্যতা ও

প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তা পান না। বাংলার বিদ্বৎসমাজেও এদৃষ্টান্ত বিরল নয়, বরং প্রকট বলা চলে। তার কারণ, বাংলার সমাজে 'গণতন্ত্র' কোনকালেই 'vigorous' ছিল না, আজও নয়। গণতন্ত্রের এই বিকলাঙ্গ নির্জীব অবস্থার অন্যতম কারণ হল, বিদেশী শাসনের ঔপনিবেশিক পরিবেশে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিসদৃশ সংমিশ্রণ। স্বাধীন হবার পরেও এই মিশ্ররূপের তেমন উল্লেখ্য পরিবর্তন হয়নি, এবং গণতন্ত্রও তাতে সজীব ও সচল হয়নি বরং অনেক নির্জীব হয়েছে এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের বদলে ফ্যাশিস্ট জনতাতন্ত্রের (mobocracy) দিকে ঝোঁক প্রবল হয়েছে।

এই ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিভা বুদ্ধি ও উদ্যমের জোরে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভের যেটুকু সুযোগ বা স্বাধীনতাআছে,আগেকার সমাজে তা একেবারেই ছিল না। প্রাচীন সমাজের বাঁধাধরা গড়ন ভেঙে দিয়ে নতুন যে সমাজবিন্যাস হতে থাকল তা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। সমাজের সমস্ত স্তর থেকে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে, বিত্তবান ও বিদ্বানরা প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা পেতে থাকলেন। বিদ্বৎসমাজের সামান্য পরিবর্তন নয়, উল্লেখ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। বাংলার সমাজে অব্রাহ্মণবংশের উচ্চশিক্ষিত বিদ্বৎজনেরা সামাজিক চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন। মহামতি বিদুর যদি উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে একালের ধৃতরাষ্ট্রদের তিনি স্বচ্ছন্দে, শূদ্রাগর্ভজাত হয়েও, অতিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারতেন। সমাজের দেবতারাও নিন্দা করার সাহস পেতেন না।

এইসব ঐতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই এদেশে নবযুগের বিদ্বৎ-সমাজের আবির্ভাব হল। ইংরেজরা যখন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন সমাজে ধীরে ধীরে শাসকশ্রেণীর বিদ্যার মর্যাদাই বাড়তে লাগল। মুসলমান আমলে হিন্দুরা ফার্সীবিদ্যা আয়ত্ত না করতে পারলে রাজদরবারে সম্মান পেতেন না এবং সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত হতেন না। ইংরেজ আমলেও ক্রমে ইংরেজিবিদ্যা সেই সামাজিক মর্যাদা পেল। এই মর্যাদাদানের জন্য কেবল যে ইংরেজরাই দায়ী, তা নয়। গোড়ার দিকে তাঁরা শাসন-শোষণের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, এদেশের লোকের শিক্ষার দিকে তাঁদের কোনো দৃষ্টি ছিল না। দেশের লোকরাই নিজেদের বাস্তববুদ্ধিতে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকতে

আরম্ভ করলেন। ইংরেজরা বরং দেশীয় শিক্ষার প্রচলিত ধারাকে ব্যাহত করতে চাননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে তাঁরা কাশীতে সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য ছিল, আদালতের কাজ চালানোর জন্য পণ্ডিত ও মৌলবী তৈরি করা। শাসনকার্যের জন্য যেটুকু আশু প্রয়োজন, তাই তাঁরা করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা দিতে তাঁদের সংশয় ও ভয় ছিল বললেও ভুল হয় না। এদেশের লোক এবং খ্রীস্টান পাদরি সাহেবদের উদ্যোগেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হতে থাকে। পাদরি সাহেবদের স্বার্থ খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পথ পরিষ্কার করা এবং এদেশী লোকের স্বার্থ, ইংরেজদের অধীনে চাকরি-বাকরি করা। চাকরি বলতে তখন দেওয়ান মুন্শী বেনিয়ান মুৎসদ্দি সরকার ইত্যাদির চাকরি বোঝাত এবং তাতে বিলক্ষণ অর্থ-সমাগম হত। ডেপুটি বা সিবিলিয়ানদের যুগ তখনও আসেনি। দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুচ্ছুদ্দিগিরি করবার জন্য যত সামান্য হোক, ইংরেজি শিক্ষার দরকার হত, সংস্কৃত পাণ্ডিত্যে কাজ হত না। ইংরেজযুগের প্রথম পর্বে নতুন বাঙালী সম্ভ্রান্ত সমাজ গড়ে ওঠে প্রধানত এই দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুচ্ছুদ্দিগিরি ও চলনসই ইংরেজি বিদ্যার উপর ভিত্তি করে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীরা যাঁদের বর্তমান যুগের Family-Founder বলেছেন, বাংলার সমাজে তাঁরা প্রায় সকলেই এই বৃত্তি অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা যেরকম Social Register তৈরি করেছেন, আমাদের দেশের প্রত্যেক পরিবারের ইতিহাস অনুসন্ধান করে যদি সেরকম কোনো রেজিস্টার তৈরি করা যেত (করতে পারলে, সামাজিক ইতিহাস-রচনার দিক থেকে সুবিধা হত), তাহলে এই সমাজচিত্র আরও অনেক পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতো চোখের সামনে।[১০] ইংলণ্ড আমেরিকার আধুনিক যুগের প্রথম পর্বের Family-Founder-দের মতো বাঙালী সম্ভ্রান্ত পরিবার-প্রতিষ্ঠাতারা 'merchant capitalists' ছিলেন না। শেঠ বসাক শীল মল্লিক লাহাদের মধ্যে 'ব্যাঙ্কার' বা 'বেনিয়া' ছিলেন অনেকে, কেউ কেউ স্বাধীন ব্যবসায়েও মার্চেন্ট-ক্যাপিটালিস্টদের মতো বিত্তলাভ যে করেননি, তাও নয় (যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল দে প্রভৃতি), কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী পরিবার 'সম্ভ্রান্ত' বলে গণ্য হয়েছেন, দেওয়ানি-বেনিয়ানির অর্থলাভে। সরকারী দলিলপত্র থেকে কয়েকটি পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল:[১১]

ঠাকুর পরিবার

বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী পরিবার। প্রধান শাখার আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি নানারকম ব্যবসাবাণিজ্য করে সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। বিত্ত ও বিদ্যা, উভয়ক্ষেত্রে এরকম প্রতিপত্তিশালী পরিবার তখন বোধহয় আর ছিল না।

শোভাবাজারের রাজ-পরিবার

পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। এই পরিবারের গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব এবং আরও অনেকে কলকাতার বিদ্বৎসমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটার কয়েকটি পরিবার

পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর-পরিবারের নানাশাখার বাস তো ছিলই, তা ছাড়াও আরও অনেক বিত্তবান পরিবারের বাস ছিল যাঁরা তখনকার বিদ্বৎসমাজে নানাভাবে প্রভুত্ব করতেন। যেমন ঘোষ-পরিবার। ঘোষপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ হেস্টিংসের সরকার ছিলেন। রাজা সুখময় রায়ের পরিবার। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ক্লাইভ ও অন্যান্য গবর্নরদের বানিয়া হিসেবে বহু অর্থ উপার্জন করেন। সুখময় তাঁর দৌহিত্র, তিনি স্যার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানী করে প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন। বৈদ্যনাথ রায়, শিবচন্দ্র রায়, নরসিংহ রায় প্রভৃতি বিদ্বৎসমাজে নানাভাবে প্রভুত্ব করেছেন। দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারও খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এ-ছাড়া মল্লিক শেঠ বসাক পরিবারের অনেকে এখানে বাস করতেন।

হাটখোলার দত্ত-পরিবার

এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, জগৎরাম দত্ত প্রভৃতি কোম্পানির দেওয়ানী ও বেনিয়ানি করেছেন। মদনমোহন দত্ত 'শিপ-ওনার' ছিলেন, ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন। বাংলার বিদ্বৎসমাজে দত্তপরিবারের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল।

কুমোরটুলির মিত্র পরিবার

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম প্রাচীন কলকাতার সমাজে tyrant

ছিলেন বলা চলে। "গোবিন্দরামের ছড়ি, বনমালী সরকারের বাড়ি, আমিচাঁদের দাড়ি, জগৎশেঠের কড়ি"—লোকে কথায় বলত। গোবিন্দরাম কলকাতার black Deputy ও Native Zamindar বলে পরিচিত ছিলেন। কেবল ধনিকসমাজে নয়, বিদ্বৎসমাজেও মিত্রপরিবারের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। তাঁদের মধ্যে—শম্ভুচন্দ্র মিত্র, কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

জোড়াসাঁকোর ঘোষ-পরিবার

দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষের পুত্র হরচন্দ্র ঘোষ এই পরিবারের গৌরব ছিলেন। বাংলার বিদ্বৎসমাজে তাঁর মতো উৎসাহী ও কৃতী পুরুষ তখন খুব বেশি ছিলেন না।

জোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবার

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ পাটনার চীফ মিড্‌লটন সাহেব ও টমাস রামবোল্ডের দেওয়ানি করে ধনবান হন। প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ সিংহ তাঁর পুত্র। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং জয়কৃষ্ণের পৌত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতার বিদ্বৎসমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

পাইকপাড়ার সিংহ-পরিবার

প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেস্টিংসের আমলে কৌন্সিল ও বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের দেওয়ান ছিলেন এই পরিবারের অনেক খ্যাতনামা পুরুষ বাংলার বিদ্বৎসমাজে প্রভুত্ব করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু), প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আজও এঁদের প্রতিপত্তি প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে।

সিমলার দে-পরিবার

প্রতিষ্ঠাতা রামদুলাল দে ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং বাণিজ্যসূত্রে আমেরিকার সঙ্গে তাঁর লেনদেন ছিল। কলকাতার ধনকুবেরদের মধ্যে রামদুলাল অন্যতম ছিলেন। রামদুলালের পুত্র আশুতোষ দে বিদ্বৎসমাজে রীতিমতো প্রভুত্ব করতেন। রক্ষণশীল-শিবিরের তিনি একজন প্রধান ছিলেন।

কলুটোলার শীল-পরিবার

প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীল কলকাতার বিখ্যাত ধনিক ব্যবসায়ী ছিলেন। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য এবং সমাজ-সংস্কারের জন্য তিনি মুক্তহস্তে দান করেছেন। বিদ্বৎসমাজে পরোক্ষ প্রতিপত্তি তাঁরও যথেষ্ট ছিল।

কলুটোলার সেন-পরিবার

প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। সমসাময়িক বিদ্বৎজনদের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই পরিবারের হরিমোহন সেন, কেশবচন্দ্র সেন, মাধবচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম বাংলার বিদ্বৎসমাজে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রামবাগানের দত্ত-পরিবার

বড় বড় সরকারী চাকরি করে এই পরিবার বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন কলকাতার ধনিকসমাজে। বিদ্যা ও বিত্ত উভয়ক্ষেত্রে এই পরিবারের অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রসময় দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, দুই বোন তরু দত্ত ও অরু দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

বহুবাজারের বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবার

প্রতিষ্ঠাতা হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় হিকি সাহেবের ও অন্যান্য সাহেবের বেনিয়ানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর পুত্র অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাচরণ পিতুড়ীর দৌহিত্র অভয়চরণ এবং ভাগনে বিশ্বনাথ মতিলাল। হৃদয়রামের পৌত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

মলাঙ্গার দত্ত-পরিবার

বেনিয়ানি ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা অক্রূর দত্ত প্রচুর ধনলাভ করেন। এই পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত বিদ্বৎসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। এই পরিবারের বধূ, কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

এখানে কলকাতা শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর
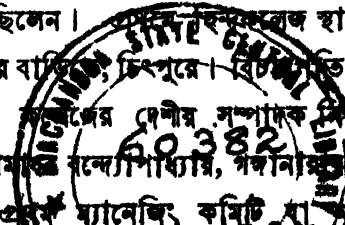
প্রথমার্ধের মধ্যে নতুন কলকাতা মহানগরীতে এইসব হিন্দু বাঙালী পরিবার বিত্ত ও বিদ্যা, উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কলকাতার এই নতুন সম্রান্ত-সমাজই তখন বাংলার উচ্চসমাজ। সম্রান্ত ও আভিজাত্যের নতুন মানদণ্ড বিত্ত, বংশ নয়। নবযুগের এই নতুন সমাজবিন্যাসের অভিনব নিয়ন্ত্রণশক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মর্যাদার মূল কথা হল সামাজিক ক্ষমতা। সেকালের সমাজে এই মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল কুলগত, একালে হল বিত্তগত। পুরাতন কুলগত অচল সামাজিক পিরামিড দেওয়ানি-বেনিয়ানি-বাণিজ্য-চাকরিলব্ধ বিত্তের আঘাতে কিছুটা ভাঙতে আরম্ভ করল।

কুলকৌলীন্যের বদলে বিত্তকৌলীন্য বড় হয়ে উঠল সমাজে। দু-এক শতাব্দী আগে বাংলার তন্তুবণিক গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-বহির্ভূত জাতির কেউ এরকম সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। বাণিজ্যলব্ধ বিত্তের তখন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। নতুন বাঙালী সম্রান্ত সমাজে কলকাতার শেঠ বসাক মল্লিক শীল লাহা আড্ডি সকলেই অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন। তাঁরাও মর্যাদা পেলেন, কারণ বাণিজ্যলব্ধ বিত্তের সামাজিক ক্ষমতা স্বীকৃত হল।

বিত্তের সঙ্গে বিদ্যারও মণিকাঞ্চন যোগ হল। ক্রমে নতুন সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার দুটি প্রধান মানদণ্ড হল বিত্ত ও বিদ্যা। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার এই যোগাযোগের প্রধান কারণ, নবযুগের প্রথম পর্বে বিত্ত না থাকলে, বিত্তবান পরিবারের সন্তান না হলে বিদ্যার্জন করা সম্ভব হত না। Propertied Class ও Educated Class, একসঙ্গে এই দুই শ্রেণীর লোকের নাম সাধারণের মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। মধ্যযুগের সমাজের 'privilege of birth' ও 'sacerdotal consecration'-এর বদলে নতুন সমাজের ক্ষমতা-মর্যাদার মানদণ্ড হল 'wealth' ও 'erudition' এবং দুয়েরই প্রাণধর্ম হল 'spirit of enterprise'। সিমেল (Simmel), সম্বার্ট (Sombart) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা Money-র সঙ্গে Intellect-এর এই আত্মিক সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। নতুন সমাজে টাকা সচল, বিদ্যাও সচল। ঘড়াভর্তি টাকা মাটির তলায় পোঁতা থাকে না, থাকলে এ-যুগে তার কোনো মূল্য নেই। বিদ্যাও কেবল রাজসভায় বন্দী হয়ে থাকে না। দুয়েরই সচলতা যুগধর্ম। বিদ্যা 'দান' করলে বাড়ে, অর্থও নিয়োগ করলে বাড়ে। টাকার

'Free market' আছে, বাজার বিনিময় প্রতিযোগিতা আছে। বিদ্যারও বাজার আছে, বিনিময় আছে। কেবল টাকা নয়, নবযুগে বিদ্যাও 'ক্যাপিটাল' বা মূলধন। কমার্স বা বাণিজ্যের জন্য কেবল 'কমোডিটি'র বেচাকেনা হয় না বাজারে, 'নলেজ' বা বিদ্যারও বেচাকেনা হয়। প্রতিযোগিতায় কমবেশি মূল্য পাবার সম্ভাবনা থাকে। মার্টিনের ভাষায় বলা যায়—'Commerce and knowledge had emancipated themselves: no longer should there be any superior authority, human or otherwise, to keep them in leading strings.'[১২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার সমাজে 'কমার্স' ও 'নলেজের' এই মুক্ত যুক্ত-অভিযানই প্রধান হয়ে ওঠে। নবযুগের প্রথম পর্বের বিত্তবান সম্ভ্রান্ত বাঙালীসমাজের সঙ্গে বিদ্বৎসমাজের তাই বিশেষ কোনো স্তরগত পার্থক্য দেখা যায় না। প্রথম যুগের বাঙালী বিদ্বৎসমাজ প্রধানত ধনিক সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যায়।

নতুন যুগে যে-বিদ্যার গৌরব ও মর্যাদা বাড়তে লাগল সমাজে, সে হল ইংরেজিবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা। ইংরেজিবিদ্যার সঙ্গে প্রথম থেকেই অর্থের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কারণ বিদেশী রাজার মাতৃভাষা 'ইংরেজি'। সামান্য ইংরেজি শিখলে বেনিয়ানি করা যায়, সাহেবদের হৌসে চাকরি পাওয়া যায়। সাহেবদের কাছে, কলকাতার ফিরিঙ্গিদের স্কুলে, প্রথমে ইংরেজিশিক্ষা আরম্ভ হল। পাদরি সাহেবরাও কিছু-কিছু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। এইসব বিদ্যালয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেরবোর্নের স্কুল, অ্যারাটুন পিত্রুসের স্কুল, ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল। পরে সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজিশিক্ষার জন্য প্রথম উদ্‌যোগী হনসম্ভ্রান্ত ধনী বাঙালীরাই, ইংরেজরা নন। ১৮১৭ সালে যখন 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এডোয়ার্ড হাইড ঈস্ট সাহেব অথবা ঘড়িব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার তার মধ্যে প্রধান উদ্‌যোগীরূপে থাকলেও, সম্ভ্রান্ত বাঙালীসমাজের প্রধানরা তার উদ্বোধক ও সমর্থক ছিলেন। প্রথমে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তন্তুবণিক সমাজের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে, চিৎপুরে। বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের পিতামহ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলেজের দেশীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দাস ও হরিমোহন ঠাকুরকে নিয়ে কলেজের প্রথম ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষসভা

গঠিত হয়। কলেজের গবর্নর হন গোপীমোহন ও বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র। এঁরা সকলেই ধনিক ও সম্রান্ত গোঁড়া হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। হিন্দু-কলেজই নব্যবঙ্গের পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা শিক্ষার আদি প্রধানকেন্দ্র। লক্ষণীয় হল, এই নতুন শিক্ষায়তন যখন প্রধানত সম্রান্ত বাঙালীদের চেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও ইংরেজ শাসকরা, ইংরেজি না সংস্কৃত, পাশ্চাত্ত্য না প্রাচ্য, কোন্ শিক্ষায় উৎসাহ দেবেন ও পোষকতা করবেন, সে সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেননি। তার সাত বছর পরে, ১৮২৪ সালে, অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁরা কলকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠা করাই সিদ্ধান্ত করেন। তার পরে আরও সাত-আট বছর ধবে Anglicists ও Orientalists, এই দুই দলের তর্কাতর্কি চলতে থাকে। ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব যখন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইংরেজিশিক্ষার পোষকতাব পক্ষে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবেন, তখন হিন্দুকলেজের বয়স আঠার বছর হয়েছে। এই আঠার বছবেব মধ্যে হিন্দুকলেজে শিক্ষিতদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, এবং তাঁরা নিজেবা পাশ্চাত্ত্য ও ইংবেজিবিদ্যার প্রসারের জন্য শিক্ষক ও মিশনারীর কাজ করে, শিক্ষিতের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন। কলকাতার তরুণ বিদ্বৎসমাজ 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পবিচিত হয়েছেন। নব্যবঙ্গের বিদ্বৎসমাজের নিশ্চিত বিকাশ হয়েছে। নবযুগের বাংলার বিদ্বৎসমাজ যে কেবল ইংরেজ শাসকদের উদ্‌যোগে গড়ে উঠেছে, একথা ইতিহাসের দিক থেকে ঠিক নয়। সম্রান্ত হিন্দু বাঙালীসমাজের উদ্‌যোগ নব্যবঙ্গের বিদ্বৎসমাজের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে বেশ সক্রিয় ছিল দেখা যায়।

মেকলে ও বেন্টিঙ্কের প্রস্তাবেব পাঁচ বছব আগে, ১৮৩০ সালে, অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ যখন কলকাতায় আসেন, তখন নব্যবঙ্গের তথা নব্যভারতের এই বিদ্বৎসমাজের বিকাশ লক্ষ্য করে, আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি লেখেন। "...in June 1830, when in the metropolis of British India, we fairly came in contact with a rising body of natives, who had learnt to think and to discuss all subjects with unshackled freedom...we hailed it as heralding the dawn of an auspicious era ."[১৩] ডাফ সাহেব অবশ্য শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যতটা না উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন, তরুণ শিক্ষিতসমাজের মধ্যে তাঁর খ্রীস্টধর্মের বাণী প্রচারের পথ সুগম হবে

[illegible] বিদ্বৎসমাজ

[illegible] ছিলেন। তিনি ও তাঁর সহযোগী

[illegible] 'এনকোয়ারার' দিয়ে এই সময় (১৮৩০-৩১ সালে)

[illegible] শিক্ষিত সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দের মতো নব্যবঙ্গের ইন্টেলেকচুয়ালদের তিনি খ্রীস্টধর্মে আকৃষ্ট করে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। আপাতত সে-ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়। ডাফ সাহেব আসার আগে এবং তাঁর আসার পাঁচ বছর পরে, ইংরেজ শাসকদের নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আগে, নবযুগের বাঙালী বিদ্বৎসমাজ যে রীতিমতো সাবালক হয়ে উঠেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'সাবালক' হয়ে উঠেছিলেন, কারণ প্রথম পর্বের yes-no-very-well-sir-গোছের ইংরেজি দু-চারটে বুলি-জানা ধনী বাঙালী বাবুসন্তানদের মতো তাঁরা কেবল বুলি শেখেননি। পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন, যুক্তিবাদ, হিউম্যানিজম প্রভৃতি প্রগতিশীল ভাবধারার মর্ম উপলব্ধি করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাব প্রযোগ-পরীক্ষার জন্যও তাঁরা সাহস করে অগ্রসর হয়েছিলেন। ম্যানহাইমের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, তাঁরা নতুন সমাজের জীবনদর্শনের interpreter হয়ে, নব্যবঙ্গের আদর্শ intelligentsia-তে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু—। কিন্তু নব্যবঙ্গের ইন্টেলিজেন্সিয়ার এই বিকাশের ধারাটা সুখের নয়। তার মধ্যে ট্র্যাজেডির উপকরণও ছিল যথেষ্ট। কিসের ট্র্যাজেডি?

বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী

প্রথম ও প্রধান ট্র্যাজেডি হল, বাংলার এই নতুন বিদ্বৎসমাজ প্রায় সম্পূর্ণ 'মুসলমানবর্জিত' রূপ ধারণ করল এবং সেইজন্য একে সাধারণভাবে 'বাঙালী বিদ্বৎসমাজ' না বলে, বিশেষ অর্থে 'বাঙালী হিন্দু বিদ্বৎসমাজ' বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমরা যখন নব্যবঙ্গের বা নবযুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি তখন কতকটা সচেতনভাবেই বাঙালী মুসলমানসমাজের এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাই। কিন্তু কোনো সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে ইতিহাস লেখা যায় না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তো নয়ই। বাংলার বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে তাই বাঙালী মুসলমানসমাজের কথা না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলার পুরাতন সমাজবিন্যাসের ভাঙাগড়া চলেছে এবং ইংরেজ আমলের নতুন সম্ভ্রান্ত ধনিকসমাজ গড়ে উঠেছে, তখন মুসলমান-

সমাজের অবস্থা কি? বাঙালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার সেই সময়ে ক্রমে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছেন। ইংরেজ আমলের নয়, তাঁদের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য ছিল মুসলমান আমলের। সেই ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য দুই-ই যখন তাঁদের লুপ্ত হয়ে গেল, তখন ইংরেজ আমলের নতুন সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজ গড়ে উঠল। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন: **"During the last seventy-five years the Musalman houses of Bengal have either disappeared from the earth, or at this moment being submerged beneath the new strata of society which our rule has developed—"**।[১৪] ১৮৭০-৭১ সালে ***The Indian Mussalmans*** গ্রন্থে হাণ্টার এই কথা লেখেন। অর্থাৎ শোভাবাজার জোড়াসাঁকো পাথুরিয়াঘাটা বাগবাজার শ্যামবাজার কলুটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে, নতুন রাজধানী কলকাতায়, যখন ইংরেজ আমলের সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবার-প্রতিষ্ঠাতারা ধনসমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মুর্শিদাবাদ হুগলি প্রভৃতি পুরাতন মুসলমান শাসনকেন্দ্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছিল। বাঙালী দেওয়ান-বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দিদের মধ্যে মুসলমানের নাম একরকম পাওয়াই যায় না বলা চলে। তার প্রধান কারণ বাঙালী মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষ সেইসময় অনেক বেশি তীব্র ছিল। ইংরেজরা তখনও এদেশ থেকে মুসলমানরাজত্বের symbolগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সাহস পাননি। পলাশীর যুদ্ধের পরে আরও প্রায় একশো বছর পর্যন্ত তাঁরা এদেশের লুণ্ঠিত মুসলমান রাজমুকুটটিকে দূর থেকে ভয় করেছেন এবং কিছুটা মেনেও চলেছেন। মুসলমানসমাজ তাই সর্বক্ষেত্রে, রাজচ্যুতি ও মর্যাদাহানির বিক্ষোভ থেকে, ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। শিক্ষা রাজসম্মান ইত্যাদি কোনক্ষেত্রেই তাঁরা কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে চাননি, বরং তাঁদের অসহযোগনীতির পূর্ণ সুযোগ ইংরেজরা তাঁদের শাসনস্বার্থে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজরা সেই সুযোগে, শিক্ষা ও অর্থ উভয়ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে হিন্দুসমাজকে সাহায্য করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বীজ বপন করে ভবিষ্যতের জন্য তাঁদের সিংহাসনটিকে অটল করবার চেষ্টা করেছেন।

নতুন ইংরেজিশিক্ষাকে মুসলমানসমাজ প্রথমদিকে ভাল চোখে দেখতেন না। তার দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করলেই তাঁদের মনোভাব পরিষ্কার

তোলা যাবে। ১৮৩৫ সালে যখন ইংরেজিশিক্ষার পক্ষে বেন্টিঙ্ক-মেকলের নতুন নীতি প্রবর্তিত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে কলকাতার মুসলমানসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করেন।[১৫] আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাদপত্র গবর্নমেন্টের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৫০ সালে যখন কলকাতা মাদ্রাসায় একজন ইয়োরোপীয়ান অধ্যক্ষ নিয়োগ করার প্রস্তাব হয় এবং কৌন্সিলের পরামর্শে ডক্টর স্প্রেঙ্গার নিযুক্ত হন, তখন মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। স্প্রেঙ্গার সাহেব যখন মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করার চেষ্টা করেন, তখন এই ধূমায়িত অসন্তোষের প্রকাশ হয় বাইরে। মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্ররা একদিন ইংরেজ অধ্যক্ষের গায়ে ইটপাটকেল ও পচা ফল ছুঁড়ে আক্রমণ করেন।' মুসলমান ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পুলিশী নির্যাতনে বিক্ষোভ দমন করা হয় এবং তদন্ত চলতে থাকে।[১৬]

কলকাতা মাদ্রাসা থেকে হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজ বেশি দূর নয়। ওয়েলেসলি থেকে গোলদীঘির (কলেজ স্কোয়ার) দূরত্ব। কিন্তু ১৮৩৫ সালে যখন কলকাতা শহরের আটহাজার মুসলমান মেকলের ইংরেজিশিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ১৮৫০ সালে যখন মাদ্রাসায় ইংরেজ অধ্যক্ষকে মুসলমান ছাত্ররা ইটপাটকেল ও পচা ফল ছুঁড়ে মেরেছিলেন, তখন ওয়েলেসলি থেকে গোলদীঘির দূরত্ব একটা যুগের দূরত্বে পরিণত হয়েছে বলা চলে। হিন্দুসমাজে ক্রমবর্ধমান একটি শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন একটি বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মুসলমানসমাজে নতুন মধ্যশ্রেণীর বিকাশ তো একেবারেই হয়নি, পুরাতন অভিজাতসমাজ ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে এবং দরিদ্র ও নিঃস্বশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে। নতুন কোনো বিদ্বৎসমাজেরও বিকাশ হয়নি। গোলদীঘি ও জানবাজারের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান রচিত হয়েছে— বাস্তব অবস্থার ও মানসিক অবস্থার বিরাট ব্যবধান।

১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট লর্ড মেও ভারতীয় মুসলমানসমাজের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারকে সর্বত্র তদন্ত করতে বলেন। তদন্তের পর বাংলার লেফ্‌টন্যান্ট-গবর্নর মন্তব্য করেন (**Letter No. 2918, dated the 17th August, 1872**): "আমার ভয় হয়, আমরা মুসলমানদের প্রতি

শিক্ষার দিক দিয়ে সুবিচার করিনি। আমি বার্নাডের 'নোট' থেকে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে দেখছি, শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্টিং এজেন্সীতে একজনও মুসলমান কর্মচারী নেই। গবর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে একজনও মুসলমান আছেন কিনা সন্দেহ। বাংলার সরকারী শিক্ষাবিভাগ হিন্দুদের বিভাগ বললেও ভুল হয় না। উপরের স্তর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত সমস্ত চাকরিগুলি হিন্দুদের একচেটিয়া দখলে।"[১৭] হাণ্টার সাহেব এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত *The Indian Mussalmans* গ্রন্থ লেখেন, প্রধানত ব্রিটিশনীতির পক্ষে ওকালতি করবার জন্য। তার মধ্যেও তিনি মুসলমানসমাজের যে চিত্র এঁকেছেন তা ভয়াবহ। ১৮৭১ সালে বাংলা দেশে নানাবিভাগের সরকারী চাকরির একটি সম্প্রদায়গত হিসেব দাখিল করেছেন হাণ্টার সাহেব। তাতে দেখা যায়, সমস্ত বিভাগের সবকারী উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীদের মোট সংখ্যা ২,১১১ জন, তার মধ্যে ইয়োরোপীয় ১,৩৩৮ জন, হিন্দু ৬৮১ জন, এবং মুসলমান মাত্র ৯২ জন। এই হিসেব দাখিল করে হাণ্টার মন্তব্য করেছেন: **A hundred years ago, the Musalmans monopolized all the important offices of State** (একথাও সত্য নয়, কারণ সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজের অনেকে মুসলমান আমলের দায়িত্বশীল রাজকর্মচারী পদে ছিলেন)… **and, in fact, there is now scarcely a Government office in Calcutta in which a Muhammadan can hope for any post above the rank of porter, messenger, filler of ink-pots and menders of pens.**"[১৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার মুসলমান সমাজের এই ভয়াবহ চিত্রের কথা মনে করলেই, নব্যবঙ্গের বিদ্বৎসমাজের বিকাশের মধ্যে 'ট্র্যাজেডি' কোথায় ও কেন, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

এই ট্র্যাজেডির রচয়িতা প্রধানত ইংরেজ শাসকরা, এবং কিছুটা উদীয়মান হিন্দু সম্ভ্রান্ত সমাজ বা বিদ্বৎসমাজ। উচ্চস্তবেব হিন্দুসমাজে হিন্দুত্বপ্রীতির আধিক্য ছিল, বিসদৃশ আতিশয্যও ছিল। 'ধর্মসভার' পৃষ্ঠপোষকদের কথা বলা যেতে পারে, যদিও হিন্দুপ্রীতি আর মুসলমানবিদ্বেষ অভিন্ন মনোভাব নয়। ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজও প্রধানত হিন্দুসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, মুসলমানসমাজের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। একথা আমরা আলাপ-আলোচনায় ভুলে গেলেও, ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে অস্বীকার করার উপায়

নেই। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে ইয়ং বেঙ্গল বা ব্রাহ্মসমাজের কোনো সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মনোভাব ছিল, বা মুসলমানবিদ্বেষ ছিল। আসল ঐতিহাসিক কারণ, নতুন হিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও বৃদ্ধি। এই মধ্যশ্রেণীই সর্বত্র নবযুগের প্রগতিশীল অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যের আদর্শের বাহক ও প্রচারক। **Urban population ও Middle class**—এই দুটিই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সক্রিয় প্রগতিশীল শক্তি। ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন :[১৯]

> **Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history... where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation.**'

হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও হিন্দু বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ফলেই রিনেসান্স (সংকীর্ণ অর্থে) ও রিফর্মেশন আন্দোলন হিন্দুসমাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। হিন্দুসমাজ নিজেদের যুগশক্তি ও গতিশীলতার জোরে অগ্রসর হয়েছেন। প্রগতি আন্দোলন বলতে তাই তখন বোঝাত হিন্দুসমাজের সংস্কার ও শিক্ষার প্রগতি। তা ছাড়া, হিন্দুসমাজের সংস্কারের সমস্যাও বোধ হয় তখন মুসলমানসমাজের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সংস্কারের সামাজিক তাগিদও ছিল বেশি। হিন্দুসমাজ তখন অশিক্ষা দুর্নীতি ধর্মব্যভিচার অনাচার কুসংস্কার ইত্যাদির পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। মুসলমানসমাজের মধ্যে যেটুকু প্রাণস্পন্দন ছিল, সতেজতা ছিল, হিন্দুসমাজে তা ছিল না। তার ঐতিহাসিক মূল সন্ধান করতে হলে, হিন্দু সেনযুগ পর্যন্ত যেতে হয়। হিন্দু-সমাজের সর্বাঙ্গীন সংস্কারের প্রয়োজনও ছিল যথেষ্ট। নতুন হিন্দুপ্রধান বাঙালী মধ্যশ্রেণী ও বিদ্বৎসমাজ তাই হিন্দুসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাঁদের নবজাগ্রত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ছিল হিন্দু সমাজ। নবযুগের '**Enlightenment**' ও '**Humanism**'-এর অগ্রদূত বাংলার 'ইয়ং বেঙ্গল' দলও তাই হিন্দুসমাজের বাইরের সমস্যা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে পারেননি। মুসলমানসমাজের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু তাই বলে কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারঞ্জন, তারাচাঁদ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি ইয়ং বেঙ্গলের অগ্রগণ্যদের 'সাম্প্রদায়িক' বলে অভিযুক্ত করা যুক্তিসম্মত নয়। যাঁরা সেই সময় তারুণ্যের চপলতাবশত গোমাংস ভক্ষণ করে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর

গৃহে গোহাড় নিক্ষেপ করতেও কুণ্ঠিত হননি (১৮৩১ সালের ঘটনা), হিন্দু-সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মাচরণের মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে শক্তিশালী হিন্দু সমাজনেতাদের প্রচণ্ড আক্রমণ নির্ভীকচিত্তে প্রতিরোধ করেছেন, তাঁরা আর যাই থাকুন, 'সাম্প্রদায়িক' ছিলেন না। নবযুগের অতিসংকীর্ণ রিনেসাঁস ও রিফর্মেশন আন্দোলন, ঐতিহাসিক কারণে, হিন্দুসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তার মধ্যে সচেতন 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে কিছু ছিল বলে মনে হয় না। এই চেতনা পরবর্তীকালে ইংরেজরা কৌশলে জাগিয়ে তুলে ঐতিহাসিক ফাঁকটুকু পূরণ করেছেন মাত্র।

১৮৭০-৭১ সালে যখন মুসলমানসমাজের শিক্ষার দিকে ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তখন তার মধ্যে কোনো বিশেষ মুসলমানপ্রীতি বা সমবেদনা বলে কিছু ছিল না। এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হিন্দু মধ্যশ্রেণীর মনে নানারকমের অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মধ্যে তার প্রকাশ হচ্ছে একদিকে। হিন্দু মধ্যশ্রেণী তখন পরিণত ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। তাঁদের দাবিদাওয়া বাড়ছে। রাজনীতির নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রবেশ করছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অনেক, উচ্চাশা অনেক, কিন্তু তা পূরণ করবার মতো সুযোগ সেই অনুপাতে অনেক কম। এইসময় ইংরেজরা মুসলমানসমাজের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁরা দেখলেন যে যদি এইসময় মুসলমানসমাজের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্য-শ্রেণী ও বিদ্বৎসমাজের বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উপর দাঁড়িয়ে আরও কিছুকাল রাজত্ব করতে পারেন। মুসলমানসমাজেও এর মধ্যে নতুন চেতনার বিকাশ হচ্ছিল। নতুন সুযোগের অভাব বোধ করছিলেন তাঁরা। এমন সময় ইংরেজরা তাঁদের সুযোগ করে দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে বাংলার মুসলমানসমাজের মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বৎগোষ্ঠীর বিকাশ আরম্ভ হল। ঠিক এইসময় থেকেই হিন্দু মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বৎসমাজের ক্রমাবনতি আরম্ভ হল বললে ভুল হয় না। অর্থাৎ অগ্রগতির চুড়োয় পৌঁছে যখন হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিদ্বৎসমাজের অধোগতি আরম্ভ হল, মুসলমান মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বৎসমাজের উত্থান শুরু হল তখন থেকে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমানসমাজের পতন-উত্থানের এই যুগসন্ধিক্ষণে, হিন্দুসমাজের উত্থানপর্বের মুসলমানবর্জিত রূপের অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি প্রকট হয়ে উঠল।

হিন্দুসমাজের উদারতা মানবতা ও সংস্কার-আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান (Revival) আন্দোলনে পরিণত হল। 'হিন্দু'-প্রীতি ক্রমে

'হিন্দুত্ব'-প্রীতির ভিতর দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতায়' পর্যবসিত হল। রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গল-বিদ্যাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের যুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেল। যুক্তির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে এল কুসংস্কার, উদারতার বদলে সঙ্কীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বিদ্বৎ-সমাজ যে প্রৌঢ় হয়েছেন তা বোঝা গেল। বার্ধক্যের উপসর্গ বিদ্বৎসমাজের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। মুসলমানবর্জিত তথাকথিত রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রায়শ্চিত্ত করা হল চরম প্রতিক্রিয়াশীল রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সূত্রপাত করে, বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি সব বিসর্জন ও বন্ধক দিয়ে। সেই গুরুবাদ ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল ইয়ং বেঙ্গল ও বিদ্যাসাগরযুগের যুক্তিবাদ স্বাতন্ত্র্যবাদ, যা কিছু ভাল সব। 'Age of Reason', 'Humanism' ও 'Philosophy of Enlightenment'-এর উত্তরাধিকারীরা গুরু-অবতারের যুগের পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেন। আজও সেই পাঁক থেকে তাঁরা গাত্রোত্থান করতে পারেননি। বরং ক্রমেই পাঁকের মধ্যে, যুক্তিহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার অতল অন্ধকারে, তাঁরা আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছেন। বাংলার এই হিন্দু বিদ্বৎ-সমাজের উত্থান-পতনের ধারার দিকে চেয়ে মনে হয়—"The Decline and Fall of Bengali Hindu Intellect"—সম্বন্ধে যদি কেউ ইতিহাস রচনা করেন, তাহলে গিবনের রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের তুলনায় তা কম 'মনুমেণ্টাল' হবে না।

১৮৫০-৫৫ থেকে ১৯৫০-৫৫ সাল পর্যন্ত একশো বছরের ইতিহাস। এর মধ্যে বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে, বিদ্বৎসমাজের কলেবরও যথেষ্ট স্ফীত হয়েছে। বাঙালীর দৈহিক আকৃতির মতো, বাঙালী সমাজেরও আকৃতির অসামঞ্জস্য বেড়েছে। উপর ও নিচের অংশ ক্রমে শীর্ণ হয়ে গিয়ে, বয়সকালে যেমন মধ্যের পেটটি ফুলে উঠে দেহ থেকে এগিয়ে আসে, বাঙালী সমাজেরও বয়সকালে ঠিক তাই হল। উপরের 'ধনিক' বা 'ক্যাপিট্যালিস্ট-শ্রেণী' ক্রমে সঙ্কুচিত হয়েছেন, নিচের কৃষক ও মজুরশ্রেণী ক্রমে শীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হয়েছেন, কেবল মধ্যের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতশ্রেণী স্ফীতোদরের মতো এগিয়ে এসেছেন। এই স্ফীতির ফলে তাঁদের সমস্যাও বেড়েছে। শিক্ষিত-শ্রেণীর বেকারত্ব বেড়েছে, বাড়ছে এবং ক্রমেই বাড়বে। কারণ, টয়েনবির ভাষায়, 'the process of manufacturing an intelligentsia is

more difficult to stop than to start'. তা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় পোষকতাও ক্রমে দলগত (রাজনৈতিক) ও গোষ্ঠীগত হয়ে উঠেছে, আধুনিক বিকৃত গণতন্ত্রের মাহাত্ম্যের গুণে। যোগ্যতার সুবিচার করা হয় না। সুতরাং সবদিক দিয়ে, গণতন্ত্রের যত বয়স বাড়ে বিদ্বৎসমাজের অসন্তোষ তত বাড়তে থাকে, ব্যর্থতাও তীব্রতর হয়। টয়েন্‌বি এসম্বন্ধে সুন্দর একটি কথা বলেছেন—[২০]

> Indeed, we might almost formulate a 'social law' to the effect that an intelligentsia's congenital unhappiness increases in geometrical ratio with the arithmetical progress of time.

এই বেকার-জীবন, অবিচারবোধ, ব্যর্থতার গ্লানিবোধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ক্রমে বিষিয়ে তোলে। ম্যানহাইম বলেছেন, মানুষের যখন 'life-plan' নষ্ট হয়ে যায়, তখন তার 'personal rationalisation' বলে কিছু থাকে না এবং ক্রমে সে যাবতীয় 'miraculous cure-alls'-এর প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠে।[২১]

বাংলার বিদ্বৎসমাজের বর্তমান অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে। যুক্তিবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ক্রমেই বাঙালী বিদ্বৎসমাজের বড় একটা অংশ গুরুবাদ ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন। আরএকটা অংশ, যারা বিত্তলোভী ও ক্ষমতালোভী, তাঁরা শাসকশোষকদের অন্ধ স্তাবকতা করছেন, মান্ধাতার আমলের মামুলি বুলি কপ্‌চে। দার্শনিক কাণ্ট বলেছিলেন—"Enlightenment is the liberation of man from his self-caused state of minority." এ-উক্তি চিরস্মরণীয়। বৃহত্তর মানবসমাজ এই সভ্য-সমাজে 'self-caused state of minority'-তে জীবন কাটায়। সারাজীবনে তাঁদের মানসিক নাবালকত্ব ঘোচে না। এই নাবালকত্ব 'self-caused, অর্থাৎ তাঁরা নিজেরাই তার জন্য দায়ী। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকার রাজ্য থেকে তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বাধীন যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকরাজ্যে আসতে চান না। কাণ্টের 'self-caused' কথাটি অবশ্য ধোঁয়াটে ও অসত্য, কারণ জ্ঞানের আলোকরাজ্যে সমাজের অধিকাংশ মানুষের আজ প্রবেশাধিকার নেই, শোষণমুখী শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার জন্য। তবে কাণ্টের এই উক্তি আমাদের দেশের শিক্ষিতশ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., এম. এসসি., 'ডক্টররা' যখন মানবাতারের পুজোয় মেতে ওঠেন, অলিগলিতে 'গুরু' খুঁজে বেড়ান, অদৃষ্ট ও ভৌতিক cure-all-এ বিশ্বাস করেন, একহাতে তাবিচ-মাদুলি আর-একহাতে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রী নিয়ে বিদ্বান বলে পরিচয় দেন,

তখন তাঁদের মানসিক নাবালকত্ব self-caused ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! আর্থিক সঙ্কট, বেকার জীবন, নানারকম ব্যর্থতার গ্লানি, সব মিলিয়ে যখন লাইফ্‌প্ল্যানটিকে নষ্ট করে দেয়, তখন মানুষ যুক্তিবুদ্ধির হাল ছেড়ে দিয়ে এইভাবে ভরাডুবি হয়। কথাটা ঠিক, কিন্তু কেবল সেই কারণে দেড়শো বছর পরে বাংলার বিদ্বৎসমাজের এ-অবস্থা হবে কেন? আর্থিক সমস্যার বা অবস্থার যত প্রাধান্যই থাক জীবনে, মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর তার যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণশক্তি স্বীকার্য নয়।

বিদ্যাসাগর যখন ছাত্রজীবনে 'বিদ্যা' সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং' তখন কথাটা অনেকটা সত্য ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের জীবনেও তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। আজ একথা অনেকটাই মিথ্যা। কিন্তু তাই বলে—

বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্য্যং

একথা মিথ্যা হবে কেন? বিত্তের অভাব বুদ্ধিবিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে, একথা অর্ধসত্য ছাড়া কিছু নয়। তা যদি না হত, তাহলে অসংখ্য বিত্তহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেকের সজাগতার পরিচয় পাওয়া যেত না।

অতএব কেবল আর্থনীতিক সঙ্কটের যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে বাংলার বিদ্বৎসমাজের একটা বিরাট অংশের এই বুদ্ধিবিপর্যয় ও বিমূঢ়তা ব্যাখ্যা করা যায় না। তা ছাড়া, আরও গভীর কারণ আছে মনে হয়। যে-পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা আমরা যেসময় যে-পদ্ধতিতে আয়ত্ত করেছিলাম, তার মূলে কোথাও মারাত্মক গলদ ছিল। নবযুগের 'হিউম্যানিস্ট' শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারিনি। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে তার integration সম্ভব হয়নি। শিক্ষা ও তার সমীকরণের মধ্যে একটা বড় ফাঁক ছিল, তাই আজ বাংলার বিদ্বৎসমাজের জীবনে 'বরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলার বিদ্বৎসমাজের উত্থান-পতনের এই ঐতিহাসিক রেখাচিত্রের মধ্যে আশানিরাশার কথা আমি কিছু বলিনি। আজকের অধঃপতনের মধ্যে ভবিষ্যতের পুনরভ্যুত্থানের কোনো বীজ নিহিত আছে কি না, সে-সম্বন্ধে গণৎকারী করারও ইচ্ছা আমার নেই। বিদ্বৎসমাজ যে সামাজিক 'শ্রেণী' নন এবং শ্রেণী-সংহতি বা চেতনা বলে যে তাঁদের মধ্যে কিছু নেই, একথা গোড়াতেই বলেছি। ম্যানহাইম যে শিক্ষার বন্ধনের কথা বলেছেন, বর্তমান যুগে তার দৃঢ়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিদ্বৎসমাজ

ভবিষ্যতে শ্রেণীসচেতন হতে পারেন বলে ম্যানহাইম যে ইঙ্গিত করেছেন, তারও কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।[২২] শিক্ষা-অর্থ বিত্ত-বিদ্যার যমজ-সম্পর্ক সমাজে ক্রমেই গভীর হচ্ছে। যত গভীর হচ্ছে, তত বিত্তের শ্রেণীবিন্যাস ও বিদ্যার স্তরবিন্যাস 'কো-রিলেটেড' হচ্ছে। বিত্তমান মধ্যবিত্ত স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন—মোটামুটি এই চারশ্রেণীর সঙ্গে বিদ্বৎসমাজের স্তরগত সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। বিদ্বান মধ্যবিদ্বান স্বল্পবিদ্বান বিদ্যাহীন, এইভাবে অবশ্য নয়। বিদ্যা মানদণ্ডই নয়, স্বার্থ ও সুযোগই মানদণ্ড। সুতরাং বিদ্বানদের মধ্যে ভাগ্যবান মধ্যভাগ্য স্বল্পভাগ্য ভাগ্যহীন—এইভাবে স্তরভেদ হচ্ছে বললেই সঙ্গত হয়। ভাগ্য, আর্থিক সাফল্য ও সমাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, এসমাজে অভিন্ন। তাই বিত্ত বিদ্যা ও সামাজিক প্রভাব ক্রমেই অঙ্গাঙ্গি হয়ে উঠছে। তার ফলে বিদ্বৎসমাজে বিভেদ বৈষম্য বাড়ছে, গোষ্ঠী-পোষকতা ও দলাদলি বাড়ছে, ঠিক রাজনীতিক্ষেত্রের মতো। শিক্ষার বন্ধন আর টিকছে না। শিক্ষার 'মান' বলে তো কিছুই নেই। এমনকি সমাজবোধ ('কমিউনিটি' অর্থে) পর্যন্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তরুণ বিদ্বৎসমাজের পক্ষে হিউম্যানিজম্‌-এর যুগের পুনঃপ্রবর্তন করা, সামাজিক নবজাগরণের পথ আবার আগাছা কেটে তৈরি করা খুবই কঠিন। কারণ এযুগের তরুণ বিদ্বৎসমাজের অধিকাংশই 'ভাগ্যহীন' স্তরের। উনবিংশ শতাব্দীর 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অনেকেই ভাগ্যবান ও বিত্তবানদের সন্তান ছিলেন। সেকথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। বিংশ শতাব্দীর 'ইয়ং বেঙ্গল' সাধারণত 'ভাগ্যহীন' ও 'বিত্তহীন'। বাংলার হিন্দু বিদ্বৎসমাজের পুনর্জীবন তাই সহজলভ্য বলে মনে হয় না। কারণ পুনর্জীবনের জন্য যাঁরা আজ সংগ্রাম করবেন, তাঁরা নিজেদের প্রাণধারণের সংগ্রামেই ব্যস্ত। বিদ্যাসাধনার বা সুচিন্তার সুযোগ নেই তাঁদের। আগে বিদ্বৎজনের যে ব্যাখ্যা করেছি, অর্থাৎ যাঁরা 'vocationally concerned with things of the mind', তাঁরাই যদি প্রকৃত বিদ্বৎজন হন, তাহলে এযুগের বর্ধিষ্ণু শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে কয়জন 'বিদ্বৎজন' বলে গণ্য হবেন, সন্দেহ আছে। অন্নচিন্তার মধ্যে, নিরাপত্তার দুর্ভাবনার মধ্যে, বিশুদ্ধ মননের সুযোগ কোথায়? তাই প্রবীণ বিদ্বৎসমাজ গুহামানবের অন্ধকারযুগে পশ্চাদপসরণ করছেন দেখেও নবীন বিদ্বৎসমাজ কিছু করতে পারছেন না, নীরবে অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে তাঁদের 'সিলুয়েটেড রিট্রিট' দেখছেন।

১। Max Weber : *Essays in Sociology* (London, 1947), Part II, Sec. VII, pp. 180-86.

২। Arnold Toynbee : *A Study of History* (Abridged, London, 1951), pp. 393-96.

"We can also observe another fact in the life of an intelligentsia which is written large upon its countenance for all to read : an intelligentsia is born to be unhappy". (p. 394).

"This liaison-class suffers from the congenital unhappiness of the hybrid who is an outcaste from both the families that have combined to beget him" (p. 394).

৩। Karl Mannheim : *Ideology and Utopia*, An Introduction to the Sociology of Knowledge. (London 1936) : Chapter III, Sec. 4—"The Sociological Problem of the Intelligentsia" (pp. 136-46).

৪। *Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. 8—'Intellectuals' by Roberto Michels.

৫। *Ideology and Utopia*, p. 9.

৬। Michels : *'Intellectuals'* (E. S. Sc.).

৭। K. Mannheim : *Ideology and Utopia*, p. 10.

৮। Alfred Von Martin : *Sociology of the Renaissance*, (London 1945).

Chapter I (f)—'Functions of Erudition and Learning', pp, 27-30).

৯। Karl Mannheim . *Man and Society* (London 1940), 'Selection of Elites", p. 89.

১০। *Class, Status and Power, A Reader in Social Stratification* : Edited by Reinhard Bendix and Seymour Martin Lipset, (London 1954), Part II, "Who's Who in America and the Social Register ; Elite and Upper Class Indexes in Metropolitan America by E. Digby Baltzell, pp. 172-184.

আমেরিকায় The Register Association আছে। বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলের পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধান করে সংকলন ও প্রকাশ করা তাদের কাজ।

১১। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (১) সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি (তিন খণ্ড), (২) কলিকাতায় তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস : নগেন্দ্রনাথ শেঠ, (৩) The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc., Part II, by Lokenath Ghosh, (৪) Buckland . Dictionary of Indian Biography, (৫) Kisorichand Mitra : Memoir of Dwarkanath Tagore, (৬) The Tagore Family, (৭) Girish Chandra Ghosh : Ramdulal De.

১২। মার্টিন : পূর্বোক্ত গ্রন্থ

১৩। Alexander Duff : *India and India Missions* (Edin 1840), Appendix, p. 631.

১৪। W. W. Hunter : *The Indian Musalmans* (Calcutta Reprint 1945) : Chapter IV, p. 157.

১৫। M. Azizul Huque ; *History and Problems of Moslem Education in Bengal* (Calcutta 1917).

"This period was remarkable for the steady efforts to spread English education among all sections of the people ; but the Mussalmans paid no

heed to the changing needs of the time. They bitterly opposed the policy of the state laid in the Resolution of 1835, and there was a petition from the Mussalmans of Calcutta signed by 8000 people opposing the Government resolution." (p. 20).

১৬। M. Azizul Huque. *History and Problems of Moslem Education in Bengal* (Calcutta 1917).

"All the suggestions of the Council were acceded to and Dr. Aloys Sprenger was appointed to the office of the Principal of the Calcutta and visitor and Director of the Hughly Madrassahs. He incurred the displeasure of the students in introducing certain reforms. A disturbance took place, he was pelted by brickbats and rotten mangoes and the Police were called in to expell the mutinous boys. A committee of enquiry was appointed..." (p. 22).

১৭। "The Lieutenant-Governor fears that the Mahomedans have not been very fairly treated in regard to our educational mechinery. Mr. Bernard's note shows that not a single member of the Inspecting agency is a Mahomedan, there is scarcely, if at all, a Mahomedan in the ordinary ranks of schoolmasters of Government School. The Bengal Educational Department may be said to be a Hindu institution Hindus have monopolised all the place below the highest and all the executive management." (Quoted in Huque's 'History, p 36).

১৮। Hunter *The Indian Musulmans* p 161

১৯। A. F. Pollard. *Factors in Modern History* (London 1932). p 43

২০। Toynbee: *A Study of History*, p 395

"The candidates increase out of all proportion to the opportunities for employing them, and the original nucleus of the employed intelligentsia becomes swamped by an intellectual proletariat which is idle and destitute as well as outcaste ..and the bitterness of the intelligentsia is incomparably greater in the latter state than in the former" (p 395)

২১। Karl Mannheim *Man and Society* Studies in Modern Social Structure (London 1940), Part II, 'Social Causes of the Contemporary Crisis in Culture".

"The most important negative effect of unemployment consists in the destruction of what may be called the 'life-plan' of the individual The 'life-plan' is a very vital form of personal rationalisation, inasmuch as it restrains the individual from responding immediately to every passing stimulus. Its disruption heightens the individual's susceptibility to suggestions to an extraordinary degree and strengthen belief in miraculous 'cure-alls'." (p. 104, footnote).

২২। Karl Mannheim. *Ideology and Utopia*, pp. 141-42.

"One of the basic tendencies in the contemporary world is the gradual awakening of class-consciousness in all classes. If this is so, it follows that even the intellectuals will arrive at a consciousness—though not a class-consciousness—of their own general social position and the problems and opportunities involved."

বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমস্যা

অবশেষে সত্যিই যেদিন রাখালের পালে বাঘ পড়েছিল, সেদিন তার চীৎকারে কেউ কর্ণপাত করেনি। বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমস্যার কথা অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই তার গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছিল। শেষপাদ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্ত গুঞ্জনের গাম্ভীর্য বেড়েছে। অতঃপর রীতিমত তা কোলাহলে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কোলাহল রূপ নিয়েছে সোরগোলে। কিন্তু সেদিনের গুঞ্জনের সুরে যারা সাড়া দিয়েছিল, আজকের কোলাহলে ও সোরগোলে তারা কালা হয়ে বসে আছে। অর্থাৎ রাখালের পালে বাঘ যখন সত্যিই পড়েছে তখন কারও দেখা নেই, প্রতিবেশীরাও উদাসীন। সমস্যা অস্বীকার করার আগ্রহ যাঁদের মধ্যে প্রবল, তাঁদের মানসিক অবস্থা কতকটা অসহায় রোগীর ব্যাধি অস্বীকার করার মতো। সঙ্কটের সেটাও একটা উপসর্গ। সমাহিতি সবসময় স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। নিজেরাই যখন সজাগ নই, তখন প্রতিবেশীদের কথা স্বতন্ত্র। তা ছাড়া, প্রতিবেশীদের নাবালকত্বের কাল যে উত্তীর্ণ হয়েছে সে-বিষয়েও আমরা অচেতন। আজ তারা সাবালক হয়েছে। সম্মুখ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার জীবন-রণাঙ্গনে রাখালের চীৎকারে আজ কর্ণপাত করার অবকাশ নেই কারও। বাঙালীর অভিমান বেশি। অল্প আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়াও কতকটা তার জাতীয় স্বভাব। বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের কণ্টকিত পথে চলার চেয়ে হৃদয়বৃত্তি ও ভাবালুতার পুষ্পিত পথেই চলতে সে অভ্যস্ত। তাই সঙ্কটের দিনেও কাব্য-সাহিত্যের মনোহর বাগিচা রচনাতেই তার আত্মতৃপ্তি। কিন্তু গৃহকোণের নিভৃত বাগিচায় বৃহত্তর সমাজের ল্যাণ্ডস্কেপের সামান্য আভাস ছাড়া আর কিছু নাই। সমাজের জীবনপ্রবাহচিত্র তাতে বিশেষ প্রতিবিম্বিত হয় না। যেটুকু হয় তারও সবটুকু বাস্তব কিনা বিচার্য।

যত দিন কাটছে দেখা যাচ্ছে, হাত ঘুরিয়ে নাড়ু দেখিয়ে আর বুদ্ধিমানের ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো দেশেই হচ্ছে না। বাঙালীর ক্ষেত্রে যেটুকু হচ্ছে তা তার বিশ্লেষণবিমুখ ভাবালু মনের বিশিষ্ট গড়নের জন্য। তাই সমস্যার বা সঙ্কটের অনুধ্যানের চেয়ে, বাঙালী বিদ্বৎসমাজের মনে

অভিমান ও অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে বেশি। কিন্তু ব্যক্তি ও বহির্জীবনকে সংযুক্ত করার কাজে মনের পেশা কেবল ঘটকগিরি করা নয়। মনটাকে যাঁরা অনুঘটক বা 'ক্যাটালিটিক এজেন্ট' মনে করেন তারা অন্যের তো দূরের কথা, নিজেদের মনের কথাই জানেন না। মানুষের মন আর যাই হোক, ঘটক নয়। মনেরও গড়ন বদলায়, জীবনতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে। নৈয়ায়িক বাঙালী একদিন ভাবালুতার পিচ্ছিল পথে যেমন আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তেমনি আবার জীবনের নতুন স্রোতের টানে ন্যায় ও আবেগের সমন্বয় ঘটিয়ে সোজা হয়েও সে দাঁড়াতে পেরেছিল। ভবিষ্যতের সেই 'একদিনের' কথা আপাতত আলোচ্য নয়। বর্তমানের সমস্যাই বিচার্য।

বিদ্বৎসমাজের সমস্যা অনেক, সঙ্কটের কারণও একাধিক। প্রথম সমস্যা বহু পুরাতন অন্নসমস্যা বা জীবিকার সমস্যা। বুদ্ধিতে যখন পেট ভরে না এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যখন দেখা যায় যে পেট না ভরলে বুদ্ধিও পুষ্টিলাভ করে না, তখন বাধ্য হয়ে বুদ্ধিজীবীকেও অন্যান্য সূক্ষ্মচিন্তার সঙ্গে অন্নের স্থূলচিন্তা করতে হয়। সে-চিন্তা সাধারণত বুদ্ধি বা প্রতিভার অনুশীলনে সাহায্য করে না। কথাটা সত্য হিসেবে খুব স্থূল হলেও অনেকসময় এই স্থূল সত্যটাকেও বুদ্ধির সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করে এমনভাবে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হয় যে বুদ্ধিজীবীও যে অন্নজীবী মানুষ তা বিশিষ্ট বুদ্ধিমানদেরও খেয়াল থাকে না। দ্বিতীয় সমস্যা হল, সমাজিক বিবোধের সমস্যা। দুর্বর্ষগতি যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে সমাজে সর্বাঙ্গিক গড়ন যত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, মানুষের মনের গড়ন তত দ্রুত বদলাচ্ছে না, বদলাতে পারেও না। সমাজের গতি যতটা যান্ত্রিক হতে পারে, মানুষের মনের গতি কখনই তা হতে পারে না। বুদ্ধিজীবীদের মন সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ বলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ধ্যানধারণার নোঙর খুলতে তাঁদের আরও বেশি দ্বিধা হয়। সামাজিক শ্রেণী বলে তাঁরা গণ্য হন বা না-ই হন, তাঁদের আত্মচেতনার প্রাখর্য শ্রেণীচেতনার তুলনায় বেশি ছাড়া কম উগ্র নয়। এই কারণেই বুদ্ধিজীবীর মনের স্থিতি বেশি, অর্থাৎ চিন্তাধারার নির্দিষ্ট খাতের প্রতি আসক্তি বেশি। সমাজমানসের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের বিরোধও এইজন্য অন্যান্য জনস্তরের তুলনায় বুদ্ধিজীবীর স্তরে তীব্রতর। সমাজের পরিবর্তনশীলতার গতিবৃদ্ধির ফলে এই বিরোধ ক্রমেই আরও তীব্রতর হতে থাকে। রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রের গণতন্ত্রায়ণ বা ডেমক্র্যাটাইজেশন সংস্কৃতিক্ষেত্রে

যত প্রতিভাত হচ্ছে তত আধুনিক বুদ্ধিজীবীর দীর্ঘকালের চিন্তাসংস্কারাচ্ছন্ন আড়ষ্ট মনের দ্বন্দ্ব-সংশয় বাড়ছে। তার ফলে তৃতীয় সমস্যা মননসঙ্কট (crisis of intellect) দেখা দিচ্ছে।

অন্নচিন্তায় অথবা অর্থচিন্তায় অনন্যমনা যিনি তাঁকে হয়ত বুদ্ধিজীবীর মর্যাদা দিতে অনেকেই কুন্ঠিত হবেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে একালের বুদ্ধিজীবীরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই সংস্কার নিয়ে। বিদ্যাবুদ্ধির চর্চার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোনো সম্পর্ক নেই, টাকাকড়ির স্পর্শ থেকে তাকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধিজীবীরা এমন এক উচ্চমার্গের ধ্যানমগ্ন সাধক, যেখানে সামাজিক জীবনস্রোতের কোনরকম কদর্যতার প্রভাব পৌছতে পারে না। বহুদিন তাই আইনজীবী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিজীবীর পবিত্র পঙ্‌ক্তিতে ঠাঁই পাননি। কবি-সাহিত্যিকরাও অনেকদিন পর্যন্ত নিজেদের রচনার অর্থমূল্য গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করতেন এবং সেইজন্য গোড়ার দিকে তাঁরা মুদ্রণেরও বিরোধী ছিলেন। সংস্কার যে অনেকটা সহজাত তা আধুনিক বুদ্ধিজীবীর এই মনোভাব থেকেই বোঝা যায়। রাজসভার নিরুপদ্রব পরিবেশে যাদের অতীত জীবন কেটেছে, হঠাৎ জনসমাজের দিকে অগ্রসর হতে তাঁরা স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করেছেন। তাছাড়া মান-মর্যাদা হারাবার ভয় তখনও প্রবল হয়নি। মধ্যযুগের সমাজে মানমর্যাদার মানদণ্ড স্থির ছিল এবং প্রধানত তা ছিল কুলবংশানুক্রমিক। অর্থের প্রভাবে তার পরিবর্তন হত না, পুরোহিত যাজকদের মতো বুদ্ধিজীবীরাও মানমর্যাদার দিকে স্পর্শাতীত ছিলেন। যে-সমাজে মর্যাদার কোনো 'মোবিলিটি' ছিল না, সে-সমাজের বুদ্ধিজীবীরা যে বুদ্ধির শুচিতার বড়াই করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অর্থের ছোঁয়াচ থেকে বিদ্যাচর্চাকে মুক্ত রাখার সঙ্কল্পও তখন অবাস্তব ছিল না। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজের চলার গতিতে বুদ্ধিজীবীর এই দম্ভের স্তম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল।

নতুন সমাজে মানমর্যাদা কীর্তি-কৃতিত্বের প্রায় একক মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াল অর্থ (M... oney)। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের সাধনা ও সাফল্যকে অতিক্রম করে আর্থিক সাফ... ...ন্যের প্রতিপত্তি স্বীকৃত হল সমাজে। তা যখন হল তখন অর্থমোহ-মুক্ত সাধনার উচ্চ... ...মার্গ থেকে বিদ্যাবুদ্ধিকে মর্ত্যের জীবনদ্বন্দ্বের মধ্যে টেনে নামানো ছাড়া বুদ্ধিজী... ...দের গত্যন্তর রইল না। অতীত আদর্শের কুশপুত্তলি দাহ করে তাঁরা যুগোপযোগী ... আদর্শের নতুন প্রতিমা গড়ে তুললেন। এই প্রতিমার

বাঁশখড়ের কাঠামোটি হল অর্থ তার উপর রঙচঙের সমস্ত প্রলেপটি হল বুদ্ধিজীবীদের নতুন কৃত্রিম আভিজাত্যের চেকনাই। এর প্রথম প্রকাশ হল রিনেস্যান্সের যুগের হিউম্যানিস্ট বিদ্যাকে বাজারের পণ্য করবার চেষ্টা। অর্জিত বিদ্যাও যেকোনো উৎপন্ন পণ্যের মতো আর্থিক বিনিময়মূল্য দাবি করতে পারে, হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীরা দৃঢ়কণ্ঠে একথা ঘোষণা করলেন। তার জন্য বিদ্বানকে প্রথমে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল বটে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির কেনাবেচায় সেই দেবত্ব কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াল না। ইনিয়াস সিলভিয়াস বললেন, দেবতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যা পার্থক্য বিদ্বানের সঙ্গে মূর্খের পার্থক্য তাই। একথা বলেও, হিউম্যানিস্টরা ঔ. । বিদ্যাবুদ্ধির মূলধন খাটিয়ে (ক্যাপিটালিস্টদের আর্থিক মূলধনের মতো) মুনাফালাভের জন্য তৎপর হলেন। 'মুনাফা' কথাটাই এখানে প্রযোজ্য, কারণ খোলাবাজারে সর্বাধিক চড়ামূল্যে বিদ্যার বিনিময় করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। বাজার হল নগর বা টাউন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তন, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। মার্টিন বলেছেন, অনেকক্ষেত্রে হিউম্যানিস্টদের এই প্রচেষ্টাকে 'ব্ল্যাকমেইল' ছাড়া কিছু বলা যায় না এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি পিয়েত্রো আরেতিনোর নাম উল্লেখ করেছেন। আরেতিনোকে তিনি বলেছেন, রিনেস্যান্সের যুগের 'সাহিত্যিক দুর্বৃত্ত ও দস্যু', কারণ তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের রচনা বিক্রি করে এবং অন্যকে অগ্নিমূল্যে তা কিনতে বাধ্য করে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। মার্টিনের উক্তি আরেতিনো সম্পর্কে স্মরণীয় :[১]

> He already represented the type of 'literary highwayman' (V. Bezold), his one wish was to make money by selling or forcing others to buy his pen. Yet this cynic, this professional literary blackmailer, represented the last 'refinement' of the type which was using its intellect for financial ends, the 'philosopher of money', tearing down the last barriers of traditional morality, of literary decency and the corporate feeling of the *literati*.'

অর্থলোভী সমাজের কোলাহল থেকে বিদ্যাবুদ্ধিকে কুলবধূর মতো অবগুণ্ঠিত রাখার জন্য বুদ্ধিজীবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা এইভাবে অবশ্যাচক্রে ব্যর্থ হয়। বুদ্ধি ও বিদ্যা এত বেশি পণ্যময় হয়ে ওঠে যে সিমেলের মতো বুদ্ধিবানরা টাকার সঙ্গে 'ইন্টিলেক্টের' স্টাইলিস্টিক 'সম্পর্কের কথা পরিষ্কার করে ব্যক্ত

করেন।' সিমেল বলেন, আধুনিক যুগের বিদ্যাবুদ্ধি হল টাকার মতো নীতিবহির্ভূত বা 'অ্যা-ময়াল' এবং নিরপেক্ষ বা 'নিউট্রাল'। টাকার যেমন নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই, কোনো নীতি বা আদর্শ নেই, আধুনিক মানুষের বিদ্যাবুদ্ধিরও তেমনি কোনো চরিত্র বা নীতি নেই। ঠিক ম্যানুফ্যাকচার্ড কমোডিটির মতো বাজারে তা কেনাবেচার জন্য লভ্য এবং ডিমাণ্ড-সাপ্লাইয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অনুপাতে তার বিনিময়মূল্য নির্ধার্য।

বিদ্যাবুদ্ধি ও টাকার প্রকৃতিগত ঐক্য অনস্বীকার্য হলেও, দুই মূলধনের মধ্যে বিরোধও ছিল গোড়া থেকে। বিদ্বান-বুদ্ধিমানের সঙ্গে বিত্তবানের বিরোধ। এই বিরোধ পরবর্তীকালে ক্রমেই কিভাবে তীব্র হয়ে ওঠে এবং সেই তীব্রতার কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। আপাতত আলোচ্য হল, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পূর্বোক্ত যুগলক্ষণ প্রকাশের বৈশিষ্ট্য কি এবং রিনেসান্সের পরিণতির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য আছে কি না।

প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আধুনিক বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাবকাল থেকেই ছিল না। বাংলার ও ইয়োরোপের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থাগত যে পার্থক্য ছিল তার জন্য এদেশের বুদ্ধিজীবীর অগ্রগতির পথ খানিকটা ভিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু চারিত্রিক ভিন্নতা তেমন কিছু ঘটেনি। বরং এদেশের শাসক হয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সংস্পর্শে আরও দ্রুত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যুগোপযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল। বাংলার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের আদর্শস্থানীয় রামমোহন ও বিদ্যাসাগরও এই যুগপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। বিদ্যা ও বাণিজ্যের মধ্যে যে প্রকৃতিগত ঐক্য আছে, তা তাঁরা গোড়া থেকেই বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। সেকালের বিদ্বৎজনের মতো বিদ্যাবুদ্ধির অপার্থিব শুচিতা সম্পর্কে তাঁদের কোনো সংস্কার ছিল না। কেবল হিন্দুকলেজে নয়, সংস্কৃত কলেজেও যাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরাও বিদ্যার পণ্যময়তায় বীতশ্রদ্ধ হননি। ইংরেজ শাসকরা শুরু থেকেই চাকরি ও টাকার সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধিকে এমনভাবে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন যে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা করে তা আবিষ্কার করতে হয়নি। ইংরেজ শাসকদের কৃপায় এ যুগের বিদ্যা ও বিত্তের দাম্পত্য-সম্পর্ক কতকটা যুগসত্যের মতো তাঁদের উন্মীলিত বুদ্ধির সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তাই কথায় কথায় জনপ্রবাদের মতো শোনা গেছে—'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'। সেকালের রাজসভায় প্রসাদপুষ্ট পণ্ডিতেরা এমন লোভনীয় কথা তাঁদের টোল-চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের বলতে পারতেন না। কিন্তু আধুনিকযুগে লেখাপড়ার সঙ্গে গাড়িঘোড়াকে এমনভাবে যুতে দেওয়া হল যে অধিকাংশ বিদ্বানের অদৃষ্টে তা ছ্যাকড়াগাড়ি অথবা ঠ্যালাগাড়ি হলেও তার অবিশ্রান্ত ঘড়ঘড়ানি থামেনি।

আধুনিক যুগের প্রায় প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যকতা যে আছে এবং অনেক বেড়েছে তা কেউ অস্বীকার করবেন না। বিদ্যার বহুরকমের স্তর-ভেদ ও শ্রেণীভেদ আছে। ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে অর্থের সম্পর্কও প্রত্যক্ষ হতে বাধ্য। তা ছাড়া, বিদ্যাবুদ্ধিজীবী অন্নজীবী বলে বিদ্যার উচ্চস্তরেও তা বায়ুভুক্ থ হতে পারে না এবং অর্থচিন্তা থেকে তার নিষ্কৃতিও সম্ভব নয়। রাজা-জমিদাররা যখন আর ভূমিদান বা প্রসাদ বিতরণ করেন না, তখন উচ্চমার্গের ইন্টিলেক্টের সাধকরাও যদি বর্তমান রাষ্ট্রিক বা সামাজিক পোষকতাপ্রার্থী হন, তাতেও দোষ নেই। বিদ্যার একনিষ্ঠ চর্চাকে অব্যাহত রেখে এবং বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেও এসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে কোনো বাধা হত না। কিন্তু তা হয়নি, বাধা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজেও হয়েছে আমাদের সমাজেও হয়েছে। সমাজের সঙ্গে সমাজের, দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব যে-যুগে অতিক্রত ঘুচে গিয়েছে, সে-যুগে বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এযুগে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জাত বাঁচিয়ে চলাও কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব। তাই দেখা যায়, ইয়োরোপে যেমন আধুনিক যুগে বিদ্যাবুদ্ধির বাণিজ্যিক রূপায়ন ঘটেছে, আমাদের দেশেও তা ঘটতে বিলম্ব হয়নি। বিদেশের তত্ত্বাবধানে বিদ্বান হবার জন্য এবং বিদেশী শাসকের প্রসাদপুষ্টির জন্য, বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির এই পরিণতি আরও অনেক বেশি দ্রুত ঘটেছে। তার কারণ, বিদেশীর স্বার্থের চাপে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিসর্জন না দিলেও, তার অনেকটা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বাতন্ত্র্যের যেটুকু ধারা প্রথম যুগে ছিল, তা ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে পরবর্তীকালের অবস্থাগতিকে। বর্তমানের ভিন্ন পরিবেশেও সেই ধারার কোনো চিহ্ন তাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দেড়শত বছরের এই ইতিহাস নিয়ে একটা ট্র্যাজিডি

চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শতবর্ষের ইতিহাস (১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত) প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সেই খাত বা খাল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ইঞ্জিনিয়াররাই কেটেছিলেন। সেই খাল দিয়ে শিক্ষার দাঁড় বেয়ে চলবার সময় আমরা বিদ্যার তরণীতে যে পাল তুলে দিয়েছিলাম তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল—'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে' (অবশ্যই ইংরেজ প্রভুর সেবা করে)। কিন্তু খাল কোনো নদীতে এবং নদী কোনো সমুদ্রে গিয়ে মিশল না। খাল বদ্ধ নালা হয়ে শেষ পর্যন্ত মজে গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে সামাজিক সঙ্কট যখন গভীর হতে থাকল তখন বুদ্ধিজীবীর মুখেই নতুন শিক্ষানীতির প্রবচন প্রহসনে পরিণত হয়ে হল—'লেখাপড়া করে যে, গাড়িচাপা পড়ে সে'। দেখা গেল, গাড়ি যারা সত্যিই চড়ে বেড়াচ্ছে তাদের অনেকেই লেখাপড়া করেনি এবং সমাজের রাজপথে, এমন কি অলিগলিতে পর্যন্ত, যারা তার তলায় দলিত হচ্ছে তাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নয়। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সকলের অগোচরে নিঃশব্দে যে সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটে গেল, আজ পর্যন্ত বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা তার দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। তার ফলে যে মানসিক বিভ্রান্তি, জটিলতা ও সঙ্কট দেখা দিয়েছে, অন্নবস্ত্র ও গাড়িঘোড়ার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, তা থেকে সর্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের মতো বাংলার বুদ্ধিজীবীরাও মুক্তি পাননি।

খালকাটার কাল থেকে আরম্ভ করি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে অ্যাংলিসিস্ট ও ওরিয়েন্টালিস্টদের মধ্যে শিক্ষানীতি নিয়ে যে বাক্‌যুদ্ধ চলছিল, লর্ড মেকলে তার মীমাংসা করে দিয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাবে বললেন: বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে সমাজে, যাঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি মতামত নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ।[২]

> **We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.**

বাঙালী ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ আমলের ইংরেজিশিক্ষিত শহুরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র মেকলের এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাঙালীদের মধ্যে আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠেছে, কারণ আধুনিক কালোপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি অর্জনের পথে সোৎসাহে যাত্রা করার সুযোগ তাঁরাই পেয়েছিলেন সর্বাগ্রে। এই দোভাষী বুদ্ধিজীবীদেরই ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছেন 'লিয়াজোঁ অফিসারশ্রেণী'।

সভ্যতার পতনের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে টয়েন্‌বি এই বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীকে বলেছেন পাশ্চাত্ত্য জগতের 'ইন্টারনাল প্রলেটারিয়েট'। দুই সভ্যতার সংঘাতকালে বিজয়ী উদ্‌বোধক সভ্যতার রীতিনীতি ও কলাকৌশল দ্রুত আয়ত্ত করে বুদ্ধিজীবীরা নতুন সামাজিক পরিবেশ উদবর্তনের যোগ্যতা অর্জন করেন এবং মনে ভাবেন যে দুই সভ্যতার উৎকৃষ্ট ফল তাঁরা। স্বদেশের ও বিদেশের উভয়সমাজের মানুষের কাছে তাঁরা অপরিত্যাজ্য। কিন্তু যত দিন যায় তত দেখা যায়, তাঁদের এই সামান্য সান্ত্বনাটুকুরও ঠাঁই নেই সমাজে। মানুষ নিজেই যে-সমাজে পণ্যতুল্য বা কমোডিটির মতো সেখানে তার ডিম্যাণ্ড-সাপ্লাইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সাধনাতীত ব্যাপার। সুতরাং আধুনিক বিদ্যাযন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় যখন পূর্ণবেগে বুদ্ধিজীবী ম্যানুফ্যাক্‌চার্ড হতে থাকে তখন অল্পদিনের মধ্যেই বাজারের ডিম্যাণ্ড ছাড়িয়ে যায় সাপ্লাই এবং অত্যুৎপাদনের উপসর্গ হিসেবে বেকার-সমস্যা ইত্যাদি দেখা দিতে থাকে। তোড়জোড় করে উৎপাদন আরম্ভ করা যত শক্ত, বন্ধ করা তত সহজ নয়, বিশেষ করে মানুষ-পণ্যের উৎপাদন। তার উপর বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষ যে-যন্ত্রে কমোডিটির মতো তৈরি হয়, সে-যন্ত্রের আবর্তন বন্ধ করা খুবই কঠিন। তার কারণ, ইনস্টিটিউশনগুলি সমাজের সবচেয়ে মজবুত যন্ত্র, একবার গড়ে উঠলে সহজে ভাঙতে চায় না। এই ইনস্টিটিউশন-যন্ত্রেই মানুষ-পণ্য তৈরি হয় সব সমাজে, বুদ্ধিজীবীরাও তৈরি হন। বাংলার সমাজেও ইংরেজ আমলে তাই হয়েছে। প্রথম যুগের কয়েকশত ইংরেজি ভাঙা-বুলিসর্বস্ব বাঙালী 'বাবু' পরবর্তীকালে হাজার হাজার বি-এ পাস এম-এ পাস, বি-এ ফেল এম-এ ফেল -বুদ্ধিজীবীদের দলবৃদ্ধি করেছেন।[৩]

টয়েন্‌বির এই উক্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বিখ্যাত গল্পের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। গল্পটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।[৪] একবার এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন—বিদ্যাসাগর মশাই,

আপনি তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র ফেলো, কিন্তু কেন এমন হয় বলুন দেখি ? যে ছেলেটি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে সেও যা লেখে, যে এনট্রান্স পাস করে সেও তাই লেখে, যে এল-এ পাস করে সেও তাই লেখে, যারা বি-এ এম-এ পাস করে তারাও তাই লেখে। কেন এমন হয় বলতে পারেন ? এর কি কিছু প্রতিকার নেই ? আপনারাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মা-বাপ, এর কি কিছু বিহিত করা যায় না ? যে-সময়ের কথা হচ্ছে, তখন লাহোর ছাড়া উত্তরভারতে আর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। আগ্রা থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল, নাগপুরও ছিল, লঙ্কাও ছিল। বিদ্যাসাগর মশায় দুটি গল্প বলে একথার উত্তর দেন। তার মধ্যে প্রথম গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর বলেন—'সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজ একই হাতার মধ্যে ছিল। হিন্দুকলেজের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খেত। আমরা দেখতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খেতে পারতাম না। কিন্তু দেখতে দেখতে যখন নেশা করার ঝোঁক প্রবল হল তখন আমরা কতকগুলি উঁচুক্লাসের ছেলে বাধ্য হয়ে সস্তায় ছিটে ধরলাম। অল্প খরচে বেশ নেশা হত। ক্রমে যখন একটু পেকে উঠলাম, আট-দশ ছিটে পর্যন্ত একটানে খাওয়া অভ্যাস হল, তখন আমাদের শখ হল যে বাগবাজারের বড় বড় গুলিখোরদের সঙ্গে টক্কর দেব। একদিন বাগবাজারের আড্ডায় গিয়ে দেখি, হলঘরে বসে সকলেই বেশ মৌজ হয়ে গুলি টানছে। হলঘরের পুবদিকে সবাই মাটিতে বসে খাচ্ছে, উত্তরদিকেও তাই, পশ্চিমদিকেও তাই। কেবল দক্ষিণদিকে যারা গুলি খাচ্ছে তারা সকলে সাজানো ইটের উপর বসে আছে। ব্যাপার কি, আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা সব ইটের উপর বসে খাচ্চে কেন ? আড্ডাধারী বললে, আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই যে যে-কেউ একটানে ১০৮টা ছিটে খেতে পারবে, তাকে একখানা ইট দেওয়া হবে বসতে। এই কথা শোনা মাত্রই আমাদের টক্কর দেবার ইচ্ছা উবে গেল। একজন আটখানা ইটের উপর বসে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ও তাহলে কত ছিটে খেতে পারে ? আড্ডাধারী বললে, একটানে ৮৬৪ ছিটে। শুনে আমাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। টক্করের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা গুলিখোরদের গল্প শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হলাম। দেখলাম, হাত-পা নেড়ে ফিস্‌ফিস্ করে তারা কি সব গল্প করছে। কাছে বসে গল্প শুনলাম। যে একখানা ইটের উপর বসেছিল সে বলছে—চাঁপক

চাপক, গোল করাত, মস্ত বড় গোল। তার উপর কাঠ ফেলে দিচ্ছে, ফর্ফর্ করে কাঠ চিরে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়িবরগা, কোথাও দরজা জানলা, কোথাও কোচ-কেদারা বেরিয়ে যাচ্ছে। যে দু'খানা ইটের উপর বসেছিল সে হাত নেড়ে বলল—ও আর এমন কি কল! কল হল গরফের কল। একখানা পাথরের বারকোশ, মস্ত বড় বারকোশ ঘরজোড়া, তার উপর দু'খানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরছে। সাহেবরা তার মধ্যে বস্তা-বস্তা মসিনা ফেলে দিচ্ছে। কলের দুটো মুখ, একটা দিয়ে পিপে-পিপে তেল বেরুচ্ছে, আর একটা দিয়ে থান-থান খোল। অবশেষে যে আটখানা ইটের উপর বসেছিল সে হাত নেড়ে বলল—ওসব কল কোনো কাজের নয়। আমার বাড়ি ফরাসডাঙায়। বাড়ি গিয়ে দেখি একদিন, কোথাও ঘরবাড়ি পুকুর গাছপালা কিছু নেই, সব মাঠ হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্যন্ত কেবল ধূ ধূ করছে মাঠ। শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ, আর চুঁচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। একটা দিয়ে পালে-পালে গরু যাচ্ছে, আর-একটা দিয়ে গাড়ি গাড়ি আখ যাচ্ছে। মাটির ভেতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেক খোঁজখবর করে বুঝলাম, মাটির ভেতর কল আছে, কলের একশোটা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়ে বেরিয়েছে। কোনোটা দিয়ে বাতাবি লেবু, কোনোটা দিয়ে মনোহারা, কোনোটা দিয়ে রসগোল্লা, কোনোটা দিয়ে ছানাবড়া, কোনোটা দিয়ে পানতুয়া বেরুচ্ছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখলাম, সবই একরকম তার। মানে, একপাকের তৈরি কিনা!'

গল্পটি শেষ করে বিদ্যাসাগর বললেন: 'আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাইনে নিই, পাখা-ফি নিই, পরীক্ষার ফি নিই। সবরকমের ফি নিয়ে কলের দরজা খুলে দিই। দেখিয়ে দিই, এইখানে মাস্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, কালিকলম আছে। দেখিয়ে দিয়ে কলের ভেতর ফেলে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিই। কল ঘুরতে থাকে, আর তার কোনো মুখ দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস, কোনো মুখ দিয়ে এল-এ, বি-এ, এম-এ বেরুতে থাকে। কিন্তু টেস্ট করে দেখ, সকলেরই একরকম তার। একপাকের তৈরি কিনা!'

গল্পটি আধুনিক শিক্ষানীতির চমৎকার রূপক। একই গল্পের মধ্যে একাধিক রূপকের সমাবেশ হয়েছে। ভজিয়োরদের ইটগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির

সঙ্গে তুলনা করা চলে। সব ডিগ্রিধারী কলের গল্প বলে। যার যত বেশি ডিগ্রি তার কল তত বেশি তাজ্জব। তিনি তত বেশি ছিটে একটানে খেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরে মাস্টারমশায় হয়ে তিনিই আবার ছাত্রদের ছিটে ধরতে শেখান এবং ধীরে ধীরে একটানে বহু ছিটে টানবার কলাকৌশলটি শিখিয়ে দেন। এও রূপক, আবার শতমুখী কলটিও রূপক। টয়েন্‌বি যে বুদ্ধিজীবীর ম্যানুফ্যাকচারিঙের কথা বলেছেন, বিদ্যাসাগরের রূপক গল্পের মধ্যে তার 'প্রসেস্‌টি' সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের চতুর্থ পাদেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাযন্ত্রে বুদ্ধিজীবীর উৎপাদনের হার বাজারের (প্রধানত বাঁধা-মাইনের চাকরির) চাহিদা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তা বিদ্যাসাগরের গল্পের নীতি থেকে বোঝা যায়।

বাঁধা-মাইনের চাকরির ক্ষেত্র এমনিতেই সংকীর্ণ। তবু যে-সমাজে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছে স্বচ্ছন্দগতিতে, সেখানে আপিস-ইনস্টিটিউশনের আধিক্যের জন্য চাকরিজীবী বুদ্ধিজীবীর জীবিকার সমস্যার সমাধান অনেকটা সম্ভব। আমাদের সমাজে আর্থিক বিকাশের সেরকম কোনো সুযোগ ঐতিহাসিক কারণেই ঘটেনি বলে বুদ্ধিজীবীর চাকরির ক্ষেত্র বরাবরই সংকীর্ণ ছিল। তার উপর, সরকারী চাকরির প্রতি এদেশের বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ ছিল গোড়া থেকেই বেশি। কারণ তার নিশ্চিন্ততা বেশি। সেইজন্য তার সামাজিক মূল্য একসময় খুব বেশি ছিল। তিনশো টাকা মাইনের ডেপুটির সামাজিক কদর ছ'শো টাকা মাইনের সদাগরী প্রতিষ্ঠানের অফিসারের চেয়ে অনেক বেশি। বিবাহবাজারের পাত্র নির্বাচনকালে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেত। সরকারী পোষকতার এই সামাজিক মর্যাদা অনগ্রসর সমাজ-জীবনের লক্ষণ। ধনতন্ত্রের অবরুদ্ধ গতির ফলে আমাদের সমাজে পশ্চিমের মতো 'ম্যানেজেরিয়াল' শ্রেণীর বিকাশ হয়নি এবং বেসরকারী স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের চাকরির পদমর্যাদাও বাড়েনি। কেবল সরকারী বন্দরে সবরকমের বুদ্ধিজীবীর ভিড় বেড়েছে। বাংলায় অনেক বেশি বেড়েছে তার কারণ বাঙালীরা স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের কর্মক্ষেত্র থেকে, উদ্যম ও ধৈর্যের অভাবে, ক্রমেই অবাঙালীদের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছেন। তার ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর আন্তরিক সম্পর্ক বিশেষ গড়ে ওঠেনি। ক্রমেই তাঁদের জীবন সরকার-মুখাপেক্ষী চাকরিনির্ভর হয়ে উঠেছে। উড সাহেব তাঁর ১৮৫৪

সালের বিখ্যাত শিক্ষাসংক্রান্ত ডেস্‌প্যাচে সরকারী চাকরির প্রতি শিক্ষিতশ্রেণীর এই মোহের কথা মনে করেই বোধহয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন :[৫]

> However large the number of appointments under Government may be, the views of the natives of India should be directed to the far wider and more important sphere of usefulness and advantage which a liberal education lays open to them

উড সাহেবের হুঁশিয়ারীতে বাংলায় অন্তত কোনো কাজ হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সংস্কারকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিশিষ্ট ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ হেনরি শার্প আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রসঙ্গে বিলেতের একটি বিদ্বৎ-জনসভায় বলেছেন (১৯২৫):

> Its buildings serve as prominent adornment for the cities, its councils as convenient platform for the budding politician and its organisation as a subject of keen debate for the legislatures. Above all, *it is the pride and darling of the middle class. The lad of this class in Bengal learns from his cradle to look towards the Senate House of Calcutta as a Mecca which will secure him his passport to Paradise.* Paradise may mean in the end a thriving practice in law or medicine, a High Court Judgeship or a responsible post in the administration of the country. (Italics লেখকের)
>
> —H. Sharp . 'The Development of Indian Universities' in Journal of the Royal Society of Arts, April 17, 1925.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনকার বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দানও কম নয়। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর (বাঙালী তো বটেই) কয়েক পুরুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচর্যাতেই মানুষ হয়েছেন বলা চলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ও যে আধুনিক যুগের সমাজের একটি দৃঢ়মূল 'ইনস্টিটিউশন', সেকথা সামাজিক সমস্যার আলোচনাকালে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যে-সমাজে যে ইনস্টিটিউশন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সেই সমাজের ভালমন্দ দোষগুণ দুই-ই থাকে। গুণের চেয়ে ক্রমে দোষগুলি মারাত্মক হয়ে ওঠে, কারণ

প্রতিষ্ঠানের দেহে ব্যাধির বীজাণুর মতো তার ক্রিয়া হতে থাকে। সামান্য একটি বিষাক্ত বীজাণুর সংক্রমণে যেমন অতিসুস্থ মানুষও ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু হয়ে যায় এবং তার সর্বাঙ্গে সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ে, সামাজিক ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে দোষের ক্রিয়াও ঠিক সেইভাবে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ও যেহেতু এই ধরনের একটি ইনস্টিটিউশন, এই সংক্রমণ থেকে তাই তার পক্ষেও আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, অপর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও তা হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই তার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, সিণ্ডিকেট সিনেট থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বিভাগ পর্যন্ত। শিক্ষার ক্ষেত্র চাকরি ও গোষ্ঠীগত-ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বাংলায় আরও ব্যাপকভাবে হয়েছে, তার কারণ বাঙালী বুদ্ধিজীবী সংখ্যায় বেশি, তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশি এবং তার চেয়েও বড় কথা, কেবল সরকারী চাকরি ছাড়া সমাজের অন্যান্য স্বাধীন কর্মক্ষেত্র থেকে (যেমন আর্থিক) তাঁরা প্রায় বিচ্ছিন্ন। আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তাই তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে যতরকমের চারিত্রিক নীচতা-দীনতা সবকিছুর লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে সেই প্রতিষ্ঠান। আজ তারই পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাংলার বিদ্বৎসমাজে।

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই কিভাবে এই অসন্তোষ বাঙালী বিদ্বৎসমাজের মনে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকশত সমসাময়িক পুস্তকপুস্তিকা থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একজন লিখছেন (১৯০১), সিনেটে ও সিণ্ডেকেটে এমন সব লোক ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখল করে বসেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। সমস্ত ব্যাপারটাই কেবল প্রভুত্বের ব্যাপার হয়ে ওঠে এবং সিণ্ডিকেটের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি সর্বব্যাপারে ও বিভাগে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করেন। যত কমিটি, যত বোর্ড, সব তাঁদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও প্রভুত্বরক্ষার স্বার্থে গঠিত হয়।[৬] একথা বর্তমানে আরও শতগুণ বেশি সত্য। কলকাতা কর্পোরেশনের চাইতেও নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য প্রতিষ্ঠান হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর একজন লিখেছেন (১৯০১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেও আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার বিদ্যালয়ের সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-চারজন কৃতীদের বাদ দিলে, অধিকাংশ শিক্ষিতেরই স্ট্যাণ্ডার্ডের

অনেক অবনতি হয়েছে দেখা যায়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমযুগে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পরবর্তীকালের শিক্ষিতদের অনুন্নতস্তরের কোনো তুলনাই হয় না। তার মানে কি এই যে বাংলায় প্রকৃত প্রতিভাবানের অভাব ঘটেছে? তা নয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই কোথাও মারাত্মক গলদ আছে নিশ্চয়।[৭] অন্য একজন এ সম্বন্ধে লিখেছেন (১৯০১), ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি বিদ্বানদের মধ্যে প্রকৃত চিন্তাশীল মনীষার বিকাশ হচ্ছে না। মৌল চিন্তার শক্তি শিক্ষিত বাঙালীর কমে যাচ্ছে, প্রতিভাবানের সংখ্যাও দিন দিন কমছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা, যাঁরা অধ্যাপনা শিক্ষকতা করেন, তাঁরাও লেখাপড়ার চর্চা করেন না। যা মুখস্থ করে তাঁরা একবার ডিগ্রি পেয়েছেন তাই তাঁদের সারাজীবনের মূলধন। তাতেও গলদ অনেক। কেবল মুখস্থেও কাজ হয় না, পরীক্ষক-অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র ও মোসাহেব হওয়া চাই। একদল ব্যক্তি ঘুরেফিরে প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হন, এবং তাঁদের খেয়ালখুশি মতামত, এমনকি বিদ্যার দৌড় কতদূর সে-সম্বন্ধে অবহিত না হলে কোনো পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব নয়। শিক্ষার এই ব্যবস্থার জন্যই আমাদের দেশের সংস্কৃতি ক্রমে একটি যান্ত্রিক ইণ্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে।[৮]

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এরকম সমালোচনা সাম্প্রতিককালে শিক্ষাবিদরা প্রকাশ্যে অনেক করছেন। এবিষয়ে তদন্ত কম হয়নি। কিন্তু অর্ধশতাব্দী আগেও যে এরকম সমালোচনা বিদ্বৎজনমহলে হত, এগুলি তার প্রমাণ। ইংরেজরা যে শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাকে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইনস্টিটিউশন গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিণাম 'শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ার' মতো হয়েছে। সমাজের অন্য আর যেকোনো পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মতো, এবং তার চেয়েও কদর্য হয়েছে তার অবস্থা। শিক্ষায়তনের সঙ্গে কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানের কোনো পার্থক্য নেই। শিক্ষার লক্ষ্য যখন চাকরি (অধ্যাপনাও চাকরি) তখন বিদ্যার যেটুকু মূলধন সম্বল করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব তার বেশি বিদ্যা অনাবশ্যক। এ-সমাজে যেমন কয়েকশত বা কয়েক হাজার টাকা মাত্র মূলধন নিয়ে লক্ষপতি-কোটিপতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং হয়েছেনও অনেকে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোসাহেবিলব্ধ ডিগ্রিচিহ্নিত সামান্য বিদ্যার মূলধন নিয়ে মহা-বিদ্বানের স্তরেও রাজপোষকতায় অথবা বিদ্বানদের আমলাচক্রের পোষকতায়

অনেকে উন্নীত হয়েছেন। সাধারণভাবে অধ্যাপকশ্রেণী বা শিক্ষকশ্রেণীর অর্জিত বিদ্যার স্থিতিশীলতা দেখলেই তা বোঝা যায়। গণিতের উত্তম স্কলার সারাজীবন ধরে ছাত্রদের কাছে একই ফরম্যুলা যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করেছেন, ইতিহাসের রত্ন পাঁচশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন অশোকের ও আকবরের কীর্তিকথা, আর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফিজিক্স-কেমিষ্ট্রির সূত্র আওড়াচ্ছেন। পরিবর্তনশীল জ্ঞানজগতের সঙ্গে তাঁদের কোনো সুদূর সম্পর্কও নেই, কারণ তা সিলেবাসে নেই এবং চাকরি বজায় রাখার জন্য তার দরকার হয় না, উন্নতির জন্যও না। নিজেদের জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রেই তাঁরা অল্পকালের মধ্যে কূপমণ্ডূক হয়ে যান। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, এবং সম্পর্ক রাখাও তাঁরা তাঁদের স্কলারশিপ-বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন। গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী যিনি তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক যিনি তিনি বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও তার সাধারণ সূত্রগুলিও জানেন না। এইখানেই শেষ নয়। গ্রীক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ যিনি তিনি ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অজ্ঞতার ব্যাপারে আদৌ লজ্জিত নন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের এক্সপার্ট যিনি তিনি উনিশ শতক সম্বন্ধে কৌতূহলীও নন। চূড়ান্ত হল, অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ইকনমিক' ইতিহাসে যিনি 'ডক্টর' উপাধি পেয়েছেন, তিনি সেই শতাব্দীরই রাজনৈতিক বা সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানেন না বলে গর্ববোধ করেন, কারণ ওগুলি তাঁর 'স্পেশ্যালাইজেশন' এর বিষয়বহির্ভূত।

আধুনিক যন্ত্রকাণ্ডধনমত্ত সভ্যতায় বিদ্যার হাল হয়েছে এই। হাল সম্বন্ধে এতদিন চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্‌রা সচেতন হয়েও উদাসীন ছিলেন, একেবারে হালে তাঁদের সেই উদাসীনতার ঘোর সামান্য কেটেছে। সম্প্রতি তাঁরা 'হিউম্যানিটিজ' 'সায়েন্স' ও 'টেকনলজি'র জ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেছেন। কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণ সমাজসচেতন স্থিতপ্রাজ্ঞ মানুষ তৈরি হয় না, তার বদলে আধা-মানুষ সিকি-মানুষ একপেশে ও একচোখো মানুষ তৈরি হয় দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার ফলে জ্ঞানের তৃতীয় চক্ষু তো খোলেই না, ঈশ্বরদত্ত দুই চক্ষুর মধ্যে একটি কিছুটা খোলে, অন্যটি বন্ধই থাকে। একচক্ষু হরিণের মতো অবস্থা হয় বিদ্বৎসমাজের। যন্ত্রযুগের খণ্ডিত-বিখণ্ডিত শ্রমের মতো শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধিও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত

হয়েছে এবং যন্ত্রের এক্সপার্ট ও টেকনিসিয়ানের মতো বিদ্যারও এক্সপার্ট বেড়েছে। কোনো বিরাট শিল্পকারখানার মজুরদের মতো অবস্থা হয়েছে এযুগের সমাজ-কারখানার বিদ্বৎজনদের। বিদ্যার ও বিদ্বৎজনের এই যান্ত্রিকতা বা মেকানাইজেশন এবং অতিবিভাজ্যতা বা ডিপার্টমেণ্টালাইজেশন, আধুনিক বিদ্বৎসমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও সঙ্কট। এ-সম্বন্ধে বর্তমান যুগের দুজন বিখ্যাত মনীষীর মতামতের কথা মনে পড়ছে, একজন সমাজবিজ্ঞানী, আর-একজন কবি-শিল্পী। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম্ এযুগের বিদ্বৎজনদের এই খণ্ডিত রূপের কথা স্মরণ করেই তাঁদের কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন, যেমন 'পলিটিক্যাল', 'অর্গ্যানাইজিং', 'ইণ্টিলেকচুয়াল', 'আর্টিষ্টিক', 'মর্যাল' ও 'রিলিজিয়াস।[৯] কবি টি. এস. এলিয়ট আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর একটি রচনায় প্রধানত ম্যানহাইমের মতামতের সমালোচনা করে বলেছেন যে এযুগের বিদ্বৎসমাজে এই বিভাজ্যতার সমস্যা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার সবটুকুই নিন্দনীয় নয়। বিভাজনের খানিকটা প্রয়োজন আছে, ভালোর জন্যই। তবে যেভাবে বা যেরূপে তা বর্তমান সমাজে দেখা যায়, তার সবটুকু সমর্থনীয় বা প্রশংসনীয় নয়। এযুগের সংস্কৃতির একটা প্রধান দুর্বলতা হল, বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। রাজনৈতিক দার্শনিক শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক, কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই এবং তার জন্য ক্ষতি সকলেরই হয়। সমাজের দিক থেকেও তা কল্যাণকর নয়। বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতা এবং সজ্ঞানস্তরে ভাবের আদানপ্রদানের অভাব, বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা।[১০]

এ-সমস্যা বাংলার বিদ্বৎসমাজেও প্রকট। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি হয়েছে কেরানী-কর্মচারী ও আমলাবাহিনী উৎপাদনে। সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তার মর্মান্তিক ব্যর্থতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতির এই পরিণাম সম্বন্ধে একজন লিখেছেন :[১১]

> ……they have aimed at the production of government officials, lawyers, doctors and commercial clerks and, within this narrow range, they have succeeded remarkably well. Where they have failed, almost completely, is on the cultural side.

এমনকি, মেকলের দম্ভোক্তিরও বহ্বাড়ম্বর সার হয়েছে শুধু। তিনি যে ভারতীয় মেটেরঙের চামড়ার অন্তরালে ইংরেজের সংযমী ও বিজ্ঞানী মনটি গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, তাও ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যের আংশিক সাফল্য হয়েছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি দোভাষীশ্রেণীর বিকাশের মধ্যে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার কোনো আদর্শ, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক হিউম্যানিজম্ কোনো কিছুই, শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে বাঙালী বা ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের চরিত্রে বাসা বাঁধতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, দেশের জলবায়ুমাটির গুণ বদলায়নি। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছে এদেশের বর্ধিষ্ণু নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কেবল বীজের গুণে প্রথমদিকে উনিশ শতকে তার কয়েকটি বিস্ময়কর অঙ্কুরোদ্গমে আমরা ধাঁধিয়ে গিয়েছি। ভেবেছি, তথাকথিত নবজাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে ভবিষ্যতে। তাও আসেনি। কারণ পুরনো মাটিতে নতুন বীজের পরিপূর্ণ উদ্গম সম্ভব হয়নি। সমাজের আর্থিক স্তরের মৌল কাঠামো খানিকটা বদলেছিল ঠিকই। তার ফলে সমাজের গড়নও যে কিছুটা বদলায়নি তা নয়। কিন্তু মধ্যপথেই এই পুরাতনের ভাঙন এবং নতুনের গড়নের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরাধীন উপনিবেশের অদৃষ্টে যা হওয়া সম্ভব তাই হয়েছিল। অঙ্কুরেই তাই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার আদর্শ ও নীতি শুকিয়ে যায়। মেকলে খুব বড়াই করে একদা বলেছিলেন :[১২]

> It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without any efforts to proselytise : without the smallest interference in their religious liberty ; merely by the natural operation of knowledge and reflection.

অতিবিশ্বাসের কি মোলায়েম আত্মসন্তোষ! লর্ড মেকলে কতকটা 'লর্ডলি' ভঙ্গিতে বলেছেন : আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয় তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে কোনো মূর্তিপূজকের অস্তিত্ব থাকবে না। এবং আমাদের তরফ থেকে কোন-রকমের ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও এইধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো

সম্ভব হবে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও দরকার হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য-সাধন করা যাবে।

কূটনীতিজ্ঞ বা শিক্ষাবিদ্ হিসেবে মেকলে হয়ত ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁর এই বালকোচিত উক্তি শুনেই বোঝা যায়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র সম্বন্ধেও তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। কি ধরনের উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় তা তাঁর অজানা ছিল। তাই ব্যক্তিগত পত্রে তাঁর এরকম মনখোলা উক্তি করতে দ্বিধা হয়নি। কোনো নীতি বা আদর্শ বা পরিকল্পনা, তা যত বড় অতিমানবেরই উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত হোক না কেন, উপর থেকে উপলখণ্ডের মতো সমাজের বুকে নিক্ষেপ করলে তাতে সামান্য জলতরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে হয়ত, কিন্তু সমাজের অন্তঃস্থল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে না। সেরকম আলোড়ন ছাড়া সমাজের উল্লেখ্য পরিবর্তনও হয় না। মেকলের ত্রিশ বছরের হিসেবের কথা উপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। একশো-ত্রিশ বছর পরেও আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, মেকলের রোপিত আমগাছে আমড়া ফলেছে। বাংলার সম্ভ্রান্ত বিদ্বৎসমাজে আজ বরং এমন একটি লোক খুঁজে পাওয়াই কঠিন যিনি যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারে বিশ্বাসী নন। যাবতীয় মৃত cult-এর কঙ্কালকে মহাসমারোহে পুনরুজ্জীবিত করার আগ্রহ আজ তাঁদের মধ্যে প্রবল। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতার প্রকাশ বলে এই উপসর্গ ব্যাখ্যা করা যায় এবং করলে ভুলও হয় না। কিন্তু ব্যর্থতার বেদনা অন্য উপায়েও আত্মপ্রকাশ করতে পারত, মৃত কাল্টের শ্মশানে ঘুরপাক না খেয়ে। আত্মাভিমান অভিযোগ অবিশ্বাস ও নিঃসঙ্গতা হয়ত তাঁদের কাম্য হত। অতিচেতন সজাগবুদ্ধি মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর হয়ত আজ কাম্য তাই। কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই অতীতের মৃত আদর্শের শ্মশানের পথে যাত্রী, বর্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাহীন।

যে-কোনো ব্যবহার্য পণ্যের বাজারদর একটা নিয়ম মেনে ওঠানামা করে, অর্থনীতির ছাত্ররা তা বিলক্ষণ জানেন। প্রতিযোগিতার মোটামুটি সুস্থ ও স্বাধীন পরিবেশে এই বাজারদরের নিয়মের ব্যতিক্রম হত না সাধারণত। ক্যাপিটালিজমের যৌবনকালে অর্থতত্ত্ববিদরা এই সমস্ত নিয়ম রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ক্যাপিটালিজমের এমন কতকগুলি পরিবর্তন

হয়েছে যার ফলে ক্লাসিকাল যুগের কোনো নিয়মই অবধারিত সত্য বলে টিঁকে থাকতে পারছে না। প্রতিযোগিতা বা কম্পিটিশনের সেই স্বাধীন সুস্থ পরিবেশও আজ আর নেই। আজ তার বিচিত্র সব স্ববিরোধী নাম—মোনোপোলিস্টিক কম্পিটিশন, ডুয়োপোলি, ওলিগোপোলি ইত্যাদি। খোলা বাজারে ক্রেতাদের কোনো স্বাধীনতা নেই বাজারদর নির্ধারণে, বিক্রেতার উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও তার সীমাবদ্ধ। দুজন তিনজন বা চারপাঁচজন উৎপাদক-বিক্রেতা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের বাজারদর নির্ধারণ করেন। ক্রেতার স্বাধীনতা নেই, জিনিসের সত্যিকারের মূল্য যাচাইয়ের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ, কারণ 'ফ্রি মার্কেট' বা 'ফ্রি কম্পিটিশন' বলে কিছু আর নেই। ক্যাপিটালিজমের চরিত্রের এই পরিবর্তন ঘটেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক চেতনারই বিকাশ হয়নি।[১৩] সমাজের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে স্পষ্টভাবে। বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও স্বাধীন প্রতিযোগিতার দিন চলে গেছে, তার একটা লোকদেখানো খোলস আছে শুধু। সরকারী বা বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে প্রকাশ্য পরীক্ষার বহর যতই বাড়ুক, তার অন্তরালবর্তী অদৃশ্য বিচারকমণ্ডলীর প্রভাব যে কতখানি তা সমাজের কারও আজ অজানা নেই। এযুগের জিনিসের মূল্য যেমন বিজ্ঞাপনের বাহারে নির্ধারিত হয় এবং বাইরের প্যাকেটের চটকে তার কাটতি বাড়ে, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভারও যাচাই হয় বিজ্ঞাপনে ও বাইরের খেতাবের চটকে। এর মধ্যেও যে দুচারজন প্রকৃত বিদ্বান ও প্রতিভাবান যোগ্য সমাদর পান না তা নয় (দুচারটে চমকলাগানো প্যাকেটের মধ্যেও যেমন ভালো জিনিস থাকতে পারে তেমনি), কিন্তু সেটা দৈবচক্রের ব্যাপার ও ব্যতিক্রম। আমাদের আলোচ্য সামাজিক 'ব্যতিক্রম' নয়, সাধারণ সামাজিক *গতি ও প্রকৃতি। সাহিত্য শিক্ষা জ্ঞানবিদ্যা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আজ তাই প্যাকেট লেবেল ও বিজ্ঞাপনের বাহাদুরির যুগ এসেছে।* বর্তমানে যুগের শিক্ষা ও বিদ্যার ক্ষেত্র সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলেছেন :[১৪]

> Education is one of the major areas in which the spirit of inquiry is on the decline···The retailing of knowledge in standard packages paralyses the impulse to question and to inquire. Knowledge acquired without the searching effort becomes quickly obsolescent, and

a civil service or a profession which depends on a personnel whose critical impulse is benumbed becomes rapidly inert and incapable of remaining attuned to changing circumstances.

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র থেকে অনুসন্ধিৎসা প্রায় অন্তর্ধান করেছে। স্ট্যাণ্ডার্ড প্যাকেটআঁটা লেবেলমারা বিদ্যা ক্রমে বিদ্যার্থীর কৌতূহল ও সন্ধানী মনকে অসাড় অচৈতন্য করে দিচ্ছে। যে-বিদ্যার পদ্ধতির মধ্যে সন্ধানী মনের ক্ষুধানিবৃত্তির কোনো সুযোগ নেই, খানিকটা মুখস্থ এবং অনেকটা পরীক্ষক তোষণের উপর যা নির্ভরশীল, সেই বিদ্যা অর্জন করে যাঁরা বিদ্বান হন তাঁরা জীবনের যে-কোনো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন সেখানেও যন্ত্রবৎ কাজ করবেন। তাঁদের নিজস্ব কোনো বিচারবুদ্ধি বিবেচনাশক্তি বলে কিছু থাকবে না, বিরাট যন্ত্রের নাটবলটুর মতো অবস্থা হবে তাঁদের এবং যুগের বা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখেও তাঁরা চলতে পারবেন না।

শিক্ষা ও জ্ঞানবিদ্যার যখন এই অবস্থা তখন জনশিক্ষার প্রসার হচ্ছে প্রতিদিন এবং শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধিও হচ্ছে দ্রুতহারে। সেটা নিঃসন্দেহে সামাজিক শুভলক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রগতির প্রমাণ। তার ফলাফলও শুভ হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল বলছি কারণ কোনো দেশের বিদ্বৎসমাজে (বা যে-কোনো সামাজিক শ্রেণীতে) যত নতুন তরুণ শিক্ষিত ও বিদ্বান-বুদ্ধিমানের আমদানি হয় ততই মঙ্গল। তাতে বিদ্বৎসমাজের স্থিতিশীলতা বা কূপমণ্ডূকতা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে। নতুন যাঁরা তাঁরা যদি সত্যিই নতুন মন, নতুন দৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাহলে তাঁরা পূর্বের বদ্ধ চিন্তাধারার ও কর্মধারার পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান যুগের সমাজের মতো যে-সমাজ অত্যন্ত বেশিমাত্রায় 'ইন্‌স্টিটিউশানালাইজ্‌ড্‌' সেখানে নতুনের উপর পুরাতনরা তাঁদের নিজেদের ছাপ মেরে দেবার সুযোগ খুব বেশি পান। অর্থাৎ যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, যেমন শিক্ষক তেমনি ছাত্র তৈরি হয়। যে অধ্যাপক বা শিক্ষকদের নিজেদের অনুসন্ধিৎসা লোপ পেয়ে গিয়েছে, নিছক চাকরির স্বার্থে চর্বিত বিদ্যার চর্বণে যাঁরা দিনগত পাপক্ষয় করেন, যে বিদ্বান ব্যক্তি অর্জিত বিদ্যার সামান্য পুঁজি নিয়ে দুতিনহাজারী মনসবদারের গদিতে বসে আছেন, যাঁদের জ্ঞানার্জনের সমস্ত আগ্রহ স্বার্থবাদ ও সুবিধাবাদের অনলে ভস্মীভূত এবং যাঁরা ইন্‌স্টিটিউশনের বৃহৎ ছত্রছায়ায়

নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা কখনও তাঁদের ছাত্রদের চিন্তাশীল কৌতূহলী বা অনুসন্ধানী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন না। নিজেদের চালাকির কৌশলে মহৎ কার্য করবার শিক্ষাই তাঁরা তরুণ শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকেন এবং তরুণরাও স্বভাবতই 'মহাজ্ঞানী মহাজনেরা' যে পথ অনুসরণ করে বর্তমান সমাজে 'প্রাতঃস্মরণীয়' হয়ে ওঠেন সেই পথ ধরে চলতে চেষ্টা করেন। ফলে নতুন বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা থাকে, বর্তমানে বৃহৎ ইন্‌স্টিটিউশনবদ্ধ সমাজে তাও সম্ভব হয় না। বিদ্যাবুদ্ধির প্রবাহে ক্রমেই চড়া পড়তে থাকে।

> Large and well-trenched organisations are usually able to assimilate and indoctrinate the newcomer and paralyse his will to dissent and innovate. It is in this sense that the large-scale organisation is a factor of intellectual dessication [১৫]

বাংলার বিদ্বৎসমাজও আজ এই সমস্যার সম্মুখীন। তার জীবিকা-সমস্যা অনস্বীকার্য নয়। উপেক্ষণীয় তো নয়ই। চাকরি লক্ষ্য করে, বিশেষ করে সরকারী চাকরি, যাঁদের আধুনিক শিক্ষার পথে যাত্রা শুরু হয়েছে এবং ক্রমে যাঁরা কারখানার যন্ত্রোৎপন্ন পণ্যের মতো বিদ্বানে পরিণত হয়েছেন, জীবিকার সমস্যা দেড়শো বছরের মধ্যে তাঁদের ক্রমে জটিল হওয়া স্বাভাবিক। কারণ ক্রমেই তাঁদের সংখ্যা বাংলা দেশে দ্রুতহারে বেড়েছে এবং মধ্যবিত্তের বড় একটা অংশ যেমন বাংলা দেশে 'শিক্ষিত' পদবাচ্য তেমন ভারতবর্ষের আর অন্য কোনো প্রদেশে নয়। এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের (যাঁদের নিয়ে 'বিদ্বৎসমাজ' গড়ে উঠেছে) সংখ্যানুপাতে সরকারী বা বেসরকারী কোনো চাকরির সংখ্যা বাড়েনি। তার উপর বাংলার বাইরের প্রদেশেও শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিপত্তির যুগ নিশ্চিত অস্তাচলে। কারণ ইংরেজের আমলে যেসব প্রদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার নানা কারণে ঘটেনি, আজ তার দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। সুতরাং বাঙালীর চাকরির ক্ষেত্র এবং সরকারী পোষকতার ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। সমস্যা এক্ষেত্রে থাকবেই এবং ক্রমেই তার ফলে অসন্তোষও বিদ্বৎসমাজে ধূমায়িত হয়ে উঠবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর 'intellectual dessication'-এর সমস্যা। হয়ত এ-সমস্যা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরও। ম্যানহাইমের

মতে বুদ্ধিজীবীর এ-সমস্যা বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক ও আন্তর্সামাজিক সমস্যা। বর্তমান সমাজ ও তার ভেতরকার সব দৃঢ়মূল ইন্‌স্টিটিউশনের গড়ন না বদল করলে হয়ত এ-সমস্যার প্রতিকার সম্ভব নয়। সেই গড়নও বদলাচ্ছে আজ, সমাজের দ্রুত গণরূপায়নে (democratisation)। তার ফলে আবার নতুন করে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের সামনে। তার জটিলতাও কম নয়। আপাতত সমস্যা-সমাধানের কোনো রেডিমেড ফরমুলা কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামাজিক গণরূপায়নের ধারা কিরকম হবে এবং তার ফলে নতুন কি ধরনের সব সমস্যা দেখা দেবে, তার আভাস যেটুকু পাওয়া যায়, সোশ্যালিস্ট ডেমক্রাসির পরীক্ষা থেকে, তাতেও উল্লসিত হয়ে বলা যায় না যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জীবিকার চেয়ে যে জীবন আরও বৃহত্তর এবং উদরের চেয়ে মগজের স্বাধীন চিন্তা বুদ্ধি ও মননের প্রতি যে মানুষের সহজাত অনুরাগ কম নয়, তা আজ নতুন সমাজতন্ত্রের পরীক্ষাক্ষেত্রেও পদে পদে সঙ্কটের আঘাতে বোঝা যাচ্ছে। সামাজিক গণরূপায়নে বুদ্ধিজীবীর স্বস্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তা যদি হয় তাহলে তা বুদ্ধিজীবীর বা 'বিদ্বৎসমাজের সমস্যা' বলে কোনো সমস্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকবে না। তা নিয়ে এত মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু কি হবে-না-হবে আপাতত বলা যাচ্ছে না। সমাজবিজ্ঞানীরা কেবল 'ট্রেণ্ড' বা গতির কথা বলতে পারেন, রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের মতো কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

১৩৬৪ সন

১। Alfred Von Martin. *Sociology of the Renaissance*, p. 39.

২। H. Woodrow : *Macaulay's Minutes on Education in India* (Cal. 1862), p. 115.

৩। 'The intelligentsia is a class of liaison officers who have learnt the tricks of the intrusive civilisation's trade...' (p. 394).

'The handful of chinovniks is reinforced by a legion of 'Nihilists', the handful of quill-driving babus by a legion of 'failed B.A.s'; and the bitterness of the intelligentsia is incomparably greater in the latter state than in the former.' Arnold Toynbee : *A Study of History*. p. 395.

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভূমিকা।

৫। Wood's *Educational Despatch* of 1854.

৬। Krishna Ch. Roy : *Education in India (1901)*. pp. 3-4.

৭। N. N. Ghose : *Higher Education in 'Bengal as influenced by the Calcutta University (1901)*, pp. 1-2.

৮। *The Calcutta University as it is and as it should be* : The Editor, Pratibasi (Cal. 1901), pp. 9-10.

৯। Karl Mannheim : *Man and Society*, p. 82.

১০। T. S. Eliot : *Notes towards the Definition of Culture*, p. 38.

পরে ম্যানহাইম্ বুদ্ধিজীবীদের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত অনুশীলন করেছেন তাঁর *The Sociology of Culture* গ্রন্থে এবং তাতে পূর্বের মতামত (*Man and Society* এবং *Ideology and Utopia* রচনাকালের) অনেক পরিবর্তন করেছেন। তাতে অবশ্য এলিয়টের আসল বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ আছে বলে মনে হয় না।

১১। Arthur Mayhew : *The Education in India* (London 1926), p. 149.

১২। G. O. Trevelyan : *Life and Letters of Lord Macaulay* (London 1878). Vol. I. p. 455.

১৩। John Strachey , *Contemporary Capitalism* (London 1956), pp. 20-21.

১৪। Karl Mannheim : *Essays on the Sociology of Culture* (London 1956), p. 167

১৫। Karl Mannheim : *Essays on the Sociology of Culture* (London 1956), p. 168.

বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী

সভা-সমিতি ও ক্লাব-সোসাইটি-অ্যাসোসিয়েশন হল এ যুগের মানুষের সামাজিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ। শুধু অন্যতম নয়, অপরিহার্য সহচর। আদিম মানব-সমাজেও ক্লাব সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন ছিল। কোথাও বয়স-ভেদে, কোথাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে, এমন কি কোথাও কোথাও 'স্টেটাস' বা মর্যাদাভেদেও সেগুলি গড়ে উঠত এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যও ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধও ছিল কোথাও কোথাও, 'ব্যক্তি' 'পরিবার' ও 'ক্ল্যান', প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে বিরোধ।[১] সভ্যসমাজের সভা সমিতির বৈশিষ্ট্য হল তার গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য। এই জাতীয় সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই তাব প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধারা পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে।[২]

বিদ্বৎসভা কেবল বিদ্বৎজনের সভা হলেও, সমাজ-জীবনে তারও প্রভাব আছে। সমাজে সভা-সমিতির প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর, বিশেষ করে আধুনিক সমাজে, বিদ্বৎসভা সম্পর্কে আলোচনার আগে সে-সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের সভা-সমিতি প্রাচীন বা মধ্যযুগে ছিল না, আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ, সামাজিক অধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। তা না থাকলে সভা-সমিতির বিকাশ হতে পারে না। টলেমিদের যুগে (খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দে) আলেকজান্ড্রিয়ার মিউজিয়ামে পণ্ডিতেরা যে বিদ্যাচর্চার জন্য মিলিত হতেন, অথবা বৌদ্ধ আচার্যরা যে সভা করতেন, তা প্রধানত রাজার আদেশে ও বিশেষ প্রয়োজনে হত, স্বাধীনভাবে হত না। মধ্যযুগের রাজসভায় কবি-পণ্ডিতদের যে সভা বসত, তা 'রত্নসভা' হলেও, আধুনিক যুগের বিদ্বৎসভা বা অন্য কোনো সভা-সমিতির সঙ্গে তার কোনো মূলগত সাদৃশ্য নেই। আধুনিক সভায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীন-ভাবে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের জন্য মিলিত হন। বিদ্বৎসভার

বিশেষ উদ্দেশ্য হল, জ্ঞানবিদ্যার চর্চা ও আলোচনা। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজের শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য, বিদ্যার আদান-প্রদানের জন্য, যে সভা স্থাপন করেন, তাকেই বিদ্বৎসভা বলে। রাজনৈতিক সভা, বাণিজ্যিক সভা, অন্যান্য সাধারণ সভা-সমিতি বা ক্লাব-অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তার আদর্শগত পার্থক্য আছে, কিন্তু গঠনের পার্থক্য নেই। মূলে আছে ব্যক্তিস্বাধীনতার ছাড়পত্র ও স্বীকৃতি, স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তির স্বাধিকার। এসব আধুনিক যুগের দান।

আধুনিক যুগের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যে সব শক্তিশালী শ্রেণীর আবির্ভাব হল, তার মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী অন্যতম। সমাজে মধ্যশ্রেণী আগেও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার রূপ ছিল অন্যরকম। সমাজে তার কোনো স্বাধীন গতিশীল শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য ও সত্তা ছিল না। নতুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী সেই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে এলো। সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট বাড়লো। রিনেসান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলনের এবং আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শের প্রবর্তন করলেন তাঁরা।[*] রিনেসান্সের আদিকেন্দ্র ইটালিতে 'অ্যাকাডেমি' কয়েকটি স্থাপিত হল পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ১৪৩৩ সালে অ্যান্টনিও বেকাদেল্লি প্রতিষ্ঠিত Accademia Pontaniana, ১৪৭৪ সালে লরেঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত Accademia Platonica, ১৫৮২ সালে সাহিত্যের Accademia della Crusca, ১৬০৩ সালে বিজ্ঞানের Accademia del Lincei (গ্যালিলিও এই সভার সভ্য ছিলেন), ১৬৫৭ সালে ফ্লোরেন্সের Accademia del Cimento, ১৭৫৭ সালে Reale Accademia delle Scienze ইত্যাদি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইটালির এই সব অ্যাকাডেমির মডেলে ইয়োরোপের সর্বত্র (বলকান্ অঞ্চল ছাড়া) বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৬৩৫ সালে রাজকীয় পোষকতায় ফ্রান্সে Academie Francaise প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই শাখা হিসেবে ১৬৬৩ সালে Academie des Inscriptions et Belles-letters স্থাপিত হয়। ১৬৬৬ সালে Academie des Sciences প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালে সমস্ত অ্যাকাডেমির কার্যকলাপ আইনত বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার দু-বছর পরে Institut National স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য অ্যাকাডেমিগুলি তারই বিভিন্ন শাখা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] জার্মানিতে ও ইংলণ্ডেও

এই ধরনের সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি একসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবযুগের কর্মমুখর প্রত্যেকটি শহরে ও বন্দর-নগরে সভা-সোসাইটির গুঞ্জন শোনা যায়। কলরব নয়, মৃদুগুঞ্জন।

নতুন বাণিজ্যলব্ধ মূলধনের অবাধ প্রসারের সঙ্গে নতুন শিক্ষালব্ধ চিন্তাশক্তি ও যুক্তিবাদের অবাধ অগ্রগতি হতে থাকে। নতুন সমাজে 'Money' ও 'Intellect'-এর মর্যাদা প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। সেকালের কুলকৌলীন্যের বদলে নবযুগে অর্থকৌলীন্য ও বিদ্যাবুদ্ধির কৌলীন্যই সামাজিক শ্রেণীনিয়ন্তা হয়ে ওঠে। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একটি শক্তিশালী বিদ্যাবুদ্ধিজীবীর (Intelligentsia) উপশ্রেণী গড়ে ওঠে। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এবং সেরকম কোনো সম্পর্ক অভিজাত বিদ্বৎজনেরা স্বীকার না করলেও, রিনেস্যান্স আন্দোলনের গোড়ার দিকে বিত্তবানদের মধ্যে অনেকে 'ইন্টেলিজেন্সিয়ার' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দেখা যায়।[৫] আমাদের বাংলা দেশের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সভা ও সোসাইটি প্রধানত তাঁদের উদ্‌যোগেই হতে থাকে। নতুন শিল্পবাণিজ্যের যুগেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হল। এই মধ্যবিত্তের বিকাশ যদি না হত, তাহলে রিনেস্যান্স বা রিফর্মেশন কোনোটাই সম্ভব হত না। ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন :[৬]

> Without commerce and industry there can be no middle-class ; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation.

নতুন যুগের বণিকশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে, নগরে নগরে সাহিত্যসভা দর্শনসভা বিজ্ঞানসভা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্বৎসভার প্রতিষ্ঠা হতে থাকল। বিত্তবান ও বিদ্বানরা এই সব সভায় মিলিত হয়ে নবযুগের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। লাইব্রেরি ও বিতর্কসভার বিস্তার হতে লাগল। নবজাগরণ ও নতুন সংস্কার-আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠলো এই সভাগুলি :

> Closely connected with the growth of education and enlightenment among the younger generation of merchants is the creation of Literary and Philosophical

Societies in the leading mercantile towns...societies of the type became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic illumination.

রবার্ট ওয়েন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, যৌবনে 'ম্যাঞ্চেস্টার সোসাইটি'র সভ্য ছিলেন তিনি এবং এই সোসাইটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে। রসায়নবিদ্ ড্যাল্টন ও ওয়েন ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সোসাইটির সদস্য। ম্যাঞ্চেস্টারের মতো লিভারপুল শহরেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশেও নবযুগের বিদ্যাকেন্দ্র কলকাতা শহরে অনেক অ্যাকাডেমি সোসাইটি ও সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কলকাতার দেখাদেখি কাছাকাছি বর্ধিষ্ণু স্থানে (যেমন বর্ধমানে, কৃষ্ণনগরে) ক্রমে সভাস্থাপনের একটা ঢেউ এসেছিল একসময়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সব সভা-সমিতি। প্রথমে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এদেশের ইংরেজ শাসক-বণিক্‌রাই উদ্‌যোগী হয়ে এই ধরনেব সোসাইটি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর নবযুগের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ বিত্তবান ও শিক্ষিত বাঙালীরা উদ্‌যোগী হয়ে সভাস্থাপন করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকেই আসল আদর্শ-সংগ্রাম শুরু হয় এবং সেই আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্র কবে ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

পলাশীর যুদ্ধের পর যে-ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে এদেশে রাজদণ্ড ধরতে আরম্ভ করেন, তাঁরা আমাদের চেয়ে বিশেষ কোনো উন্নততর সামাজিক আদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার উচ্চশ্রেণীর, শিক্ষা বা রুচির দিক্ দিয়ে, কোনো পার্থক্যও ছিল না তেমন। এদেশের নবাগত ইংরেজদের প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ অনেকসময় আমরা এদেশে ইংরেজের আবির্ভাবটাকেই নবযুগের ও নবীন আদর্শের আবির্ভাব বলে মনে করি। তা একেবারেই সত্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মধ্যযুগের অবসান হলেও, প্রকৃত নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্লবের পরে। আমাদের দেশেও তখন নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে যুগচেতনার বিকাশ

হচ্ছে। দুই দেশের নতুন বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর নবজাগ্রত চেতনার মিলন প্রায় একই সময় হয়েছে। হেস্টিংস-ক্লাইভ-কর্নওয়ালিসের যুগে ঘোড়দৌড় জুয়াখেলা মদ্যপান ডুয়েলিং ইত্যাদির রেওয়াজ ইংলণ্ডের অভিজাত ও নতুন বণিক্‌সমাজে ছিল এবং আমাদের বাংলা দেশের নতুন রাজা-মহারাজা ও দেওয়ান-বেনিয়ানের সমাজে তারই সংক্রমণ হয়েছিল।[৮] দীর্ঘকাল পর্যন্ত আভিজাত্যের উপসর্গরূপে এগুলি বাঙালী সমাজের নতুন আভিজাতশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ১৮৪০-এর সমাজেও বাঙালী বণিক্‌শ্রেণীর মধ্যে ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলার কিরকম রেওয়াজ ছিল, সে-সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লিখে গেছেন :[৯]

> The native merchants are now commonly seen on the race-course, booking their bets, and acting like 'knowing ones'. This is a practice of very modern introduction, but has become so common as to be noticed even in newspaper doggerels.

লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় একটি ছড়া উদ্‌ধৃত করেছেন। তার মধ্যে রাধামাধব (?) ও মতিলাল শীলের নাম আছে :

> Sugar is rising
> Silk is likewising
> So now let us [illegible] joys of [illegible],
> I'll not a ledger look
> But take my [illegible] book
> Like Ra[illegible] and [illegible] Seal

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গে' এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরা তখন আলাদা রেসকোর্স করেছিলেন। উত্তর-কলকাতায় পোস্তার রাজাদের বাগানে ঘোড়দৌড় হত। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি ছিল না। Starter ছিল, Jockey ছিল, Booking Betting সবই ছিল। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র মন্মথবাবু, হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। শরৎবাবু নিজে Jockeyও হতেন। শীতকালে ছাতুবাবুদের মাঠে বুলবুলির লড়াই হত। অনেক তাঁবু পড়ত মাঠে। পোস্তার রাজা নরসিংহ ও

ছাতুবাবু প্রত্যেকে দেড়শো করে বুলবুলি আনতেন। লড়াইয়ে হেরে গেলে বুলবুলিরা উড়ে যেত এবং বিজয়ীদলের লোকেরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠত 'বো মারা' বলে। দুপুরবেলা, বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত বুলবুলির লড়াই হত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও তাই হত। ট্রেভেলিয়ান মুরগির লড়াই সম্বন্ধে লিখেছেন:

> At cock-fighting all classes shrieked their bets round the little amphitheatre—এবং ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে বলেছেন—Horse-racing presented much the same spectacle in a more open arena।[১০]

দুই দেশের মধ্যেই মধ্যযুগের এই বিকৃত কালচারের লেনদেন হয়েছিল প্রথম যুগে এবং আমাদের দেশের নতুন ধনিকসমাজে তার জের ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। ধনিকরা যা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করতেন, আসলে তা আপজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওদেশের মতো এদেশের ধনিকদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যক্ষভাবে সমাজসংস্কারাদি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সভা-সমিতি, সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় তাঁরাও কম উদ্‌যোগী ছিলেন না। রক্ষণশীল সভা নয় শুধু ('ধর্মসভা' যেমন), প্রগতিশীল সভাতেও ধনিকদের একাংশ যোগ দিয়েছিলেন। 'আত্মীয় সভা', 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisition of General Knowledge), 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সকলে সব সময় ঘোড়দৌড, বুলবুলির লড়াই আর শখের থিয়েটারের মধ্যে ডুবে থাকেননি। তা ছাড়া, এইসব বিদ্বৎসভার প্রভাবে, শিক্ষার ক্রমবিস্তারের ফলে, শহরের নতুন অভিজাত-শ্রেণীর বংশধরেরা ক্রমে পূর্বপুরুষদের নবাবী কালচারের মোহ থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে, প্রধানত কলকাতা শহরে, সভা-সমিতির যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য দেখা যায়, তা সত্যই বিস্ময়কর।* কেবল এই সব

* বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গে কৌতুক করে বলেছেন, 'সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই. তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। বামবঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিনী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন,...সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।'—বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ, ভূমিকা। ১২৯২

সভা-সমিতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নবযুগের বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। সুতরাং সমস্ত সভার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় এখানে। সকল প্রকারের সভাও আমার আলোচ্য নয়। ধর্মসভা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সভার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেও, বিদ্বৎসভাই আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিদ্বৎসভায় ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, হয়েছেও, কিন্তু তা হলেও অন্যান্য সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। ইংরেজিতে Learned Society বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে আরও ব্যাপক অর্থে আমি 'বিদ্বৎসভা' কথাটি ব্যবহার করছি। অবশ্য সম্প্রতি Learned Society কথাটিও অন্যান্য দেশে অনেক ব্যাপক ও 'পপুলার' অর্থে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগের বিদ্বৎসভা, সেকালের অ্যাকাডেমির সংকীর্ণতা কাটিয়ে অনেক বেশি উদার হয়ে উঠছে। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষিত বাঙালীদের যে-কোনো সভাকে আমি 'বিদ্বৎসভা' বলে গণ্য করেছি। উনবিংশ শতাব্দীকে দুটি পর্বে ভাগ করে (১৮০০-১৮৫০ এবং ১৮৫০-এর পর), প্রত্যেক পর্বের প্রধান সভাগুলির বিবরণ দিয়ে, বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির নতুন গতিধারার উপর তার প্রভাব বিচার করাই আমার লক্ষ্য। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথম পর্বকে দুটি 'যুগে' ভাগ করেছি—একটি রামমোহন-ডিরোজিওর যুগ, আর-একটি ইয়ং বেঙ্গলের যুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রধানত ইংরেজরা উদ্‌যোগী হয়ে যেসব বিদ্বৎসভা স্থাপন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না, কারণ তখন বাঙালী সমাজের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। এইসব সভার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য—'এসিয়াটিক সোসাইটি'। সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের উদ্‌যোগে ১৭৮৪ সালে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম যে সভা হয় (১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪), তাতে—

> Thirty gentlemen attended and they represented the elite of the European community in Calcutta at the time.

এই সভায় জোন্‌স সাহেব তাঁর ভাষণে বলেন—

> Whether you will enrol as members any number of learned Natives you will hereafter decide.

১৮২৯ সালের ৫ জানুয়ারির এক সভায় (অর্থাৎ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর পরে) উইলসন সাহেব সর্বপ্রথম কয়েকজন এদেশীয় লোকের নাম প্রস্তাব করেন, সোসাইটির সদস্যপদের জন্য, এবং তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১] এদিকে ১৮২৯ সালের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেরাই উদ্‌যোগী হয়ে অনেক সভা-সমিতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা', 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি,' 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'. 'হিন্দু কলেজ', 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', 'সংস্কৃত কলেজ' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যানুরাগী ইংরেজ ও বাঙালী উভয়েই উদ্‌যোগী হয়ে এইসব সভা সোসাইটি ও শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। তারপর 'এসিয়াটিক সোসাইটির' সঙ্গে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার আগে হয়নি।

আত্মীয় সভা

বাঙালীর উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয়, ১৮১৫ সালে স্থাপিত, রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র। প্রথমে রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে আত্মীয় সভার অধিবেশন হত, পরে তাঁর সিমলের বাড়িতে সভা স্থানান্তরিত হয়। প্রধানত ধর্মসংস্কারের আদর্শ নিয়ে এই সভা স্থাপিত হলেও, পরবর্তীকালের 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১) অথবা 'ব্রাহ্মসমাজের' (আগস্ট ১৮২৮) সঙ্গে 'আত্মীয় সভার' পার্থক্য আছে। আত্মীয় সভা কেবল ধর্মোপাসনার সভা ছিল না। যদিও সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেদপাঠ হত, ব্রহ্মসংগীত হত, তাহলেও কেবল তাতেই সভার কাজ শেষ হত না। আত্মীয় সভার বৈঠকের বিচ্ছিন্ন বিবরণ, যা প্রাচীন সংবাদপত্রাদিতে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে সভার অধিবেশন কেবল রামমোহনের গৃহেই হত যে তা নয়, যোগদানকারী সদস্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হত। অধিবেশনে কেবল বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত হত না, নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনাও হত। ইংরেজি 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকা থেকে আত্মীয় সভার বৈঠকের মাত্র একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি। বৈঠকটি ১৮১৯ সালের ৯ মে, রবিবার ব্রজমোহন মজুমদারের গৃহে হয়েছিল। ১৮ মে, 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রে এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় এই মর্মে :

At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of several castes with each other, and of the restrictions on diet etc. was *freely discussed*, and generally admitted—the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy—the practice of Polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned—as well as all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters···—*Calcutta Journal*, vol. 3. Tuesday, May 18, 1819, No. 89 (Italics বর্তমান লেখকের)। এই একটি বিবরণ থেকে 'আত্মীয় সভা' যে কি-ধরনের সভা ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। যে-সভায় নানাবিষয় 'was freely discussed', সে-সভা কেবল উপাসনা-সভা ছিল না, পরিপূর্ণ আলোচনা-সভা ছিল (আধুনিক অর্থে)। আলোচ্য বিষয়গুলির বৈচিত্র্য ও সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। জাতিভেদ সমস্যা, নিষিদ্ধ খাদ্যসমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহের সমস্যা, সতীদাহ-সহমরণের সমস্যা, পৌত্তলিকতার সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আত্মীয় সভার অধিবেশনে স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা হত। যদি আত্মীয় সভার অধিবেশনের কোনো মুদ্রিত Proceedings পাওয়া যেত, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, 'ইয়ং বেঙ্গল'-যুগের ভিতর দিয়ে একেবারে বিদ্যাসাগর-যুগের প্রান্ত পর্যন্ত, বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ধারা যে-পথে পরিচালিত হয়েছে, যেন তার একটা মোটামুটি খসড়া রামমোহনের 'আত্মীয় সভার' অধিবেশনেই রচিত হয়েছিল। নবযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে 'আত্মীয় সভা'র ভূমিকা এইকারণে উপেক্ষণীয় নয়।

আত্মীয় সভার সভ্যদের কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। সভ্যরা সকলেই রামমোহনের আদর্শ সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। সংস্কার-আন্দোলনের সময় কেউ-কেউ ভয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলেও, অধিকাংশই তাঁর অনুরাগী সহচর ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর, তাঁর পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ও রবীন্দ্রনাথের পিতামহ

দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূকৈলাসের (খিদিরপুর) রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জাস্টিস্ অনুকূলচন্দ্রের পিতামহ রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আন্দুল রাজবংশের রাজা কাশীনাথ প্রমুখ আরও অনেকে। ইয়োরোপে নবযুগের আবির্ভাবের প্রথম পর্বে, প্রগতিশীল ভাবধারার মুখপাত্ররূপে, নতুন বিত্তবানশ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর যে ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল, বিত্ত ও বিদ্যার যে সমন্বয় ঘটেছিল, বাংলার নবযুগের ইতিহাসেও কিছুটা তাই হয়েছিল দেখা যায়। বাঙালী বিত্তবানেরা বিদ্বৎজনদের সঙ্গে প্রথম একত্র মিলিত হয়েছিলেন আত্মীয় সভায়। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার শ্রেণীগত বিচ্ছেদ তখনও ঘটেনি। সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম্ (Karl Mannheim) নতুন ধনিকশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন—"...it is essential to note how with the rise of modern capitalism, the wealthy merchant and banking families play their part in cultual life."[১২]

'হিন্দুকলেজ' স্থাপিত হয় ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি, সোমবার। 'আত্মীয় সভা' কেন্দ্র করে যে সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হল। শিক্ষালয়ের সংস্কার ও নতুন শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকাদি রচনার জন্য 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' (জুলাই, ১৮১৭) ও 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) স্থাপিত হল। বাঙালী ও ইংরেজরা একত্রে উদ্যোগী হয়ে এইসব সোসাইটি ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষার প্রসার হতে লাগল। নতুন শিক্ষার, নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সভা-সমিতি ও সোসাইটিও এই সময় স্থাপিত হল অনেক। ক্রমে শিক্ষিতশ্রেণীর মন সভা-সমিতি-সচেতন হয়ে উঠলো। প্রধানত ইংরেজদের উদ্যোগে এইসময় (১৮১৮-২৮) যেসব সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—Literary Society, Oriental Litenary Society, Phrenological Society, Agricultural and Horticultural Society, Commercial and Patriotic Association (১৮২৮ সালে স্থাপিত হয়, রামমোহন রায় এই অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার ছিলেন), Ladies' Society (১৮২৮ সালে স্থাপিত হয়—রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও কাশীনাথ

মল্লিক এই সভা প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে), **Calcutta Medical and Physical Society** ইত্যাদি। বাঙালীদের উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সময়কার সভা-সমিতির মধ্যে প্রধান হল 'গৌড়ীয় সমাজ'।

'গৌড়ীয় সমাজ' স্থাপিত হয় ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেকালের প্রতিপত্তিশালী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে উদ্‌যোগী হয়ে 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে' এই সমাজ স্থাপন করেন। হিন্দুকলেজে সভাস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথম যে সভা হয়, তাতে দেখা যায় যে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয়দলের লোক যোগদান করেছিলেন। রামমোহনের দলভুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে ছিলেন, আবার ওদিকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, এঁরাও ছিলেন। এই বিচিত্র সমাবেশের কারণ হল, ১৮২৩ সালে রামমোহনের আন্দোলন সমাজে এমন কিছু তরঙ্গবিক্ষোভের সৃষ্টি করেনি, যাব ফলে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দলাদলির উৎপত্তি হতে পারে। ১৮২৯ সালে বেন্টিঙ্ক যখন সতীদাহ ও সহমরণ বিধিবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং ১৮৩০ সালে সনাতনপন্থীরা যখন ধর্মরক্ষার্থে 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন, মতামতের সংঘাত ও দলাদলি তখন থেকে তীব্রভাবে আরম্ভ হয়। তার আগে, বিশেষ করে গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠার সময়, বাঙালী সমাজে প্রাচীনপন্থা মধ্যপন্থী এবং উদার প্রগতিপন্থী, মোটামুটি এই তিন দলের লোক থাকলেও, তাঁদের মত ও পথ নিয়ে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়নি। গৌড়ীয় সমাজে তাই সকলের সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল। সভা স্থাপনের সময় উদ্‌যোগীদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তা লক্ষ্য করার মতো। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশে সভা-সমিতি সেরকম স্থায়ী হয় না, তার কারণ কি? তাই নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সভা স্থাপন করে আমরা যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার ও আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পেলাম, তাতে যে কতটা আমরা সুখী হয়েছি তা বিবেচনা করা দরকার। রামজয় তর্কালঙ্কার বলেন, সত্যিই এখানে আমরা আজ এমন সব লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি, যাঁদের সঙ্গে হয়ত একবছর কি ছ-মাসের মধ্যেও একবার দেখা হয় না। কাশীনাথ মল্লিক সভার এই প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেন। রসময় দত্ত বলেন, সভায় যদি বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি এর

মধ্যে আছি, আর যদি রাজসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, কি ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি নেই। এইরকম সব আলোচনা চলতে থাকে।[১৩] 'আত্মীয় সভা'র মতো 'গৌড়ীয় সমাজে'র অধিবেশনও মধ্যে-মধ্যে সভ্যদের বাড়িতে হত। গৌড়ীয় সমাজের সভ্যদের মধ্যে যে কোনো আদর্শগত ঐক্য ছিল না, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তা না থাকলেও, বিদ্বৎসভার সভ্যদের যে উদারতা থাকার প্রয়োজন, তা তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল। সমাজের উন্নতি করা যায় কি করে, তাই নিয়ে সকলে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন। সভ্যরা রচনাও পাঠ করতেন, রচিত গ্রন্থের অংশ পর্যন্ত পাঠ করে শোনাতেন। গৌড়ীয় সমাজ কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল সঠিক বলা যায় না। প্রবীণদের সভার বদলে যখন নবীনদের সভাস্থাপনের যুগ এল, তখন বিদ্বৎসভার রূপও বদলে গেল।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

এর মধ্যে হিন্দুকলেজের বয়স দশ বছরের বেশি হয়ে গেছে। হিন্দু বিত্তবান পরিবারের সন্তানেরা অনেকে মহাবিদ্যালয়ে নতুন উচ্চশিক্ষা পেয়ে, বাল্যকাল থেকে যৌবনকালে পদার্পণ করেছেন। বেকন লক্‌ হিউম রুশো, টম্‌ পেইন প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে। নবযুগের আদর্শ-গুরু তাঁরা, কেবল ইংলণ্ডের বা ইয়োরোপের নয়, সমগ্র বিশ্বের। হাতে-লেখা পুঁথিতে তাঁদের বাণী আর পুরোহিতযাজকের কুক্ষিগত হয়ে নেই, মুদ্রিত গ্রন্থাকারে সেই বাণী দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম থেকে পূর্বেও ছড়িয়ে পড়েছে, বাংলা দেশের কলকাতা শহরে পর্যন্ত। বাংলার নতুন শিক্ষিত যুবকরা সেই বাণী শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। Age of Reason-এর অভ্যুদয় হয়েছে। কুসংস্কারের মেঘাচ্ছন্ন মধ্যযুগের আকাশে প্রথম উষার আলোকরেখা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানের আলো, যুক্তির আলো। মানুষের মনে নতুন প্রশ্ন, নতুন মূল্যবোধের বিকাশ হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড মার্টিন নবযুগের মানুষের এই অনুভূতি ও মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন:[১৪]

> Men felt that they had at last attained their majority in matters economic, political and intellectual. The new conditions of life brought with them new attitudes, new valuations.

'ইয়ং বেঙ্গল' ও হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়।

সমস্ত রকমের বন্ধন ও কর্তৃত্ব থেকে তাঁরাও মুক্তি চেয়েছিলেন। স্থবির ও প্রবীণেরা যখন রক্তচক্ষু মেলে সেই বন্ধন আরোপ করতে চেয়েছেন, তখন তাঁদের 'assertive self-consciousness' তা প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। যাঁরা বেকন পড়েছেন, লক্ পড়েছেন, হিউম পড়েছেন, তাঁরা কর্তৃত্ব মানবেন না, শাস্ত্রের বিধান প্রশ্নাতীত বলে স্বীকার করবেন না। তাঁরা কেবল সংশয়-প্রকাশ করবেন, প্রশ্ন করবেন, যুক্তির অবতারণা করবেন। হিন্দুকলেজের ছাত্ররা তাই করতেন : ১৫

> **The young men brought up in the Hindu College began to study the works of Bacon, of Locke, of Berkley, of Hume, of Reid, and of Douglas Stewart. A thorough revolution took place in their ideas They began to reason, to question, to doubt.**

ডিরোজিও ছিলেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক। তিনি নিজে ছিলেন কলকাতার 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি'র ছাত্র এবং সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন কড়া প্রকৃতির কুঁজো স্কচ্‌ম্যান ডেভিড ড্রামণ্ড। অভিভাবকেরা ড্রামণ্ডের কাছে ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। দার্শনিক হিউমের শিষ্য ড্রামণ্ড ছিলেন সববিষয়ে ঘোর সংশয়বাদী এবং শাণিত যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার নির্ভিক সমর্থক।১৬ গুরু ড্রামণ্ডের সুযোগ্য শিষ্য তৈরি হয়েছিলেন ডিরোজিও। চোদ্দবছর বয়সে অ্যাকাডেমির শিক্ষা শেষ করে তিনি কিছুদিন বাইরে চাকরি করেন। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ এবং তরুণ বয়সেই কাব্য ও অন্যান্য রচনার মধ্যে তার পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। পর্তুগীজ পরিবারের সন্তান হয়েও, এদেশকে তিনি স্বদেশ ও মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। এদেশে তিনিই বোধহয় প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন। ১৮২৬ সালে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে, তিনি হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। গরানহাটায় (চিৎপুরে) হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা হয় যখন, তখন আটবছরের বালক ডিরোজিও ধর্মতলা অ্যাকাডেমির ছাত্র। তখন কে জানত, এই ডিরোজিওই আর আট-নয় বছরের মধ্যে হিন্দুকলেজের শিক্ষক হবেন এবং সেখানে তাঁর ছাত্রদের মনোজগতে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করবেন!

তাই করেছিলেন ডিরোজিও। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে তাঁর সমবয়স্ক ছিলেন। ভাবী 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই প্রায় তাঁর

কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, সকলে তাঁর ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, এঁরাও ডিরোজিওর অধ্যাপনাকালে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। কারণ, ১৮২৬ সালে ডিরোজিও হিন্দুকলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং ১৮২৮ সালে কৃষ্ণমোহন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, রসিককৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। একজন তরুণ শিক্ষককে ঘিরে তরুণ ছাত্রদের এরকম সমাবেশ সাধারণত ঘটে না। কেবল পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষকরূপে নয়, নবযুগের আদর্শ শিক্ষকরূপে ডিরোজিও নব্যবঙ্গের তরুণ ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। মনীষী বেকন ছিলেন তাঁর আদর্শ। শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল তাঁর অভিনব। প্রত্যেক প্রশ্নের ও বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত বক্তব্যটিকে পেশ করে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ দিতেন এবং তার ভিতর থেকে আসল বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথটি তাদের সন্ধান করে নিতে সাহায্য করতেন। ক্লাসের মধ্যে এক বিচিত্র রোমান্টিক পারিবেশের সৃষ্টি হত এবং ছাত্রদের কাছে ডিরোজিও যেন তার নায়ক হতেন। মুগ্ধ হয়ে ছাত্ররা তাঁর কথা শুনত। ডিরোজিওর এই ক্লাস সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বলেছেন :[১৭]

> ···it was·· more like the Academus of Plato, or the Lyceum of Aristotle.

বিদ্যালয়ের ক্লাস বিতর্কসভায় পরিণত করা সম্ভব নয়, কিন্তু শিক্ষক ডিরোজিও এমনভাবে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্ররা তাতে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হত যে, শিক্ষক-ছাত্র সকলের মন বিতর্কের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ক ও আলোচনাসভা হত ডিরোজিওর বাড়ির বৈঠকখানায়। সভার নাম হল 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (Academic Association)। মনেহয়, ১৮২৭-২৮ সাল থেকেই এই অ্যাকাডেমির নিয়মিত অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডিরোজিওর বৈঠকখানা থেকে এই বিদ্বৎসভা পরে শ্রীকৃষ্ণসিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে (যেখানে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়) স্থানান্তরিত হয়। এই অ্যাকাডেমি ও তার অধিবেশন সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছেন :[১৮]

> Derozio's drawing-room proving too confined a place for these discussions, the young men got up, about the

year 1828, a debating society, which they called the Academic Association, or the Academy. In this grove of Academus—and the debating society had a garden attached to it, it being held on the premises now occupied by the Ward's Institution—did the choice spirits of Young Calcutta hold worth, week after week, on the social, moral and religious questions of the day. The general tone of the discussions was a decided rovolt against existing religious institutions . The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism ! Down with Orthodoxy ! '

'পার্থিনন' (The Parthenon) নামে সভার মুখপত্র প্রকাশিত হল, কিন্তু হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি হুমকি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। সভার কাজ তাতে বন্ধ হল না। কেবল অ্যাকাডেমিতে নয়, ডিরোজিও অন্যান্য শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সভায় (যেমন পটলডাঙার হেয়ার সাহেবের স্কুলে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ডিরোজিও ও তাঁর অ্যাকাডেমির আকর্ষণ তরুণদের কাছে বাড়তে লাগল। কলকাতা শহরের শিক্ষিত তরুণরা ডিরোজিও ও তাঁর অ্যাকাডেমির সংস্পর্শে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁদের জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ হতে লাগল অ্যাকাডেমির উদার পরিবেশে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ সকলেই এই অ্যাকাডেমির সভাতেই বক্তৃতা দিতে শিখলেন এবং বক্তা হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা লিখলেন :

Krishna Mohan was the readiest and most effective speaker, unaffected in manner, calm and unimpassioned, though sometimes bursting into vehemence.

কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর খুব প্রিয়ও ছিলেন।[১৯] অ্যাকাডেমির বিতর্ক-সভায় রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতার বিকাশ হয়েছিল কিভাবে, সে সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু লিখেছেন :[২০]

It is said that this debating club was to him what the Oxford Club had been to many an English orator. Ramgopal continued to shine as a speaker at the Academic.

He was an eloquent speaker, but not so close a reasoner as his colleague Babu Russick Krishna Mullick.

মানিকতলার বাগানবাড়িতে তরুণদের এই বিদ্বৎসভায় প্রবীণ ও বিচক্ষণেরাও যোগদান করার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন না। সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান, ডেভিড হেয়ার, ডেপুটি-গবর্নর বার্ড সাহেব, প্রায়ই যেতেন অ্যাকাডেমির অধিবেশনে। অ্যাকাডেমির তরুণ সভ্যদের মুখে-মুখে হিউম বেকন লক-এর বাণী শোনা যেত।

পরবর্তীকালের কোনো-কোনো সভার মুদ্রিত বিবরণী যেমন পাওয়া যায়, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সেরকম কিছু পাওয়া যায় না। পরে যেমন সমসাময়িক পত্রিকায় এইসব সভা ও সোসাইটির অধিবেশনের বিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, অ্যাকাডেমির সেরকম কোনো বিবরণ বোধহয় প্রকাশিত হয়নি। অনেক অনুসন্ধান করেও, যা পাওয়া যায় এরকম কোনো সেকালের পত্রিকাতে আমি কোনো বিবরণ পাইনি। যদি পাওয়া যেত, তাহলে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের উন্মেষপর্বের ইতিহাস আমরা আরও সবিস্তারে জানতে পারতাম। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই ছিল ইয়ং বেঙ্গলের আসল ট্রেনিং স্কুল। আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাসে তাই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব আছে।

বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণ বিদ্রোহীরা যখন মানিকতলার বাগানবাড়িতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে নানারকম সমস্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন বাইরের জনসমাজে তাই নিয়ে মৃদুগুঞ্জন হলেও, বিশেষ কলরবের সৃষ্টি হয়নি। বিদ্বৎসভার নিরিবিলি পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল দলের তরুণদের বাক্‌যুদ্ধ অব্যাহত ধারায় চলছিল। এমন সময় বাইরের নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে হঠাৎ যেন আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেল। বেণ্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন (১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর)। বিধর্মীর বিধান বানচাল করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রতিপক্ষরা মাসখানেকের মধ্যে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা গঠন করলেন (১৭ জানুয়ারি, ১৮৩০)। মাস ছয়েকের মধ্যে পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় পৌঁছলেন (২৭ মে, ১৮৩০)। উদ্দেশ্য খ্রীস্টধর্মের প্রচার ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের পথ পরিষ্কার করা। কলকাতায় পৌঁছেই তিনি মিশনারিসুলভ উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ডাফ সাহেব কলকাতায় পৌঁছবার ছ-মাস পরে

রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করলেন (১৯ নভেম্বর, ১৮৩০)। তার প্রায় একমাসের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শগুরু ডিরোজিওর অকালমৃত্যু হল (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। রামমোহন ও বিদ্রোহী তরুণদের মন্ত্রদাতা ডিরোজিও, বাংলার সমাজ-জীবনের এমনই এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের উত্তরাধিকার বহন করার সমস্ত দায়িত্ব পড়ল নবীনদের উপর। নবীনরা সেই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। সংগ্রাম ও প্রস্তুতি একসঙ্গেই চলতে লাগল। এই প্রস্তুতির পর্বে বাংলা দেশে সভাসমিতির বিকাশ হল অনেক। তার মধ্যে বিদ্বৎসভাই বেশি। কেবল বিদ্বৎসভাকেন্দ্রিক সংগ্রামের এই রূপ বিশেষ লক্ষণীয়।

ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে, ১৮৩৩ সালে (২৭ সেপ্টেম্বর) রামমোহনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে আধুনিক বাংলার ইতিহাসে একটি পর্বান্তর হয় বলা যায়। প্রবাসে থাকলেও, বাংলার অগ্রগামী দলের আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁর কোনো প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। ১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়, যার প্রভাব বাংলার সমাজ-জীবনে গভীর ও দূরপ্রসারী। ক্রমাগত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরের সমাজপ্রাঙ্গণ কলরবমুখর হয়ে ওঠে। এক নতুন কলরব, প্রাণহীন স্থিতিশীল সমাজে যা শোনা যায় না কখনো। বদ্ধ ডোবার পাড়ে তরঙ্গ প্রতিহত হয় না। সমাজের মধ্যে যখন প্রবল স্রোত বইতে থাকে, তখন তার তরঙ্গের আঘাতে তীরে ভাঙন ধরে। সমস্যার-পর-সমস্যা, সুপ্ত লোকচেতনাকে খানিকটা জাগিয়ে তোলে। জাগ্রত চেতনার বিস্ময়ের সাময়িক ঘোর যখন কেটে যায়, তখন সমস্যার মুখোমুখি সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। সকলে এক দিকে বা এক ভঙ্গিতে দাঁড়ায় না। কেউ দাঁড়ায় সামনে, কেউ পিছনে, কেউ পাশে। নানা মত ও নানা পথের চাপে বিদীর্ণ হয়ে যায় সমাজ। দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ভিতর দিয়ে নতুন পথ তৈরি করে এগিয়ে চলে মানুষ। সমাজ-জীবনের 'নির্জন নিস্তব্ধ অঙ্গন এইধরনের ঐতিহাসিক সংঘাতকালে রণাঙ্গণে পরিণত হয়। আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোড়ন-আন্দোলনের মধ্যে সমাজের এই নতুন প্রাণচাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৮২৫-৫০) বাংলার সমাজ-জীবনে এই বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তখন সভাসমিতিরও বিকাশ হয়েছিল যথেষ্ট।

রামমোহন ও ডিরোজিওর অভাবে নবীনরা প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় আন্দোলন চালিয়েছিলেন। প্রাচীনদের দলে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিও খুব সংহত ছিল। নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্বে, নবীনরা সবদিক দিয়েই খুব দুর্বল ছিলেন। তার উপর তাঁদেব কোনো প্রবীণ পবিচালক বা পরামর্শদাতা কেউ ছিলেন না। সুতরাং একত্রে দলবেঁধে মিলেমিশে, সভাসমিতি গঠন করে, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশেষ কোনো 'যুগ' হিসেবে আখ্যা দিতে হলে এইসময়টাকে 'ইয়ং বেঙ্গলের যুগ' বলতে হয়। এই যুগের সভাসমিতির শুধু সংখ্যা নয়, বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য ছিল, সভা-গঠনেব উদ্দেশ্যের ঐক্য। স্বাধীন চিন্তা, অবাধ আলোচনা ও মেলামেশার আদর্শ নিয়েই সমস্ত সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল। কলকাতা শহরকেন্দ্রিক নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ও বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক সংস্কারসংগ্রাম প্রধানত সভাসমিতির তর্কবিতর্কের রূপ ধারণ করেছিল।

সামাজিক সংঘাতের তীব্রতার মধ্যেই সভাসমিতির বিকাশ হয়। এটা আধুনিক সমাজেব বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে, এ যুগেব সভাসমিতি বা ক্লাব-সোসাইটি বলতে যা বোঝায়, তার বিকাশ হয়নি। ইটালীয় রিনেসান্সের 'হিউম্যানিস্টিক অ্যাকাডেমি'-গুলির আদর্শে ইয়োরোপে সোসাইটি ও অ্যাকাডেমির কিছু-কিছু বিকাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীব আগে সম্মিলিতভাবে স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তেমন তৈরি হয়নি। সামাজিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরাও এ কথা স্বীকার করেন:[২১]

> —the world had not known until the eighteenth century any societies organised for collective thinking and discussion. There had been religious sects, guilds of merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers; but there had never been—anything like societies, let alone a whole network of societies, *for* the avowed purpose of collective thinking and talking.

সভাসমিতি সোসাইটি—'for the avowed purpose of collective thinking and talking'—একমাত্র সমস্যাসংকুল সংঘাতমুখর সমাজেই

স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ও তাগিদে গড়ে উঠতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-বিপ্লব (আমেরিকান ও ফরাসী) মানুষের চিরন্তন একমুখী চিন্তাধারাকে বহুমুখী করে তোলে। অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্যা ও সংশয় মানুষের মনে জাগে, যার সদুত্তর ও সমাধান সে চায়। তার ফলে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় সম্মিলিতভাবে। এই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়। এই সমস্ত সভা-সোসাইটির মূলনীতি হল স্বাধীন চিন্তা (Freedom of Thought), অবাধ আত্মপ্রকাশের (Freedom of Expression) ও পরস্পর-মিলনের (Freedom of Association) অধিকার। নবযুগের গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনটি প্রধান স্তম্ভ, মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যার অস্তিত্ব ছিল না। এইসময় ইয়োরোপে Freethinker-দের আন্দোলনও আরম্ভ হয়। নবযুগের আলোকপন্থীদের লক্ষ্য করে ভল্টেয়ার উপদেশ দিতেন—সুহৃদগোষ্ঠী ও চক্র গঠন করে একত্রে মেলামেশা করতে, একত্রে আহারবিহার করতে, একত্রে আলাপ-আলোচনা করতে, সভা করতে। এই আদর্শের প্রেরণায় ফ্রান্সে সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল প্রচুর। হব্‌স তাঁর *Leviathan* গ্রন্থে 'Captivity of Understanding'-এর কথা বলেন এবং স্পিনোজা মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে বহু দার্শনিক আলোচনা করেন। লক্ ও হিউমের রচনাও মানুষের চিন্তাবিপ্লবের পথ পরিষ্কার করে দেয়। তা ছাড়া *Rights of Man* এবং *The Age of Reason*-এর লেখক টম্ পেইন (Tom Paine) নবযুগের নবীন সমাজের চিন্তাধারায় এইসময় গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ভল্টেয়ার হিউম লক্, টম্ পেইন প্রমুখ নবযুগের চিন্তানায়কদের রচনাবলী গ্রন্থাকারে কলকাতার বন্দরে আমদানি হতে থাকে। বিদেশী মদ ও শৌখিন জিনিসপত্তরের সঙ্গে এইসব গ্রন্থের কথা কলকাতার ব্যবসায়ীরা* তখনকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করতেন। *Calcutta Chronicle, Calcutta Gazette, Morning Post* প্রভৃতি কলকাতার ইংরেজি পত্রিকায় এরকম অনেক বইয়ের বার্তা প্রচারিত হত। এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। বোঝা যায়, বিদেশ থেকে কেবল যে পোর্ট-ওয়াইন, জিন, ক্ল্যারেট, ব্র্যাণ্ডি আসত তা নয়, তার চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি উত্তেজক

পদার্থ আসত—যেমন ভল্টেয়ারের গ্রন্থাবলী, হিউমের গ্রন্থাবলী, টম্ পেইনের গ্রন্থাবলী ইত্যাদি। অবশ্য বই ও ব্র্যাণ্ডির সামাজিক ভূমিকা তখন প্রায় একই ছিল, বাংলার নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে।

একহাতে ব্র্যাণ্ডি, আর-একহাতে বই নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল দল চিন্তাবিপ্লবের উদ্‌যোগ করেছিলেন। তাঁদের ব্র্যাণ্ডিপ্রীতির কথা অনেকে বলে গেছেন, কিন্তু নবযুগের চিন্তানায়কদের প্রচারিত আদর্শের প্রতি অনুরাগের কথা তেমনভাবে কেউ বলেননি। এই আদর্শ আধুনিক যুগের মুদ্রিত বইয়ের মারফত সমাজে প্রচারিত হয়। বাংলা দেশেও হয়েছে। কিভাবে হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। টম্ পেইনের গ্রন্থাবলী প্রচুর সংখ্যায় আমদানি হয়েছে। দৃষ্টান্তটি পাদ্রি ডাফ্ সাহেব উল্লেখ করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শগুরুদের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:[২২]

> Their great authorities···were Hume's *Essays* and Paine's *Age of Reason*. With copies of the latter, in particular, they were *abundantly supplied*···It was some wretched bookseller in the United States of America who—basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars, despatched to Calcutta a cargo of that most malignant and pestiferous of all antichristian publications. From one ship a thousand copies were landed, and at first were sold at the cheap rate of one rupee per copy; but such was the demand that the price soon rose, and after a few months, it was actually quintupled. Besides the separate copies of the *Age of Reason*, there was also a cheap American edition, in one thick vol. 8vo, of all Paine's works including the *Rights of Man*, and other minor pieces, political and theological.

১৮৩০-৩১ সালের কথা বলেছেন ডাফ সাহেব। পাদ্রি সাহেবের পক্ষে টম্ পেইনের বইকে 'malignant' ও 'pestiferous' বলা খুবই স্বাভাবিক। জাহাজ-বোঝাই টম্ পেইনের বই এল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তা হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। এই একটিমাত্র ঘটনা থেকে নব্যবঙ্গের নবীন বিদ্বৎ-

সমাজের মানসিক অবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা হল, তাঁদের সমাজসংস্কার-সংগ্রাম প্রধানত ছিল বিদেশী গ্রন্থপ্রণোদিত।

নতুন মানবাধিকার ও অবাধ চিন্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হল তাঁদের দুটি। একটি হল পত্রিকা, আরএকটি বিদ্বৎসভা, বিতর্কসভা প্রভৃতি বিভিন্ন সভা-সোসাইটি। দুইটি নতুন হাতিয়ার, প্রেসও নতুন, সোসাইটিও নতুন। প্রাচীনপন্থীরাও এই একই হাতিয়ার নিয়ে নামলেন, কিন্তু তাঁদের সুবিধা ছিল অনেক। প্রথমত ধনিকদের আর্থিক পোষকতা ছিল, দ্বিতীয়ত কুসংস্কারের ভূতপ্রেত লেলিয়ে দেবার সুযোগ ছিল এবং সনাতন ধর্মের দোহাই তো ছিলই। ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান সম্বল ছিল 'যুক্তি'। তাঁরা ছিলেন Age of Reason-এর প্রতিনিধি। পত্রিকা ও সভা-সোসাইটির মাধ্যমে তাঁরা সেই যুক্তির অভিযান আরম্ভ করলেন। বাড়াবাড়ি বা আতিশয্য প্রকাশ তাঁরা যথেষ্ট করেছেন। পার্থিনন, হেসপারাস, ইস্ট ইণ্ডিয়ান, রিফর্মার, এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি কয়েকটি ভাল-ভাল পত্রিকা এইসময় প্রকাশিত হল। ধর্মসভার পাণ্ডারা তাঁদের পত্রিকাদি মারফত হিন্দুকলেজের শিক্ষাদীক্ষা ও খ্রীস্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ করতে লাগলেন। হিন্দুকলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার বিরুদ্ধে চিঠিপত্রও বিভিন্ন সংবাদপত্রে (সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি) প্রকাশিত হতে থাকল।

কেবল পত্রিকার মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল দল আন্দোলন করেননি। 'পত্রিকা' ছিল তাঁদের প্রথম হাতিয়ার। দ্বিতীয় হাতিয়ার ছিল 'সভাসমিতি'। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, সঠিক জানা যায় না। তবে অ্যাকাডেমি ছাড়াও, এইসময় আরও অনেক সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল। কি পরিমাণ বিকাশ হয়েছিল, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর ডাফ সাহেবের জীবনচরিতে এবং ডাফ নিজে তা লিখে গিয়েছেন। রেভারেণ্ড দে লিখেছেন :[১৩]

> **Debating Societies were multiplied, in which bigotry, high-handed tyranny, superstition and Hindu orthodoxy was denounced in no measured terms.**

ডাফ সাহেব আরো বিশদভাবে এই সমস্ত সভাসমিতি সম্বন্ধে লিখেছেন।

তিনি বলেছেন যে, এর আগে সভা-সোসাইটি ছিল, কিন্তু খুব বেশি ছিল না। তার মধ্যে অধিকাংশ সভা ইংরেজরাই উদ্‌যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ আদর্শসংঘাতের এই নতুন পরিবেশে সভাসমিতির দ্রুত বিকাশ হতে থাকল এবং তার সংখ্যা অনেক বাড়ল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এই সমস্ত সভার বৈঠক হত কলকাতায়। এক-একজন একাধিক সভায় যোগ দিতেন ও সদস্য হতেন। আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক যেন একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল।* এমন কোনো বিষয় ছিল না যা নিয়ে আলোচনা বা তর্ক হত না। বিষয়বৈচিত্র্যের যেন শেষ ছিল না মনে হয়। ডাফ সাহেব লিখেছেন :[২৪]

> New Societies started up with the utmost rapidity in every part of the native city. There was not an evening in the week, on which one, two or more of these were not held ; and each individual was generally enrolled a member of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania ; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to a prodigious excess.

সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে, নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা ও তর্কাতর্কি করার মনোভাব একসময় প্রায় 'ম্যানিয়া' হয়ে উঠেছিল বাংলা দেশে, ১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে। (অবশ্য শতাধিক বছর পরেও বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সেই 'ম্যানিয়া' আজও ঠিক রয়েছে, বরং আরও বেশি প্রবল হয়েছে বলা চলে)। ১৮৩০ সালে জনৈক 'হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ' কলেজের ছেলেদের শিক্ষা ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের চিঠিতে এই বলে অভিযোগ করেছিলেন :[২৫]

> প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য এবং অনেক বিষয় বিপরীত ইহারা স্থানে ২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্ধ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব…।

---

* সম্প্রতি বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের 'সেমিনারে'র বাতিকের মতো।

পরিষ্কার বোঝা যায়, ছেলেরা যে স্থানে-স্থানে সভা করেছে এবং সেইসব সভায় সামাজিক আচারব্যবহার, এমনকি রাজনিয়মের বা রাজনীতিরও আলোচনা করছে, এতেই 'ছাত্রস্ত পিতুঃ' বেশ বিচলিত হয়েছেন। তিনি ছেলেকে কলেজ ছাড়াতে চেয়েছেন, ছেলে ছাড়েনি। মাসিক টাকাও বন্ধ করেছেন, কিন্তু তাতেও 'উৎপাতগ্রস্ত' হয়েছেন। অথচ এরকম অবস্থার মাত্র বছর ছয় আগেও, ইংরেজি সংবাদপত্রে এই জাতীয় সভা-সোসাইটি স্থাপনের আবশ্যকতার কথা লেখা হত। *Bengal Hurkaru* পত্রে ১৮২৪ সালে জনৈক লেখক সভা-সোসাইটি স্থাপনের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তার উত্তরে 'Medicus' নাম দিয়ে আর-একজন লেখেন :[২৬]

> A correspondent in your paper called the attention of the public, to the formation of debating society in Calcutta, by which I conceive he means an Institution, where men may unbend their minds, discuss and express their sentiments freely and fearlessly, on every subject connected with general knowledge, both political and scientific · In countries, whose Government are different from this, such institutions flourish and to the credit of such, it may be said, that through their medium, Political Economy and Science have been greatly promoted.

'মেডিকাস'-এর যুক্তি একেবারে বাতিল করা যায় না। ১৮২৪ থেকে ১৮৩০ সাল, মাত্র ছ-বছরের মধ্যে, দেশের সামাজিক অবস্থার যে খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল, সভা-সোসাইটির অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই তা বোঝা যায়। তার ফলে যে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ও বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার কিছুটা প্রসার হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রদের পিতারা সেইজন্য এইসব সভাসমিতির সংখ্যাবৃদ্ধিতে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

এই সমস্ত সভা ও সোসাইটি কিভাবে পরিচালিত হত, সকলেরই তা জানবার কৌতূহল হবে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। এ-সম্বন্ধে ডাফ সাহেব যা লিখে গেছেন, তা অনেকটা নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি নিজে একাধিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অনেক সভায় যোগদান করতেন :

At one or other of these societies I felt it to be at once a duty and a privilege constantly to attend.

তাঁর বিবরণ থেকে যেটুকু জানা যায়, তার মর্ম এই :

সভার সদস্যরা যখন বক্তৃতা দিতেন তখন ইংরেজ লেখকদের প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা নিজেদের মতামত জোরালো করে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতেন। আলোচ্য বিষয় ঐতিহাসিক হলে রবার্টসন ও গিবন উদ্ধৃত করা হত। রাজনৈতিক বিষয় হলে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরিমি বেস্থাম, বৈজ্ঞানিক বিষয় হলে নিউটন ও ডেভি, ধর্মবিষয় হলে হিউম ও টম্ পেইন, দার্শনিক বিষয় হলে লক, রীড, ষ্টিউয়ার্ট ও ব্রাউন প্রমুখের রচনা থেকে প্রচুর পরিমাণে আবৃত্তি করা হত। বক্তৃতাটিকে সাহিত্যিক মাধুর্যে জীবন্ত করে তোলার জন্য ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের বচনা থেকে ভাল-ভাল অংশ তাঁরা উদ্ধৃত করতেন। তার মধ্যে ওয়াল্টার স্কট ও বায়রন থেকেই বেশি বলা হত মধ্যে মধ্যে রবার্ট বার্নসের কাব্যাংশও আবৃত্তি করতে শোনা যেত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা—

But the most striking feature in the whole was the freedom with which all the subjects were discussed.

আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সোসাইটির অধিবেশনের যে পরিচয় দিয়েছেন ডাফ সাহেব, তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য। উদ্ধৃতিটি অনেক বড় হবে বলে বাংলায় তাঁর বক্তব্যের সারটুকু উল্লেখ করছি।[২৭] সাধারণত বিদ্বৎসভা ও বিতর্কসভার বৈঠকে যা দেখা যায়, তাতে আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এক দল বলেন এবং বিপক্ষে আর-এক দল বলেন। বিদ্বৎসভার ঠিক এ-রকম কোনো বাঁধাধরা নিয়ম না থাকলেও, বিতর্কসভা এই নিয়মেই পরিচালিত হয়। ইয়ং-বেঙ্গলের যুগে বিদ্বৎসভা ও বিতর্কসভার মধ্যে 'ফর্মাল' ভেদ বিশেষ ছিল না। কারণ সব সভাই প্রায় আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্কের জন্য গঠিত হয়েছিল, প্রকৃত সামাজিক সংগ্রামের জন্য নয়। এই আলোচনাপ্রবণতাই ছিল তখনকার সভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিতর্কসভায় পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের দল পূর্বনির্দিষ্ট থাকাই রীতিসংগত। কিন্তু ডাফ সাহেব বলেছেন, তখনকার সভায় তা থাকত না। সভার পরিচালকরা বলতেন যে তাতে আলোচনা যান্ত্রিক 'ফর্মাল' আলোচনা হয়, কার কি বিশ্বাস ও ধারণা তা জানা যায় না, কেবল পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মতো মৌখিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়। সে রকম আলোচনায় এই-

জাতীয় সভা-স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই অনেকটা ব্যর্থ হয়। সুতরাং এইসব সভায় কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকতেন না। সকলে মিলিত হবার পর যখন সভার কাজ আরম্ভ হত, তখন স্বাধীনভাবে যাঁর যে-পক্ষে ইচ্ছা আলোচনা করতে পারতেন। তাতে হয়ত এক পক্ষেই পর-পর ছ-সাত জন বক্তা বলে গেলেন এমনও হত—

> **All were, therefore, left alike free in their choice , hence it not infrequently happened, that more than half-a-dozen followed in succession on the same side.**

সভ্যবৃন্দের বলা শেষ হয়ে গেলে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যদি কেউ ঐ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইতেন, তাঁকে তা বলবার সুযোগ দেওয়া হত। সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে পরস্পরের মতামতের প্রতি এমন একটা সংযত শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেত, যা সত্যই প্রশংসনীয়। যাঁদের ধৈর্য সংযম শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদির অভাব সম্বন্ধে প্রাচীনদের অভিযোগের অন্ত ছিল না, তাঁরা যে সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ককালে এ রকম উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। বোঝা যায়, সমাজসংস্কারের নীতি বা পদ্ধতির দিক দিয়ে তাঁরা অধৈর্য অদূরদর্শিতা ও অসংযমের পরিচয় দিলেও, ব্যক্তিগত চরিত্রের বনিয়াদ তাঁদের দৃঢ় ছিল। তা না হলে, তাঁদের সভাসমিতির পরিচালনায় এই শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যেত না।

সভা-সোসাইটির বৈচিত্র্য

১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে, এই সামাজিক আলোড়নের ফলে, কলকাতা শহরে অনেক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। সমসাময়িক পত্রিকাগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজলে সভাসমিতির সুদীর্ঘ একটি তালিকাও তৈরি করা যেতে পারে। সভা-স্থাপন করা যখন তরুণ বাংলার প্রায় বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন স্বল্পকালস্থায়ী সভাও অনেক গড়ে উঠেছিল। পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাদের অনেকগুলির দু-এক লাইন 'নোটিস' ছাড়া আর কোনো পরিচয় কোথাও খুঁজে

পাওয়া যায় না। তার মধ্যে কয়েকটি সভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল এবং কিছুকাল স্থায়ীও হয়েছিল। যেমন :

বঙ্গহিত সভা	সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন	জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা
জ্ঞানসন্দীপন সভা	সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ্ জেনারেল নলেজ
ডিবেটিং ক্লাব	তত্ত্ববোধিনী সভা
বঙ্গরঞ্জিনী সভা	মেকানিকস ইন্স্টিটিউট
বিজ্ঞানদায়িনী সভা	টিচার্স সোসাইটি

ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তরুণ ছাত্রমহলে সভাস্থাপনের প্রেরণা সঞ্চার করে। ১৮৩০ সালেই 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। ৯ সেপ্টেম্বরের (১৮৩০) 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে এই সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানা যায় যে তার কিছুদিন আগে এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সিমলায় রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা, হিন্দুকলেজের ছাত্ররা এবং হেয়ার সাহেবের পটলডাঙা স্কুলের ছাত্ররা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই সভা স্থাপন করেন। রামমোহন রায় তখনো বিলাত যাত্রা করেননি, কলকাতাতেই ছিলেন। এই সভা-স্থাপনের ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি-না বলা যায় না। সভার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী দেখে মনে হয়, হয়ত তিনি পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় কেবল নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা করার স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু ধর্মবিষয়ে কোনোরকম আলোচনা করা নিষেধ ছিল। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমির আলোচনায়, অথবা ডাফ হিল প্রভৃতি পাদ্রিদের ধর্মপ্রচারে তখন যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সমাজে, রামমোহন রায় তার প্রতি খুব যে প্রসন্ন ছিলেন তা মনে হয় না। তাই কেবল বিদ্যানুশীলনের উদ্দেশ্যে এই সভাস্থাপনে তাঁর খানিকটা সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারে এই সভার অধিবেশন হতো।[২৮] 'জ্ঞানসন্দীপন সভা' স্থাপিত হয় পাথুরিয়াঘাটায় উমানন্দ ঠাকুরের বাড়িতে, ১৮৩০ সালে। এই সভারও নিয়ম ছিল, ধর্মবিষয়ে আলোচনা করা চলবে না, কেবল বিদ্যাবিষয়ে চলবে। এই সময় চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে 'ডিবেটিং ক্লাব' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। 'ইংলণ্ডীয় বিদ্যা' যাতে সভ্যবৃন্দের মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয়, এই ছিল ক্লাবের উদ্দেশ্য। রামমোহন রায়ের সিমলার স্কুলে, ১৮৩২ সালের

শেষ দিকে, 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপিত হয়। সভাস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষার বিশেষ অনুশীলন করা। অধিকাংশ সভাসমিতিতে শিক্ষিত যুবকরা তখন ইংরেজিতে বক্তৃতা ও আলোচনা করতেন। বাংলাভাষা অনেকটা উপেক্ষিত হতো। তরুণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এই বিজাতীয় মনোভাব দূর করবার জন্য এই সভাটি স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং সম্পাদক ছিলেন তাঁর সতীর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[২৯]

এ রকম আরও অনেক সভাসমিতি এই সময় স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও নিয়মকানুন সকলের যে এক ছিল তা নয়। তবে যার যে উদ্দেশ্য বা নিয়মই থাক্-না কেন, একটি প্রয়োজন সকলেই সমানভাবে বোধ করতেন। সেটি হল বিদ্যানুশীলনের প্রয়োজন। এদিক থেকে বিচার করলে, এই সময়কার দুটি সভা আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছে মনে হয়। একটি 'Society for the Acquisition of General Knowledge'—বাংলায় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' বলে পরিচিত ; আর একটি 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

পাশ্চাত্ত্য বিদ্বৎসভার প্রভাব

এদেশের বিদ্বৎসভা স্থাপনের মূলে যে পাশ্চাত্ত্য সভা-সোসাইটির প্রেরণা ছিল অনেকটা, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র যুগে এই প্রেরণা আরো বেশি প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয়েছে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রচুর সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নতুন জ্ঞান বিতরণ করা। এই সব সোসাইটির মধ্যে 'মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউটে'র নাম করতে হয়। ইংলণ্ডের অনেক জায়গায় এই ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব সোসাইটি এই সময় স্থাপিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'Society for the Propagation of Christian Knowledge' (S.P.C.K), 'Society for the Diffusion of Useful Knowledge' (S.P.V.K.), 'Society for the Diffusion of Political Knowledge' (S.D P.K.) ইত্যাদি। ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে প্রত্যেকটি সভা রীতিমতো প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমাদের দেশে বিদ্বৎ-

সভার ও অন্যান্য সভার নামকরণে পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সভার প্রভাব দেখা যায়। 'মেকানিক্স্ ইনস্টিটিউট' এদেশেও স্থাপিত হয়েছিল। S.D.U.K. ও S.D.P.K.-র সঙ্গে এদেশের 'Society for the Acquisition of General Knowledge' (S.A.G.K.-এর সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। 'Diffusion' ও 'Acquisition'-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। সে-পার্থক্য ইংলণ্ড ও বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের সঙ্গে তুলনীয়। ইংলণ্ডের কাছে তখন বড় প্রশ্ন 'Diffusion'-এর, আমাদের দেশের বিদ্বৎসমাজের সমস্যা হলো 'Acquisition'-এর। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রায় একই সময়ে দুই দেশেই এই জাতীয় সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়।*

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকজন উদ্‌যোগী মিলে একটি ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে প্রচার করেন। প্রচারপত্রে পাঁচজনের স্বাক্ষর ছিল দেখা যায়—তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে। ১৮৪০-৪২ সালে প্রকাশিত সভার 'ট্র্যানজ্যাকশন্'-এর গোড়ায় প্রচারপত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে নয় শুধু, অন্যান্য দিক থেকেও এই প্রচারপত্রটি খুব মূল্যবান।†

---

* ইংলণ্ডের এই সব সভা সোসাইটির বিবরণ Dr. R. K. Webb-এর *The British Working Class Reader, 1790—1848—Literacy and Social Tension* নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত, এই সব সোসাইটি বহু অপ্রকাশিত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বিবরণ থেকে ডক্টর ওয়েব এই ইতিহাস রচনা করেছেন। পূর্বে যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিবরণ বিশদ ও সম্পূর্ণ নয়। যেমন, S. D. U. K. সম্বন্ধে ডক্টর ওয়েব লিখেছেন—"There is, for example, a pretty extravagant passage in G.D. H. Cole and Raymond Postgate, *The Common People* (London, 1947), pp. 810-11. The only large-scale attempt at an assessment of the Society's work is an unsatisfactory and unpublished dissertation in the University of London : M. C. Grobel, 'The Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 1826-46.' (p. 176. Note 13.)

† এই অধ্যায়ের শেষে জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রচারপত্রটি মুদ্রিত হয়েছে।

প্রচারপত্রের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ১৮৩৮ সালে স্বাক্ষরকারীরা যখনই এই সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে পত্রটি প্রচার করেন তখন, তাঁরা বলেছেন, সুপরিচিত একটিও বিতর্কসভা বা বিদ্বৎসভা ছিল না। যা দু-একটি ছিল, তাও তখন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ডাফ সাহেবের কলকাতায় আসার পর, বিশেষ করে ডিরোজিওর মৃত্যুর পর, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তার আগেই হয়ত তার কার্যকলাপ ঝিমিয়ে পড়েছিল। তার পরে আর কোনো ভাল বিদ্বৎসভা গড়ে ওঠেনি। তার কারণ, সামাজিক অবস্থার অতিদ্রুত পট-পরিবর্তন। বাইরের সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে যখন চারিদিকে তীব্র কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তা যত সীমাবদ্ধ স্তরে হোক, তখন বিদ্বৎজনেরাও অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে থাকেন। ছোট ছোট বৈঠকী দল তখন অনেক গজিয়ে উঠলেও, বেশ বড় কোনো স্থায়ী বিদ্বৎসভা স্থাপনের সুযোগ হয় না। ১৮৩০-৩১ সালে বাংলা দেশে ঠিক এই অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। ডাফ সাহেব এই সময়ে যে ধরনের সভার প্রাচুর্যের কথা বলেছেন, তার অধিকাংশই ছোট ছোট বৈঠকী সভা, বড় কোনো বিদ্বৎসভা নয়। পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে অবস্থা অনেকটা শান্ত হবার পর, সকলে মিলিত হয়ে বেশ বড় স্থায়ী বিদ্বৎসভা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা,' 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ইত্যাদি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে হয়নি, কারণ হবার মতো অনুকূল পরিবেশ ছিল না।

প্রচারপত্রের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, সুস্থির বিদ্যাচর্চা ও গভীর জ্ঞানার্জনের সংকল্প। উদ্যমীদের মধ্যে অনেকে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রতিভার উন্মেষপর্বে তখন তাঁদের বিদ্যালোচনায় চপলতা ও তরলতার ভাগ ছিল বেশি। আট-নয় বছরের মধ্যে তাঁদেরও অনেক মানসিক পরিবর্তন হয়েছে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়েছে, দৃষ্টিও গভীর হয়েছে। এখন আর তাঁরা বিদ্বৎসভায় চাপল্যের বা তারল্যের পরিচয় দিতে চান না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানে আর তাঁরা সন্তুষ্ট নন। প্রত্যেক বিষয়ের গভীরে তাঁরা প্রবেশ করতে চান। প্রকাশ্যে এ কথা প্রচারপত্রে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, আত্মসংযম ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধেও তাঁরা অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। যদি কোনো সভ্য তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট দিনে সভায় যোগদান না করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুত বক্তৃতাটি না দেন বা রচনাটি না পাঠ

করেন, তাহলে সভার সম্মতিক্রমে তাঁকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যেতে পারে। বিদ্বৎসভার এ রকম কঠোর বিধান বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু প্রথম পর্বের অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার কথা ভাবলে, পরবর্তীকালের এই কঠোর শৃঙ্খলার ইঙ্গিত অনেকটা স্বাভাবিকও বলা যেতে পারে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল—কেবল পাশ্চাত্ত্য বা সাধারণ বিদ্যাচর্চার মধ্যে তাঁরা আর সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। স্থানীয় বিষয় নিয়েও ("matters…of local interest") তাঁরা পড়াশুনা ও আলোচনা করতে চান, কেবল বিদেশের নয়, নিজের দেশেরও। জ্ঞানোপার্জিকা সভায় এ দেশের পুরাণ ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ১৮২৮-২৯ থেকে ১৮৩৮-৩৯ সাল, মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে এদেশীয় বিদ্বৎসভার যে বেশ খানিকটা আদর্শগত পরিবর্তন হয়েছিল, জ্ঞানোপার্জিকা সভার 'ম্যানিফেস্টো' তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

১৮৩৮ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র, পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক প্রভৃতি। সাধারণ সভ্যরূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার ছিল সকলের, বিশেষ বিষয়ে কোনো নিষেধ ছিল না। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান দর্শন, সব বিষয় নিয়ে এই সভায় নিয়মিত আলোচনা হত। সাধারণত সংস্কৃতকলেজেই সভার মাসিক অধিবেশন হতো বলে মনে হয়। বাংলার নবীন বিদ্বৎসমাজের প্রায় সকলেই এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজদের মধ্যেও অনেক এই সভার অধিবেশনে যোগদান করতেন। সেই সময় যতগুলি বিদ্বৎসভা স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই সভাটিকে বিদেশীরাও একবাক্যে প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু কোনদিক থেকেই এই সভা বিদেশীদের মুখাপেক্ষী ছিল না। বরং সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হত, তাতে কলকাতার ইংরেজসমাজ সভার প্রতি খুব প্রীত ছিলেন না। তবু আদর্শ বিদ্বৎসভার সমস্ত গুণ এই সভার ছিল বলেই তাঁরা প্রশংসা না করে পারেননি। কলকাতার তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট জর্জ জনসন

লিখেছেন: "One of the most meritorious of the native association is the Society for the Acquisition of General Knowledge."[৩০]

এই সভার Transactions ও Proceedings-ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হত। অন্তত তিন খণ্ড Transactions প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কারণ ১৮৪৩ সালের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—"3rd Volume of the transactions of the Society for the Acquisition of General Knowledge, shortly to be published and all volumes to be had of Messrs. P. S D.' Rozaroi & Co."[৩১] এই মুদ্রিত বিবরণীগুলি থেকে সভার আলোচ্য বিষয়, আলোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড ও অন্যান্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা জানা যায়। 'জ্ঞানান্বেষণ' থেকে উদ্ধৃত 'সমাচার দর্পণের" একটি বিবরণে দেখা যায়, প্রথম বর্ষের একটি অধিবেশনে (১৬ মে, ১৮৩৮) কৃষ্ণমোহন পুরাণপাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেদিন "অতিশয় দুর্যোগ ও মেঘগর্জন হওয়াতে ঐ পাদরি বাবুর বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন।"[৩২] সভার কার্যকলাপ পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পরিচালকরা বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। ১৮৪৩ সালে 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে সভার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথমেই এই কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন: "Although this Society has existed for several years, its members are so modest and have so studiously resisted publicity as to be hardly known that the Society does exist."[৩৩] হরকরাপত্রের এই বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, সভ্যরা নিজেদের খুশি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোন বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন এবং কেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে নয়, বাংলাভাষাতেও তাঁরা প্রবন্ধ রচনা করে পাঠ করতে পারতেন। ১৮৪৩ সালে সভার সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। এই সভ্যসংখ্যা থেকে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভার' ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

নব্যবঙ্গের মুখপাত্ররা সকলেই প্রায় এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তাঁরা সভায় আলোচনা করতেন, এবং কেবল দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত না, রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও

আলোচনা হত। আলোচনাকালে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনাও তাঁরা মধ্যে মধ্যে নম্রভাবে করতেন। একবার একটি অধিবেশনে এইরকম আলোচনার সময় খুব গণ্ডগোল হয়। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত হয়।[৩৪] সংক্ষেপে ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃতকলেজে সভার একটি অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ও আর-একজন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বক্তা এবং বক্তব্য বিষয় ছিল: "On the Present State of the East Indian Company's Criminal Judicature, and Police, under the Bengal Presidency." বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিসের অসাধুতা ও অকর্মণ্যতা এবং ব্রিটিশের এদেশে আসার অভিসন্ধি সম্বন্ধে জোবালো ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেন:

> To stand up in a hall which the government had erected and in the heart of a city which was the focus of enlightenment. and there to denounce, as oppressors and robbers, the men who governed the country, did in his opinion, amount to treason.. The College would never have been in existence, but for the solicitude the Government felt in the mental improvement of the natives of India. He could not permit it, therefore, to be converted into a den of treason, and must close the doors against all such meetings.

রিচার্ডসনের এই অসৌজন্য-প্রকাশে বিচলিত হয়ে, সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী (হিন্দুকলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র) চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন:

> Captain Richardson, with due respect I beg to say that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society, and on behalf of

my friend Baboo Dukhin. I must say that your remarks are anything but becoming. I am bound also to add that I consider your conduct as an insult to the society and that if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the Committee of the Hindoo College, and if necessary to the Government itself. We have obtained the use of this public hall, by leave applied for and received from *the Committee*, and not through your personal favour. You are only a visitor on this occasion, and possess no right to interrupt a member of this society in the utterance of his opinions. I hope that Captain Richardson will see the propriety of offering an apology to my friend, the writer of the essay and to the meeting.

এর পর দক্ষিণারঞ্জন তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রিচার্ডসন পরে অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। জ্ঞানোপার্জিকা সভা যে কেবল এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে সাহায্য করেছিল তা নয়, বাঙালী শিক্ষিতসমাজে স্বাদেশিকতাবোধও প্রথম জাগিয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে জর্জ টম্‌সন এদেশে আসার পর, এই সভার সভ্যবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা হয়।* তাঁরই উদ্‌যোগে সভার সভ্যবৃন্দ ১৮৪৩ সালে *Bengal British India Society* স্থাপন করেন। এই জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যদের মধ্যেই অনেকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। গোড়া থেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা

বাংলা ভাষায় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলন ও আলোচনার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা, উনিশ শতকের প্রথম পাদে, খানিকটা তৎপর হন। এই তৎপরতা ও উৎসাহ তিরিশের দশক থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৮৩২ সালের ৩০ ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপিত হয়। সভা প্রতিষ্ঠায় যাঁরা উদ্‌যোগী ছিলেন

* জর্জ টম্‌সন এই সময় 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও মেকানিকস ইন্‌স্টিটিউটে' অনেক বক্তৃতা দেন। ১৮৪৩ সালে *Bengal Hurkaru* ও *The Bengal Spectator* পত্রে তাঁর অনেক বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারেও কিছু বক্তৃতা সংকলিত হয়।

তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, রামমোহনের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র) এবং রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র)। এই সভাটিকে পুরোপুরি ছাত্রদের একটি বিদ্বৎসভা বলা যায়। সভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রমাপ্রসাদ রায় (তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র) সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে একজন ছাত্রবক্তা বলেন: "এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে আম্মাদিগের অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে মঙ্গল হইবেক।" বাংলা ভাষাতেই সভার সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হবে, এ বিষয়ে সকলে সম্মত হন। কিন্তু এই সভার পরবর্তী কার্য-কলাপের কোনো বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না।

বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা

এই সভা ঠিক কোন্ সময় স্থাপিত হয় সঠিক জানা যায় না। মনে হয় ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সরকারী নীতি ঘোষিত হবার পরে এই সভা স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন করা ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। সভার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, যিনি পরে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক হন। সভাব সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ('সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক), হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক), প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, কালীনাথ রায়, প্যারীমোহন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহিত্যিকরা এই সভার সদস্য ছিলেন।

১৮৩৬ সালের ৮ ডিসেম্বর সভার একটি অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায়। সভায় যখন 'দুঃখ থেকে সুখ অথবা সুখ থেকে দুঃখের উৎপত্তি'—এই বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব হয়, তখন বামলোচন ঘোষ এই বলে আপত্তি করেন যে এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে ধর্মপ্রসঙ্গ উঠবে এবং 'ধর্ম' যেহেতু এই সভায় আলোচনার নিয়মবহির্ভূত বিষয় সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না। পরে তিনি বলেন, "নীতি এবং রাজকার্য্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবে।" এই প্রস্তাব সভায় সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভার

অন্যতম সদস্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবিষয়ে তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (২ মার্চ ১৮৫২) লেখেন:

"রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্ত্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তরে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়।"

তত্ত্ববোধিনী সভা

'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠার বছর দেড়েকের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৩৯, ৬ অক্টোবর)। প্রথমে নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা', পরে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নাম হয়।[৩৫] সভার প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল: "আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার"। কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের দিক থেকে বিচার করলে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি কিছুটা অবিচার করা হবে। ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও পূর্বেকার সনাতনপন্থীদের 'ধর্মসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল। ১৮৩০ সাল থেকে বাংলার সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন হতে থাকে, ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর নৈতিক জীবনে যে ভাঙন ধরে, রামমোহন রায় জীবিত থাকলে হয়ত তার অসংযত উদ্দামতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকটাকে কিছুটা সংযত করার চেষ্টা করতেন। যে-সমস্যা সবচেয়ে ভয়াবহ-রূপে প্রকট হয়ে উঠলো, তা হলো কৃষ্ণমোহনের মতো বাংলার প্রতিভাবান

যুবকদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের সমস্যা। তখন বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মতো নতুন কোনো সভা স্থাপনের কথা রামমোহনও ভাবতে বাধ্য হতেন। তাঁর অভাবে, তাঁর উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ গুরুর অসমাপ্ত কর্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হন। এ ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো, ডাফ হিল প্রমুখ পাদ্রিদের ইংরেজশিক্ষিত বাঙালীসমাজে খ্রীস্টানধর্মের প্রচারের অবাধ অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ করা। ধর্মসভার মতো 'গুড়ুম সভা' স্থাপন করে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার মতো ধর্মতত্ত্বান্বেষী সভার পক্ষেই কিছুটা তা করা সম্ভব। এই দিক দিয়ে, ধর্মের ক্ষেত্রেও, তত্ত্ববোধিনী সভা সেই সময় বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

শুধু ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সভার দান সমসাময়িক যে-কোনো বিদ্বৎসভার তুলনায় বেশি ছাড়া কম নয়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :[৩৬]

> *The Tattwa bodhini Sabha* used to hold weekly and monthly meetings. Papers were read and discussed at the weekly meetings and divine service used to be held once a month. The *Sabha* commenced its career with only ten young men as its members. But so great were the energy and enthusiasm with which its proceedings were conducted that in the course of two years the number of members rose to 500···

আরও কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা প্রায় আটশত পর্যন্ত হয়। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী বিদ্বৎসমাজের অধিকাংশই তখন এই সভার সভ্য হন। সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সাহিত্য ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্ম দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার প্রবর্তন করে বাংলা সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পথ প্রদর্শন করে। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো পুরুষদের সাহিত্যক্ষেত্রে অভ্যুদয় হয় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার দ্রুত প্রসার ও উন্নতি হয়। এ সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন (১৭৬৭ শকাব্দে) :[৩৭]

তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা দ্বারা

তাহার উন্নতি আলোচনা করিলে অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদে মগ্ন হইতে হয়। প্রথম কালে দশজন মাত্র সভ্য দ্বারা উহার সংস্থাপন হয়। এইক্ষণে পাঁচশত অপেক্ষা অধিক সভ্য উৎসাহের সহিত ইহাকে আশ্রয় দিতেছেন ; তৎকালে মাসে দশমুদ্রা একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল। এইক্ষণে প্রতি মাসে প্রায় চারি-শত টাকা সংগৃহীত হইতেছে এবং আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে ; তৎকালে সভার অভিপ্রেত ব্রহ্মোপাসনাব প্রচার জন্য প্রধান প্রধান সমুদায় উপায়ের অভাব ছিল, এইক্ষণে তজ্জন্য জ্ঞানজনক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে · প্রথমতঃ কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন দিবসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কিয়দ্দিবস তৎকালের যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম সেই স্থানেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পরন্তু কার্য্যের কিঞ্চিৎ বাহুল্য দ্বারা স্থানের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত সভার কার্য্যালয় ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ষষ্টিমুদ্রা মাসিক বেতনে কলিকাতার শিমুলিয়াস্থিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পরিচালিত হয়। সেখানে তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কর্ম্ম এবং সভার অন্যান্য তাবৎ কার্য্য একত্র নির্ব্বাহ হইত। তদনন্তর তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশবাটী গ্রামে অন্তর হইবার নিশ্চয় হওয়াতে পাঠশালার ব্যয় এবং সেই বৃহৎ বাটীর বেতন একত্র নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া অধ্যক্ষেরা সভার ক্ষুদ্র কার্য্যালয় ১৭৬৪ শকের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরন্তু অল্প দিবস পরেই সভার অবস্থা সুন্দররূপে পরিবর্ত্তন হইল, সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের কল্পনা হইল, বহু কর্ম্মচারী আবশ্যক হইল,···সুতরাং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক ক্ষুদ্রাংশ দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ হস্ত স্থানে এই সমুদয় ব্যাপার সম্পোন্ন হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল? অতএব ১৭৬৫ শকের আষাঢ় মাসে সেখানে হইতে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ অঞ্চলে এক প্রশস্ত গৃহে সভার কার্য্যালয় আনীত হইল।

সভার কাজকর্মের ক্রমিক প্রসারের ফলে স্থানসংকট দেখা দেয়। স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ালে সভার কাজ সুসম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সভ্যদের কাছে এককালীন দানের জন্য পত্রিকা মারফত আবেদন করা হয়, যাতে সভার একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করা যায়—

মাসিক দান নহে, বার্ষিক দানও নহে, চিরকালের নিমিত্তে একবার মাত্র কিঞ্চিৎ দান করিলে যখন এরূপ মহোপকার হয়, তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়া কি তাহাতে কুন্ঠিত হইতে পারেন? তত্ত্ববোধিনী সভার অতি দরিদ্র সভ্যও যিনি তিনি আপনার ভরণপোষণের দৈনিক ব্যয়কে সংক্ষেপ করিয়াও ইহার আনুকূল্য করিতে কি কৃপণ হইতে পারেন?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার মতো আর কোনো সভা বাংলার বিদ্বৎসমাজে এত ব্যাপকভাবে বিস্তার করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন, এমন কি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যেটুকু ত্রুটি ছিল, তত্ত্ববোধনী সভা সেই ত্রুটিটুকু পূরণ করে দিয়েছিল। সেই ত্রুটি হলো, দেশীয় সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য (?) ঐতিহ্যের উপর পাদপ্রতিষ্ঠার অভাব। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েও, তত্ত্ববোধিনী সভা দেশীয় ঐতিহ্যের যা-কিছু মহান তাকে অস্বীকার করেনি। কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা তার বিশেষ ছিল না। ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে যে-কোনো স্থায়ী সংস্কার কিছু করা যায় না, অথচ তার কালসঞ্চিত কুসংস্কারগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে যে মুক্ত মনের অঙ্গনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ সত্য কেউ কেউ কিছুটা উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে নোঙরহীন আদর্শবাদীদের দিগভ্রান্তির মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা এই দিক্-নির্ণয়ে খানিকটা সাহায্য করেছিল। পূর্বেকার সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভার যা-কিছু ভালো তার অনেকটা গ্রহণ করে এবং যা-কিছু মন্দ তার অনেকটা বর্জন করে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষদিক থেকে তত্ত্ববোধিনী সভা নবযুগের বাংলার বিদ্বৎসমাজকে একটা আদর্শ-সমন্বয়ের পথের সন্ধান করতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাবপর থেকে সভা-সমিতির ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সূচনা হল।

বিদ্বৎসভার তৃতীয় যুগটিকে বাংলাদেশে 'বিদ্যাসাগরের যুগ' বলা যায়। এই যুগটি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ জুড়ে (১৮৫০-৭৫) বিস্তৃত। এই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার বিদ্বৎসভার ক্ষেত্র এই সময় আরও প্রসারিত হল। তার কারণ, শিক্ষিত বাঙালী বিদ্বজ্জনের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে অনেক বাড়ল। বিদ্বৎসভায় মিলিত হয়ে, সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা

সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য তাঁরা অনেক বেশি উৎসাহী হলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারারও দ্রুত আমদানি হতে থাকল। ইংরেজ ও শিক্ষিত বাঙালী, উভয়েরই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হল। শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঘাত-প্রতিঘাতের পর, উচ্ছ্বাসের আবেগাতিশয্য প্রশমিত হয়ে, সামাজিক জীবনে সবেমাত্র সমীকরণপর্বের সূচনা হল বলা চলে। তৃতীয় যুগের বিদ্বৎসভাগুলি এই সমীকরণ ও আত্মীকরণের পথ কিছুটা প্রস্তুত করে দিল।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে, এর মধ্যে, বিদ্বৎসভার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হল। প্রথম যুগের 'আত্মীয় সভা', 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ছিল কতকটা ঘরোয়া বৈঠকের মতো। দ্বিতীয় যুগের 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ' বা 'তত্ত্ববোধিনী-সভা' আর ঘরোয়া বৈঠক ঠিক রইল না, তার কর্মক্ষেত্র কিছুটা বিস্তৃত হল। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও, ইয়ং বেঙ্গলের যুগে জ্ঞানবিদ্যার প্রেরণার ক্ষেত্রে, জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে, তার দান স্মরণীয়। তত্ত্ববোধিনী সভার
প্রেরণার ক্ষেত্রে, জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে, তার দান স্মরণীয়। তত্ত্ববোধিনী সভার
কাজ বিদ্যাসাগরযুগে আরও বাড়ল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হলেন। কিন্তু নতুন যে-সব বিদ্বৎসভা তৃতীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত হল, তার স্বরূপই অনেকটা বদলে গেল। সমাজ-জীবনের গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে জ্ঞানতপস্যা করলে, বিদ্বৎসভা যে প্রাণহীন স্কলাস্টিক অ্যাকাডেমিতে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত দেশের বিদ্বৎজনদের বৃহদংশের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কও থাকে না, এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। উনিশ শতকে বাংলা দেশে যে-সব বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অধিকাংশই সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ অ্যাকাডেমিতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, প্রত্যেক যুগের বিদ্বৎসভার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। সেগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এ দেশের বিদ্বৎসমাজ প্রধানত এই সব সভার ভিতর দিয়ে আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং নিজেদের জ্ঞানবিদ্যাকে সমাজ ও দেশের একটা সীমাবদ্ধ স্তরে মানসিক কর্ষণের কাজে নিয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ছোট ছোট সভাসমিতি আলোচনাচক্র এই সময় অনেক বেশি গড়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনে তাদের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। সামান্য হলেও যে

কয়েকটি বিদ্বৎসভা, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার মধ্যে প্রধান এইগুলি—

বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০)
বেথুন সোসাইটি (১৮৫১)
বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩)
সুহৃদ্‌ সমিতি (১৮৫৪)
ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৫৭)
বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (১৮৬৭)

এ ছাড়া, পূর্বে স্থাপিত হলেও, 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রতিপত্তি এই সময় তেমন ক্ষুণ্ণ হয়নি। বাংলার বিশিষ্ট বিদ্বৎজনেরা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য শিক্ষা ও সমাজ জীবনকে তাঁদের আকাংক্ষিত পথে পরিচালিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ

এই বিদ্বৎসভা স্থাপিত হয় ১৮৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে। ১৪ ও ২৮ ডিসেম্বর (১৮৫০) 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকায় এই সভা স্থাপনের বিবরণ অনুষ্ঠান-পত্রাদিসহ প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানপত্রে এই সভার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয় :

> ট্রাক্ট সোসাইটি কিম্বা খৃষ্টান নলেজ সোসাইটি কি স্কুল বুক সোসাইটি অথবা আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার সাহেবেরা সভার নিয়মমতে সর্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটির সাহেবেরা প্রকাশ করিবেন।"

এখানে 'সাহেবেরা' কথাটি লক্ষণীয়। এই উক্তির কারণ হল, সভার প্রথম চোদ্দজন সদস্যের মধ্যে এগার জন ছিলেন ইংরেজ, বাকি তিনজন ছিলেন বাঙালী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত এবং উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সাহেবদের মধ্যে ছিলেন বেথুন, হজসন প্রাট, মেরিডিথ টাউনশেণ্ড, মার্শম্যান, সিটন-কার, হেনরি উডরো প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা। কিন্তু সভার ঘোষিত উদ্দেশ্য যে কতদূর সফল হতে পারে-না-পারে তা সভার এই সাংগঠনিক রূপ দেখেই অনেকটা বোঝা যায়।

সভার কার্যকলাপের মধ্যে প্রধান হলো বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাংলা মাসিক পত্র প্রকাশ (অক্টোবর ১৮৫১)। এর পর 'বিবিধার্থে'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে

(১৮৬১), ১৮৬৩ সালে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনাতেই 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে 'বিবিধার্থের' অনুরূপ আর একখানি সচিত্র বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষায় সাধারণের জ্ঞানের জন্য বই প্রকাশের যে পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য সভার ছিল তা অনেকটাই ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন (২৭ চৈত্র ১২৬৬ সন):

> ভদ্র লোকের ও বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি এরূপ উদ্দেশ্যই হয় তবে সামাজিকদের এতদ্বিষয়ে গুটিকত উপদেশ লওয়া কর্তব্য। সমাজ সংস্থাপনাবধি সামাজিকেরা যতগুলি গ্রন্থ ও পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিষ্প্রয়োজন ও অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। আপনার দোষগুণ আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। এনিমিত্তে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ তাহা বুঝিতে পারেন নাই।...*

বেথুন সোসাইটি

১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বেথুন সোসাইটি' স্থাপিত হয়। ১১ ডিসেম্বর ডক্টর মুয়াট মেডিকাল কলেজে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের একটি সভা ডাকেন এবং সেই সভায় একটি নতুন বিদ্বৎসভা স্থাপনের আবশ্যকতার কথা প্রস্তাব করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য সোসাইটির কথা উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গত বলেন যে, শিক্ষিত বাঙালীরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পান, তার জন্য এই জাতীয় বিদ্বৎসভা আরও বেশি স্থাপন করা উচিত ("..pointed out the great necessity of devising some means of bringing the educated natives more into personal contact with each other..")। এই সভায় মুয়াট আরও একটি কথা বলেন যা প্রণিধানযোগ্য। ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিদ্বৎসভার ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে এ দেশের সমাজের গড়নই এমন বাঁধাধরা, সামাজিক প্রথার বন্ধন এত কঠোর যে পরিবার ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক-স্থাপনের সুযোগ এখানে অনেক সীমাবদ্ধ। এ দেশের সুস্থ সামাজিক জীবনযাত্রার জন্যও তাই বিদ্বৎসভার প্রয়োজন

* বিনয় ঘোষ: সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭১-৭৩

বেশি ("...how much more such means of mental improvement and intellectual recreation were needed in this country, where, from the very constitution of native society and the social customs of the people, even the private relations of individuals and families were necessarily much restricted.")।

মেডিকাল কলেজের আলোচনাসভায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর গুডিভ চক্রবর্তী, ডক্টর স্প্রেঙ্গার, রেভারেণ্ড লঙ প্রভৃতি যোগ দেন। সভাতে স্থির হয় যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিদ্বৎসভা স্থাপন করা প্রয়োজন ("A Society be established for the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science")। এর কিছুদিন আগে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয় (১২ই আগস্ট ১৮৫১)। স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি এ দেশের নানাপ্রকার সমাজকল্যাণকর কাজে বেথুন সাহেবের দানের কথা স্মরণ করে, নতুন সভার নাম রাখা হয় 'বেথুন সোসাইটি'।

সোসাইটির উদ্যোক্তা সভ্যদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীদের সংখ্যা ছিল বেশি। শিক্ষিত সমাজে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সঙ্গে বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ পাদ্রি ও রাজকর্মচারীরাও যোগ দিয়েছিলেন। সোসাইটির রিপোর্টে এই উদ্যোক্তাদের নাম দেওয়া হয়েছে।

জে. এফ. মুয়াট	হরমোহন চ্যাটার্জি
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	জগদীশনাথ রায়
রেভারেণ্ড জেমস লঙ	নবীনচন্দ্র মিত্র
মেজর জি. টি. মার্শাল	জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি	প্যারীচরণ সরকার
ডক্টর স্প্রেঙ্গার	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডক্টর গুডিভ চক্রবর্তী	প্যারীচাঁদ মিত্র
এল. চ্যাট	রসিকলাল সেন
বাবু রামগোপাল ঘোষ	প্রসন্নকুমার মিত্র
রাধানাথ শিকদার	গোপালচন্দ্র দত্ত
রামচন্দ্র মিত্র	হরিচন্দ্র দত্ত
কৈলাসচন্দ্র বসু	দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তার আদর্শগত রূপেরও যে কিছুটা পরিবর্তন

হয়েছিল তা বোঝা যায়। সংযম ও সমন্বয়-সাধন ছিল সভার অন্যতম নীতি। যেভাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন এবং মুয়াট ও পাদ্রি লঙের মতো বিদেশী বিদ্যোৎসাহীরাও ছিলেন। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজের অগ্রগণ্যদের মধ্যে সকলেই যে বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বা তার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা নয়। রাধাকান্ত দেব এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহী হননি, পরে অবশ্য সভ্য হয়েছিলেন। ধর্মসভার আদর্শে যাঁদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তি লালিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেথুন সোসাইটির সংস্পর্শে আসেননি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যাঁরা সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুসলমান বিদ্বৎসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ তাঁদের অন্যতম। বেথুন সোসাইটির আগে আর কোনো বিদ্বৎসভায় মুসলমানরা এ রকম সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

সোসাইটির নিয়মাবলা যা রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে নীতি-নির্দেশক পঞ্চম নিয়মটি হলো:

> Discourses (written or verbal) in English, Bengali or Urdu, on Literary or Scientific subjects, may be delivered at the Society's Meetings, but none treating of religion or politics shall be admissible.

সোসাইটির অধিবেশনে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে, ইংরেজি বাংলা বা উর্দু ভাষায়, লিখিত বা মৌখিক ভাষণ দেওয়া যাবে, কিন্তু ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষিদ্ধ।

প্রথম দিকে সোসাইটির উদ্যোক্তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি এবং এসব বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেননি। তার কারণ, তাঁরা মনে করেছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি আলোচনায় তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং অকারণে সভ্যদের মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তোলা হবে। ইংরেজি বাংলা উর্দু তিনটি ভাষাতেই সভ্যদের আলোচনার অধিকার ছিল। উর্দুর উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়, বেথুন সোসাইটির আলোচনায় মুসলমানরাও যোগদান করতেন।

প্রতিষ্ঠার পর অল্পদিনের মধ্যেই সোসাইটি শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে প্রিয় হয়ে

ওঠে এবং ঢাকা শহরেও 'The Branch Bethune Society of Dacca' নামে একটি শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বছরে ১৮৫২ সালেই কলকাতায় সোসাইটির সভ্যসংখ্যা হয় ১৩১ জন, তার মধ্যে ১০৫ জন বাঙালী। পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বাড়ে—

	১৮৫৩	১৮৫৪	১৮৫৫	১৮৫৬	১৮৫৭
মোট :	১৪০ জন	২২৮ জন	২৮১ জন	৩০৪ জন	৩৪৫ জন
বাঙালী :	১১৯ জন	?	?	?	?

পৃথকভাবে এদেশী ও বিদেশী সভ্যের সংখ্যা পরবর্তী রিপোর্টে উল্লিখিত না হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে সোসাইটির সভ্যসংখ্যা প্রায় সাড়ে-তিনশো হয়েছিল, এবং তার মধ্যে অন্তত তিনশো জন বাঙালী ছিলেন বলে মনে হয়। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে 'এলিট' (Elite) বা সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য হবার মতো ব্যক্তি ১৮৫৭ সালে এর চেয়ে খুব বেশি ছিলেন না। বেথুন সোসাইটি এই বাঙালী এলিট-সমাজের সঙ্গে ইয়োরোপীয় উচ্চসমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। ১৮৬১ সালের রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছে :

> A Society which had succeeded in bringing together—for mutual intellectual culture and rational recreation, the very elite of the educated native community and *blending them in friendly union with* leading members of the Civil, Military and Medical services of Government, of the Calcutta bar, of the Missionary body, and other non-official classes···(বাঁকা হরফ লেখকের)

১৮৫৯ সালে সোসাইটি প্রায় অচল হয়ে ওঠে। দেখা যায়, সভ্যদের অধিকাংশই অধিবেশনে আসেন না, এবং ১৪৫৮ টাকা তাঁদের চাঁদা বাকি পড়েছে। কোনো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করাও আর হয় না। সভাপতি মুয়াট ইংলণ্ড যাবার পরে হজসন প্র্যাট, গুডউইন, জেম্‌স্‌ হিউম যথাক্রমে সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট হন। হিউম সাহেব ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সভার কাজে তেমন মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। এই সময় সভার পুরাতন সভ্যরা চিন্তা করতে থাকেন, কিভাবে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। প্রথমত এমন একজনকে সভার প্রেসিডেণ্ট করা দরকার, যাঁর উপর সম্প্রদায়-নির্বিশেষে

শিক্ষিত সমাজের অনেকের আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে। পাদ্রি অ্যালেকজাণ্ডার ডাফের নাম প্রস্তাব করা হয়—

> though for various reasons which it is needless now to specify, he had never joined the Society as a member.

ডাফ সাহেব প্রথমে রাজী হননি। পরে তিনি রাজী হন এবং বোধ হয় তাঁর জন্যই সোসাইটির পঞ্চম নিয়মটি (পূর্বোদ্ধৃত) সংশোধন করে, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। ১৮৫৯ সালের ১৪ জুলাইয়ের অধিবেশনে ডক্টর শেভার্স সংশোধিত নিয়মটি প্রস্তাবাকারে পেশ করেন এই মর্মে :

> The grand and distinctive object of the Society being to promote among the educated natives of Bengal a taste for literary and scientific pursuits, discourses written or verbal, in English, Bengali, or Urdu, may be delivered at the Society's meetings, on any subject which may be fairly included within the range of Literature and Science.

ধর্ম ও রাজনীতিকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে গণ্য করা যেতে পারে, এবং আলোচনাকালে সেই কথা মনে রাখলে কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপারও না ঘটতে পারে। প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায় এবং নিয়মটিও গৃহীত হয়। বেথুন সোসাইটির ইতিহাসে, এর পর থেকে, দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় বলা চলে ("With the adoption of these resolutions, the Bethune Society terminated the first period of its existence, and was fairly projected upon its second.")।

বেথুন সোসাইটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত। ১৮৭০-৭১ সাল পর্যন্ত সোসাইটির কাজকর্মের বিবরণ তার Transactions এবং Proceedings-এর মধ্যে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের বিবরণ তৎকালের সাময়িকপত্রে ও দৈনিক সংবাদপত্রে অনেক প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) 'সঙ্গীত ও ভাব' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং আলোচনাকালে মধ্যে মধ্যে নিজের কণ্ঠসঙ্গীত সভ্যবৃন্দকে শোনান। এই অনুষ্ঠানের আংশিক বিবরণ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সন)। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংরেজি 'The Statesman' পত্রিকাতে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনের খবর মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ২৯ মার্চ ১৮৮৩ সোসাইটির একটি অধিবেশন হয় মেডিকাল কলেজ লেকচার থিয়েটারে। প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :

> I look upon the Permanent Settlement as a Magna Carta. Upon the Settlement I take my stand, and with it I propose to fight, the battles of the Ryot...I have no hesitation in saying that I look upon the Permanent Settlement as a great, if not an unmixed blessing...
>
> *The Statesmen* : April 14, 1883.

১৮৮৯ সালেও (৫ ডিসেম্বর) বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল 'The Pressnt Social Reaction ; What does It mean ?' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্যার হেনরি কটন।

বেথুন সোসাইটিতে পঠিত ও আলোচিত শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হল :

। ১৮৫২ ।

Peary Churn Sircar : On the Education and Training of children in Bengal.

। ১৮৫৩ ।

Umesh Chandra Dutt : The present State of Education at Krishnaghur with a few short remarks on the character and social position of the educated natives of Bengal.

Pundit Issar Chunder Vidyasagar : On the Sanscrit Language and Literature in English and Bengallee.

Juggodishnath Roy : On Education and the Necessity of Instruction in the Vernacular Language.

Hurro chunder Dutt : On Bengali Life and Society.

। ১৮৫৪ ।

Rev. Lal Behari Day : On Vernacular Education in Bengal.

Nobinkisto Bose : On the School of Industrial Art.

Chunder Sekhur Goopta : On the Power and Responsibility of knowledge with special reference to the duties the educated natives owe to their country.

। ১৮৫৬ ।

Rev. Lal Behari Day. On English Education in Bengal.

Nobin Chunder Paulit : On Hindoo Woman as a Wife and Widow

Tarauk Nath Dutt : On the Remarriage of Hindoo Widows in Bengal.

। ১৮৫৭ ।

Koylas Chunder Bose : Hindoo Female Education how best achieved under the present circumstances of Hindoo Society.

। ১৮৫৮-৫৯ ।

Dr. S. G Chuckerburty : On Native Education

Horropersad Chatterjee : On the Best Mode of Instructing the Females of India.

। ১৮৫৯-৬০ ।

E. B. Cowell : On the principles of Historical Evidence and the Permanent Importance of the study of History to the educated Natives of India.

Macleod Wylie · Hannah Moore and Female Education.

। ১৮৬৫-৬৬ ।

Keshub Chnnder Sen : On a Visit to Madras and Bombay with Notes of differences between their customs with those of Bengal.

Maulavi Abdul Lateef : Periodical Census

Mary Carpenter : The Reformatory School System and its influence on Female Criminals.

। ১৮৬৯ ।

Gopal Chunder Dutt : Educated Natives, their Duties and Responsibilities.

। ১৮৮৩ ।

Surendranath Banerjee: Permanent Settlement as a Magna Carta.

। ১৮৮৯ ।

Bepin Chandra Pal: The Present Social Reaction; What does it mean.

সমাজবিজ্ঞানের চর্চা

সাহিত্য ও দর্শন, জনস্বাস্থ্য শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান—এই কয়টি বিভাগ ছিল বেথুন সোসাইটিতে। বাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক বিভাগের পরিচালকদের কৃত কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি করে রিপোর্ট পেশ করতে হত। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি। ইয়োরোপেও তখন সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল বলা চলে। জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন 'লিবারাল' আদর্শ যাঁরা এ দেশে বহন করে আনতেন, তাঁরাই সেদিন বাংলা দেশে অন্যান্য বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চর্চারও প্রয়োজন আছে বুঝেছিলেন। বিদ্বৎসভার মধ্যে বাংলা দেশে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তকের সম্মান বেথুন সোসাইটির প্রাপ্য। তার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও অগ্রণী হয়ে এই বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি পাদ্রি লঙ সাহেব। বাংলার বিদ্যাচর্চায় পাদ্রি লঙের দান শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই স্বীকার করেন।

পাদ্রি লঙ সাহেব একবার তাঁর রিপোর্টে সমাজবিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর উদাসীনতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন:

> **One of the reasons why so little in the way of writing has hitherto been contributed to sociology by educated natives and others, may have been the system of education that has prevailed and is prevailing, which cultivates memory to the exclusion of almost every other faculty and particularly the necessary one of observation.—*Report of the Sociological Section,* Bethune Soceety, April 26, 1861.**

আজও যে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের সমাদর বাড়েনি, তার প্রধান কারণ, আমাদের শিক্ষার গোড়ায় গলদ আছে। পরীক্ষায় কৃতী ছাত্ররা যতটা স্মৃতিশক্তির সাধনা করেন, বিচারবিশ্লেষণশক্তির সাধনা ততটা করেন না। শিক্ষাপদ্ধতিই এমন যে তার মধ্যে একমাত্র যান্ত্রিক স্মৃতিশক্তি ছাড়া অন্য কোনো শক্তির অনুশীলনের সুযোগ থাকে না। বিশেষ করে, পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে যে বিরাট জ্ঞানজগৎ আছে, যান্ত্রিক পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষার ধারায় সে-সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলও জাগে না। শিক্ষিত মন অনুসন্ধানী হয় না, বিচারমুখী হয় না, কেবল মুখস্থবিদ্যার গণ্ডির মধ্যে থেকে নিশ্চিত চাকরিগত জীবন কাটাতে চায়। সমাজবিজ্ঞানের চর্চা এইজন্য আজও আমাদের দেশে প্রচলিত হয়নি। ইতিহাস দর্শন সাহিত্য, কোনো ক্ষেত্রেই আজও আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের স্পৃহা বাড়েনি। সর্বত্রই আমরা স্মৃতি শ্রুতি ও অলীক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ইচ্ছুক। তাই বাংলা সাহিত্যে থোড়-বড়িখাড়া কাব্য ও গল্প-উপন্যাসের এত প্রাচুর্য এবং অন্য বিষয় অনুশীলনে বিস্ময়কর দৈন্য দেখা যায়। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের মুকুর এই ভাবালুতাসর্বস্ব কাব্যকাহিনীসাহিত্যের (অধিকাংশই অপাঠ্য) প্রাচুর্য এবং মননশীল সাহিত্যের দৈন্য।

১৮৬১ সালে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে লঙ সাহেব বলেছিলেন:

> The time is very favourable for sociological investigation as an educated class of natives is rapidly rising, qualified not only to investigate, but also to write the results of their investigations.

লঙের আশা আজও সফল হয়নি। বেথুন সোসাইটি ও তার সমাজবিজ্ঞান-বিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। সোসাইটি থাকাকালীন পরে একটি স্বতন্ত্র 'সমাজবিজ্ঞান সভা'ও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমাজবিজ্ঞানচর্চার উৎসাহ শিক্ষিতদের মধ্যে তেমন বাড়েনি। শ্রমবিমুখ অনুশীলনকাতর কল্পনাপ্রবণ শিক্ষিত বাঙালী আজও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা আলোচনার প্রতি তেমন অনুরাগী নন। গল্প ও কাহিনী শুনতেই তাঁরা বেশি ভালবাসেন। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হলো, মননশীলতার এই সুস্থ ধারাটি পর্যন্ত আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার বদলে অলস রোমান্টিক ভাবালুভাবের রোমন্থনে আমরা ক্রমেই আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

"৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন" (সংবাদ প্রভাকর, ১৪ জুন ১৮৫৩)। এই সভার নাম 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। বেথুন সোসাইটির প্রতিপত্তির যুগেই এই সভা সিংহ মহাশয়ের গৃহে স্থাপিত হয়, প্রধানত বিদ্বৎসভাকে একটি টিপিকাল বাঙালী মজলিসে পরিণত করার জন্য। বেথুন সোসাইটির সব বাঙালী সভ্যই প্রায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবীন তরুণ বিদ্যোৎসাহী যাঁরা বেথুন সোসাইটির গুরুগম্ভীর পরিবেশে খুব বেশি স্বস্তিবোধ করতেন না, তাঁরা প্রবীণদের সংসর্গে আসতে হলেও, বিদ্যোৎসাহিনী সভার ঘরোয়া পরিবেশে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তা উপভোগ্য :

> পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে। আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন্ সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর দোতলায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল Commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমি ছেলেমানুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন বড়লোক হইতে পারিবে। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলেমানুষ বলিযাই হৌক, বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবাবিবাহের উপর—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলেমানুষের প্রশংসা করে রাত কাটান যাবে না কি?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়েছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি

সভার patron গোছ ছিলেন।—মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।—(পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, ৮৪-৮৫)।

কৃষ্ণকমলের মতো তখনকার তরুণ বিদ্যোৎসাহীরা কালীপ্রসন্ন সিংহের সভায় গিয়ে যতটা স্বচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনায় যোগদান করতে পারতেন, বেথুন সোসাইটিতে তা পারতেন না। তার প্রধান কারণ বেথুন সোসাইটিতে ইংরেজদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সভার কাজকর্ম পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। তার শৃঙ্খলা ও সংযত পরিবেশ বাঙালীদের কাছে খুব আকর্ষণের বিষয় ছিল না। তাই বেথুন সোসাইটির খাঁটি বাঙালী সংস্করণ হয়েছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভা। একটু ঢিলেঢালা ঘরোয়া মজলিসি পরিবেশ না হলে বাঙালীদের বিদ্বৎসভা বা সাহিত্যসভা জমতে চায় না। সেই পরিবেশটি সিংহ মহাশয় তাঁর সভায় সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আর্থিক সামর্থ্যও ছিল এবং প্রধানত তাঁর পোষকতাতেই সভা চলত। পরিবেশটা পুরো সামন্ততান্ত্রিক।

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি নানাবিষয়ে সভায় আলোচনা হত। ইংরেজি ও বাংলা, দুই ভাষাতেই আলোচনা হত, কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। সভার পক্ষ থেকে মধ্যে মধ্যে কৃতী সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পাদ্রি লঙ সাহেবকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা এই সময় সংবর্ধনা জানান। সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য সভার তরফ থেকে দু-তিনশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হত। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে সভার একটি মুখপত্রও কিছুদিনের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। সভায় মধ্যে মধ্যে সংগীতের আসর বসত, নাটকেরও অভিনয় হত। 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' নামে, সভার অঙ্গ হিসেবে, ১৮৫৬ সালে একটি পৃথক্ রঙ্গালয়ও সিংহ মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা রঙ্গালয়ে ও বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রচলনে এই রঙ্গমঞ্চের বিশেষ দান আছে।

ধনীব্যক্তির গৃহে সভা হত, তার সঙ্গে সংগীত ও নাটকাভিনয়ও হত, এবং মধ্যে মধ্যে ভোজনাদিরও ব্যবস্থা হত। সভা তখনকার বাঙালী সুধীজনদের সমাগমে বেশ জমে উঠত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই সভায় মধ্যে মধ্যে যেতেন। বড়লোকের বাড়ির এরকম মজলিসি সভাকে অনেকে 'বিদ্যোৎসাহিনী' না বলে 'মদ্যোৎসাহিনী' সভা বলতেন। কিন্তু

বিদ্যোৎসাহিনী সভা যে মজলিসি আড্ডার মধ্যেও বাইরের সমাজ-জীবনের ধারার সঙ্গে কিঞ্চিৎ যোগ রেখে চলত, তারও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাংলার সমাজ-জীবনে তখন একদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ণধার। তাঁর সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বিদ্বৎসভার উপরেও পড়েছে। বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কেউ সামাজিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেনি। বিদ্যোৎসাহিনী সভা নানাভাবে এই আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় এই সভার সভ্যরা অগ্রণী হয়ে কৌন্সিলে দরখাস্ত পাঠান। বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার পরে, কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, বিধবাবিবাহ করতে যাঁরা ইচ্ছুক হবেন, তাঁদের প্রত্যেককে সভ্যর পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য কোনো বিদ্বৎসভার পক্ষে এই ধরনের পুরস্কারাদি দিয়ে উৎসাহিত করা, যথেষ্ট আর্থিক পোষকতা ভিন্ন সম্ভব নয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভার সেই পোষকতার অভাব ছিল না। না থাকলেও, এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তখনকার সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে এ রকম অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা এই ধরনের সভার পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন এবং সেই সভার মারফত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের জন্য কিছু কাজ করতে পারতেন। তা না করে, অধিকাংশ বাঙালী ধনীরা তখন অর্থের অপব্যয় করেছেন নানাভাবে।

সুহৃদ সমিতি

'সুহৃদ্ সমিতির' নামের আগে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী' কথাটি আছে। প্রধানত সমাজসংস্কারের প্রয়োজনবোধ থেকেই এই সমিতি স্থাপিত হয়। সুতরাং 'সুহৃদ্ সমিতিকে' ঠিক বিদ্বৎসভা বলা যায় কিনা তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে তা বলা যায় না। ১৮৫৪ সালে ১৫ ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের দমদম রোডস্থ বাসভবনে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে যে সভা ডাকা হয়, তাতে কিশোরীচাঁদ তাঁর ভাষণে, সমাজসংস্কারের আবশ্যকতার কথা খুব জোর দিয়ে বলেন। তিনি এমন কথাও বলেন যে, কেবল প্রবন্ধ রচনা করে এবং বক্তৃতা দিয়ে কাজ হবে না। প্রাচীন ও নবীন বাঙালী সকলে মিলেমিশে একযোগে সমাজের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করতে হবে।

সভায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং যাদবচন্দ্র মিত্র সমর্থন

করেন যে, সমিতির সভ্যরা প্রত্যেকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং নিজেরা এমন কোনো কাজ করবেন না যা যুক্তি সত্য সুনীতি ও উদারতার বিরোধী। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন যে, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা-পুনর্বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহবর্জন ও বহুবিবাহনিরোধের ব্যাপারে সমিতির সভ্যরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাহায্য করবেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র সমর্থন করেন যে, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের বিধিগত বাধা দূর করবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হক এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য নগরের উপকণ্ঠে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা হক।[৩৭]

এই সকল প্রস্তাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, সুহৃদ্ সমিতি প্রধানত সামাজিক সভা রূপেই স্থাপিত হয়েছিল, বিদ্বৎসভা রূপে নয়। কোনো বিষয় নিয়ে বিদ্বৎসভার মতো আলোচনা বা প্রবন্ধ পাঠ করা যে সুহৃদ সমিতিতে হত না তা নয়, কিন্তু সামাজিক সুনীতি ও সত্যাচরণের আদর্শ প্রচার করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। এক কথায় বলা যায়, বিদ্যাসাগরযুগের বিদ্বৎসভার সঙ্গে সামাজিক সভার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। নতুন জ্ঞানবিদ্যার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের অনুভূতি তখন প্রায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ।

ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব

সাধারণত মেডিক্যাল কলেজের লেকচার থিয়েটারে বেথুন সোসাইটির অধিবেশন হত এবং তার পরিবেশ ছিল পাশ্চাত্ত্য সভার মতো নীতিদুরস্ত। ডক্টর মুয়াট থেকে রেভারেণ্ড ডাফ পর্যন্ত যাঁরা সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন, তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। ঠিক ঘরোয়া বৈঠকের অন্তরঙ্গতা সোসাইটির অধিবেশনে স্বভাবতই দুর্লভ ছিল। এই অভাব পূরণের জন্য সোসাইটির সভ্যরা অন্যান্য আরও অনেক সভা স্থাপন করেছেন, যেখানে আরও বেশি অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন এই সময় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপন করেছিলেন, তেমনি প্রধানত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে ১৮৫৭ সালের মে মাসে 'ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব' স্থাপিত হয়েছিল। বেথুন সোসাইটি থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁরা এই সভা স্থাপনের আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন, তা তার নাম দেখেই বোঝা যায়। 'ফ্যামিলি' ও 'ক্লাব'

এই কথা দুটির মধ্যেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যে-কোনো বিদ্যোৎসাহী এই ক্লাবের সভ্য হতে পারতেন এবং শহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বাড়িতে চক্রাকারে ক্লাবের বৈঠক বসত। আলোচনার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব একই ছিল। যেসব বিষয়ে নিয়ে বেথুন সোসাইটিতে আলোচনা হত, ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবেও প্রায় সেই সব বিষয় নিয়ে বৈঠক বসত। রীতিমতো বিতর্কও হত। ক্লাবে ইংরেজরাও যোগ দিতেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেভারেণ্ড ডল, রেভারেণ্ড মুলেন্‌স, ব্যারিস্টার উড প্রমুখ বিদ্যোৎসাহীরা এই ক্লাবের অনুরাগী সভ্য ছিলেন। কেবল পরিবেশের পার্থক্য ছাড়া বেথুন সোসাইটির সঙ্গে লিটারারি ক্লাবের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না।[৪০]

চৈতন্য লাইব্রেরি

(নাম 'লাইব্রেরি' হলেও 'চৈতন্য লাইব্রেরি' কলকাতার একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাতা হলেন আহিরীটোলার সুবর্ণবণিক পরিবারের গৌরহরি সেন। গৌরহরি, কলকাতার সম্ভ্রান্তশালী সুবর্ণবণিক পরিবারের আরও অনেকের মতো, বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, তিনি নিজে সাহিত্যচর্চাও করতেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮৩ নং বিডন স্ট্রিটে গঙ্গানারায়ণ দত্ত প্রদত্ত একখানি ঘরে চৈতন্য লাইব্রেরি প্রথম স্থাপিত হয়। এই বছরেই মার্চ মাসে সাহিত্যসভা খোলা হয়। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেব মহাশয়ের উদ্‌যোগে, ১৮৬০ সালের ২১ নং আইন অনুসারে লাইব্রেরি রেজিস্ট্রি করা হয়। 'বাংলায় ইহাই প্রথম রেজিস্ট্রিযুক্ত লাইব্রেরি' (চৈতন্য লাইব্রেরির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৪)।

লাইব্রেরির আলোচনা-সভায় যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম বর্ষের সভার বিবরণ থেকে :

বিষয় :	বক্তা :
ডি. জি. রসেটি	নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
মুসলিম ভারত	হবিবর রহমন
দিল্লী ও আগ্রা	রেভারেণ্ড এ. টমরী
কবিতা	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা	নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ দত্ত
জর্জ ওয়াশিংটন	কুঞ্জবিহারী দত্ত
আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব	সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বছরে লাইব্রেরির কার্যনির্বাহক-সমিতিকে আশুতোষ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। চৈতন্য লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা বিকাশ সম্বন্ধে গৌরহরি সেন তাঁর 'চৈতন্য লাইব্রেরি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' পুস্তিকায় লিখেছেন :

> পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর খুব নামডাক ছিল। কেশব একাডেমির ছাত্র ৺গুরুচরণ চৌধুরী ও তাঁহার দাদা ৺তীর্থনাথ ঐ লাইব্রেরীর প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল ঐ লাইব্রেরী বাগবাজার লাইব্রেরীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর রিপোর্ট পড়িয়া এবং গুরুচরণের সহিত মেলামেশা করিয়া আমার লাইব্রেরীর নেশা ধরে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর সভ্য ছিলাম। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ৺কুঞ্জবিহারী দত্তকে ঐ লাইব্রেরীতে ভর্তি করাই। কুঞ্জর তখন গাড়িঘোড়া ছিল না। বর্ষাকালে কম্বুলিটোলা যাইতে কষ্ট হওয়াতে, তাহার বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী করিতে সাধ হয়। কুঞ্জর দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺নিতাইচাঁদ খুব উৎসাহী ছিল। আমাদের কথাবার্তা শুনিয়া, তাহারও লাইব্রেরীর সম্বন্ধে বাতিক জন্মে। দুই একদিনের মধ্যে নিতাই-এর গৃহ-শিক্ষক ৺হরলাল শেঠ ও আমাদের প্রতিবেশী ৺রঙ্গলাল বসাক আমাদের দলভুক্ত হইলেন।···
>
> নিতাই তাহার দাদার, মাষ্টারের, রঙ্গর ও আমার খানকতক বই লইয়া একটা আলমারিতে পুরিল। প্রথম মাসে দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকায় খানকতক বাংলা পুস্তক কেনা হইল। একদিন ভূপেন (এখন বাবুডাঙ্গা নিবাসী) আসিলে, তাহার নিকট খান ছয়-সাত বই পাওয়া গেল। কিন্তু দুই মাসের চেষ্টায় কিছুতেই একটা আলমারি ভরিল না। কুঞ্জর শ্বশুর মহাশয় প্রত্যহ 'Indian Mirror' পাঠাইয়া দিতেন। প্রতি সপ্তাহে 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' কেনা হইত।
>
> পাদরি টমরি সাহেব তখন বিডন ষ্ট্রীটের ৩২/৬ নং বাটিতে থাকিতেন। তাঁহাকে একদিন পাকড়াও করিয়া আনিলাম। তিনি পৌনে এক আলমারি পুস্তক, তিনখানি কাগজ ও আধ ডজনের কম সভ্য দেখিয়া খুব হাসিলেন।···
>
> আমি নাম দিয়াছিলাম Beadon Square Literary Club। দত্ত মহাশয় বলিলেন,—'অ্যাঁ, ঠাকুরদের নাম দাওনি'। অনেক তর্কাতর্কির পর

Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club এই নাম স্থির হইল। আমরা ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারী সাইন বোর্ড লাগাইব স্থির করিয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, দিনটা খারাপ ; সুতরাং সরস্বতী পূজা (৫ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত দিন পিছাইতে হইল। চৈতন্ম নাম শুনিয়া কেহ কেহ টিকি লাইব্রেরী বলিয়া ঠাট্টা করিত। ছেলেদের কাণ্ড বলিয়া পাড়ার বয়স্ক লোকরা প্রথম প্রথম আমল দিতেন না। একদিন রাত তিনটায় উঠিয়া, নিতাই, রঙ্গ ও আমি বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও কলেজ ষ্ট্রীটের দুই ধার লাইব্রেরীর Prospectus মারিয়া দিলাম।

দশ টাকায় স্থায়ী সভ্য এবং দুই আনা চাঁদায় সাধারণ সভ্য জোগাড় করিতেও প্রথম প্রথম বেগ পাইতে হইত। বুঝিলাম একটু হৈ চৈ না করিলে চলিবে না। ব্যারিষ্টার এ. চৌধুরী মহাশয় (এখন সার আশুতোষ চৌধুরী) তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণে থাকিতেন। তাঁহার কাছে যাওয়া আসা করিয়া, ১৮৯০ সালের প্রারম্ভে লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের জন্ম, 'Literature and the Calcutta University' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আদায় করিলাম। আমার সধ্যায়ী পাথুরে ঘাটার ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবকে সভাপতি জোগাড় করিল। কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে চৌধুরী সাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা বাহির হইল। চৈতন্ম লাইব্রেরীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

১৮৯১ সালে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ব্যয়ে লাইব্রেরী রেজিস্টারি করা হয়।···

গত উনিশ বৎসরে লাইব্রেরীর সর্ব্ব-প্রধান মুরুব্বি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি। ইঁহাদের নিকট প্রায় নয় হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ৩নং ওয়ার্ডের কমিশনার ৺কালীচরণ পালিত মহাশয় আমাকে Municipal Grant সম্বন্ধে প্রথম সন্ধান দেন।

চৌত্রিশ বৎসর লাইব্রেরী চালাইয়া যথেষ্ট আনন্দ ও হাড়ে হাড়ে আক্কেল পাইয়াছি। ভারত গভর্নমেণ্টের ল মেম্বর, মিলিটারী মেম্বর, হোম মেম্বর, ফিন্সান্স মেম্বর এবং বঙ্গদেশের গভর্ণর, লেফটেন্সাণ্ট গভর্ণর, চিফ জাষ্টিস প্রমুখ উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ

সাহিত্যিক দিক্‌পাল; সার রাজেন্দ্রনাথ, সার কৈলাস, সার দেবপ্রসাদ, সার আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ দেশের জননায়কগণ, সকলেই আমার আহ্বানে চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে সভাপতি বা বক্তা হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। চৌত্রিশ বৎসরে যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে—পুস্তকের তালিকা, বাৎসরিক বিবরণী, সভার চিঠি, নিয়মাবলী—সমস্তই আমার লেখা। এই সকল কার্য্যে শ্রম আছে, দায়িত্ব আছে, আনন্দও আছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছে হাঁটাহাঁটি করিয়া গ্রাণ্টকে বাৎসরিক আড়াই শত হইতে ক্রমে ক্রমে সাড়ে-ছয় শত টাকায় তুলিয়া মনটা বেশ প্রফুল্ল হইত।

১৯১২ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে হাড়ে হাড়ে আক্কেল পাইয়াছিলাম। যে সকল কারণে কম্বুলিটোলা লাইব্রেরী, সাবিত্রী লাইব্রেরী, ক্যালকাটা রিডিং রুমস, সিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরী, মিনার্ভা লাইব্রেরী প্রভৃতি পাঠাগারগুলি লোপ পাইয়াছে, চৈতন্য লাইব্রেরীতে ঐ চার বৎসরে তাহার সব চিহ্ন দেখা দিয়াছিল। লাইব্রেরীয়ান পুস্তক ক্রয়, তালিকা প্রস্তুত, পুস্তক আদান-প্রদানের হিসাব সব বিষয়েই উদাসীন, ট্রেজারার তিন মাসে এক দিনও আসিয়া জমা-খরচের সন্ধান লইতেন না, সেক্রেটারীকে চিঠিপত্র লিখিতে বা সভা-সমিতি করিতে বলিলে তাঁহার চক্ষু আকাশে উঠিত! পাছে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গে তাহা চাপা দিবার জন্য আমাকে তখন চার গুণ খাটিতে হইত। বেহারা না আসিলে ঝাঁট দিতে ও আলো জ্বালিতে হইত। চার বৎসর পরে এই ভাষায় বন্ধুদের নিকট ধন্যবাদ পাইয়াছিলাম,—'ওর আফিস নেই, দোকান নেই, পরিবার নেই, ছেলে-মেয়ে নেই, ও খাটবে না ত কি? ওর ভাত হজম হবে কি করে।'

চৈতন্য লাইব্রেরির ক্রমিক অবনতি সম্বন্ধে গৌবহরি যা লিখেছেন, তা বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাঙালী মধ্যবিত্তের, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের, চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দল-পাকিয়ে দলাদলি করা এবং দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠানের অধোগতির পথ সুগম করা। বাংলার স্যাঁতসেঁতে মাটিতে সবকিছুই যেমন পচে যায়, তেমনি সমস্ত উদ্যমও ব্যর্থ হয়। যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সর্বত্রই এই একই অধোগতির ইতিহাস। প্রথম পর্বে গেঁজিয়া-ওঠা উচ্ছ্বাস, দ্বিতীয় পর্বে কিঞ্চিৎ থিতোনো, তৃতীয় পর্বে পতন।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১২৬৪ সনে) প্রসাদদাস মল্লিক জোড়াসাঁকোর একজন শিক্ষিত সুবর্ণবণিক বন্ধুর সহযোগে 'বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বন্ধুর নাম গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের বাঙালি পাড়ার রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের অধিবাসী ছিলেন তিনি। এই সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক ছিলেন প্রসাদদাস এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন গোষ্ঠবিহারী। দেশের শিক্ষিত সুধী সমাজে এই বিদ্বৎসভার বেশ ব্যাপক প্রভাব ছিল। সভার বাৎসরিক অধিবেশন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত এবং প্রায় চার-পাঁচশো লোকের সমাগম হত। মাসিক অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করা হত। নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্ম পুরস্কারও দেওয়া হত এবং প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছেপে পাঠকদের বিতরণ করারও ব্যবস্থা ছিল।

এই সাহিত্য-সমাজ থেকে মধ্যে-মধ্যে বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের অভিনন্দিত করারও প্রথা ছিল। ১৮৭২ সালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-মিশনারী রেভারেণ্ড জেম্স্ লং সাহেবকে বিলাত যাত্রাকালে এই সভা থেকে একটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ন-বছর লং সাহেব এই সাহিত্য-সমাজের সভাপতি ছিলেন। লং সাহেবকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র এবং তাঁর উত্তর উদ্ধৃত করা হল :*

লং সাহেবকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র

To the Rev. James Long.

Rev. and Dear Sir,

We, the members of the Family Literary Club desire to convey to you this humble expression of our heartfelt sorrow at the prospect of your departure from India, and of the deep sense of obligation which our countrymen in general and this Society in particular entertain for the benefits your philanthropic labours have conferred upon them.

---

* The Fifteenth Anniversary Report of the Family Literary Club pp. 27-29.

You will remember that in the year 1859, when our Society was yet in its infancy, you kindly accepted the office of our President. We thankfully cherish the recollection of the zeal, earnestness, and assiduity, with which you promoted its welfare and advancement. You worked with us Sir, in the stong consciousness and hope that it might, in the Providence of God, materially help the cause of native enlightenment. Although your departure for Europe in 1863 necessitated a temporary severance of our connection with you, we have always had signal proofs of the deep interest you take in our efforts to repair the breach which separates the European and native by bringing them together in social and intellectual fellowship. The ready condescension with which you have always come forward to direct our faltering steps and strengthen us with your words of encouragement has commanded our heartfelt gratitude.

It is difficult, Sir, to estimate the amount of good you have conferred on this country by lending your powerful aid towards the improvement of our vernacular literature. Your intimate knowledge of the Bengali language, your lifelong labours to raise its status, your admirable and exhaustive collection of proverbs spoken by the ryots and women of Bengal, embodying their wisdom and practical good sense, have brought before the European world a knowledge of our inner life which the most elaborate work on India would fail to convey. We humbly prey to the Divine Disposer of Events to raise up men like yourself to continue the work of native enlightenment after your simple and unostentatious fashion···

We remember the days of agitation when the wrongs

inflicted on the dumb ryots by the Indigo planters roused your benevolent heart and led you, at immense personal sacrifice, to wield your powerful pen against the oppressor; and whatever may have been the judgment of a frail earthly tribunal on a matter, we firmly believe that, in addition to the blessings of thousands that were ready to perish the consciousness of having perfomed a duty and a strong faith that your conduct was approved before the throne of the Eternal, proved a most powerful solace in your numerous earthly tribulations.

And now, Sir, we bid you a hearty farewell let us hope only for a time. May the Almighty Father of us all restore your health and strength to enable you to return to our shores and to promote the welfare of our countrymen, to which you have devoted the best years of your life.

We remain
Rev. and Dear Sir,
Your most obedient servants
Prosad Doss Mullick, Aushoo Toss Dhur,
Hurry Mohun Chatterje, Gosto Behary Mullick,
Behary Lall Dhur, Govinchand Addy,
Bollai Chand Mullick, Brojo Lall Dutt,
and Serveral others.
Calcutta, March 20, 1871.

অভিনন্দনপত্রের উত্তরে লং সাহেব বলেন :

To

Baboo Prosad Doss Mullick,

Honorary Secretary, Family Literary Club.

My dear Prosad Baboo,

I regret that press of engagement (at leave for Bombay

to-morrow) prevents my replying more at large to your address, which interested me very much, showing that there are men among the educated classes who sympathise with my humble efforts to do something to raise the masses of their countrymen through the potent agencies of vernacular education and security of tenure to the ryot.

Your Society has been always peculiary interesting to me as you conducted the proceedings in the native language as well as the language of the foreigners. The Bengali language is now attaining the strength of a giant in its capabilities of expressing all ideas which it can do by its connection with the Sanscrit.

Social questions, and not mere literary ones, have also come in for their due share in your attention. You have here a boundless field before you in the Bengali people, who well deserve a study.

The position of your Society in Burrabazar has often reminded me, in threading of the adage, 'One-half the world does not know the other lives.' The Burra-bazar and Mugul part of Calcutta are quite a *terra incognita* to the other part, and I hope your Society will pursue its inquiries into the curious social life of the Marwaris, Jews, and Muguls, that inhabit the far-famed Burra-bazar.

I am delighted at receiving an address from some of you in that expressive language both musical in its tone and expressive in its ideas.

A change is coming over Bengal : The Bengali language is happily dropping the old Sanscrit style, and assuming a nervous idiomatic form. I trust my Bengali friends are

learning to be not merely *kotah* but also *kurmo* men, men of deeds and not mere words.

If my health allow, it will afford me much pleasure to return to this country, but time carries us away. May we all, as we are approaching another world, feel that our relations to God are of superior importance—that the concern of a future state ought to be our chief care.

Yours sincerly,

J. Long.

রেভারেণ্ড লং সাহেবের উত্তরের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত কলকাতার 'বড়বাজার' অঞ্চলের সমীক্ষার কথা তিনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, বড়বাজার অঞ্চল নিয়ে এই ধরনের সমীক্ষা আজ পর্যন্ত (১৯৭৮) হয়নি।

আলোচনা-সভায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য

বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সুহৃদ্ সমিতি, ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব প্রভৃতি বিদ্বৎসভায় আলোচ্য বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ছিল। কোনো বিষয় সম্বন্ধে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা বেথুন সোসাইটিতে প্রথমদিকে নিষিদ্ধ ছিল বলে, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টান সভ্যরা সকলেই খানিকটা অসুবিধা বোধ করতেন মনে হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি বর্জিত হওয়ার জন্য, সামাজিক সাহিত্যিক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েই বেথুন সোসাইটিতে আলোচনা হত বেশি। সোসাইটির 'ট্র্যানজ্যাকশন্‌সে' প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়ের তালিকা থেকেই তা বোঝা যায়। ১৮৫২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৮৫৯ সালের মে মাসের মধ্যে যে সব বিষয় পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটির তালিকা দিচ্ছি:

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
সংস্কৃত কাব্য	রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা কাব্য	হরচন্দ্র দত্ত
ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক	কৈলাসচন্দ্র বসু
বাংলার শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা	প্যারীচরণ সরকার

বাংলার কৃষির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ	রামশঙ্কর সেন
বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ	এইচ উড্রো
কলেজীয় শিক্ষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্থান	প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী
কৃষ্ণনগরে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের চরিত্র ও সামাজিক জীবন	উমেশচন্দ্র দত্ত
বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সমস্যা	জগদীশনাথ রায়
বাঙালী সমাজ ও জীবন	হরচন্দ্র দত্ত
সংগীত প্রসঙ্গে	কিরপ্যাট্রিক
বাংলার নারীসমাজ	কৈলাসচন্দ্র বসু
বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা	রেভারেণ্ড লালবিহারী দে
বাংলার হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহসমস্যা	তারকনাথ দত্ত

সভায় পঠিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রাধান্য ছিল বেথুন সোসাইটিতে এবং অধিকাংশ আলোচনাই বাংলা দেশের সমস্যা নিয়ে করা হত। কাব্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তত্ত্বপ্রধান আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিষয়বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটাই বড় হয়ে ফুটে ওঠে। বাংলার সমাজ-জীবনে, বিদ্যাসাগরযুগে, সমাজ ও শিক্ষার সমস্যাই ছিল প্রধান। তখনকার বিদ্বৎসভায় এই সমস্যাগুলিই তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনের সঙ্গে তখন বাঙালী বিদ্বৎসমাজের কতটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁরা তাদের সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে কত সচেতন ছিলেন, বিদ্বৎসভার এই ইতিহাস থেকে তা সঠিক বোঝা না গেলেও, খানিকটা অনুমান করা যায়।

বেথুন সোসাইটিতে ধর্মালোচনার স্বাধীনতা না থাকার জন্য, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টান সভ্যরা, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেও, আরও নতুন ছোট ছোট বিদ্বৎ-সভা গড়ে তোলেন। তার মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব অন্যতম। অন্য দিকে তত্ত্ববোধিনী সভা তো ছিলই। এই সব সভায় ধর্মের কোনো গোঁড়ামি ছিল না, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অবাধ আলোচনা হত। তা হলেও এই সব সভার বৈঠকেও প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে দেশের সামাজিক সমস্যা। ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা বহুবিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও সুহৃদ্ সমিতি তো প্রত্যক্ষভাবেই সমাজসংস্কার আন্দোলনে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা

বিদ্যাসাগর-যুগের বিদ্বৎসভার এই সামাজিক চেতনার ভিতর থেকেই বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠার আভাস পাওয়া যায়। বেথুন সোসাইটিতেই যে একটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছিল, সে কথা আগে বলেছি। রেভারেণ্ড লঙ সাহেব সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সম্বন্ধে বাংলার বিদ্বৎজনদের অনুপ্রাণিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে যখন 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো লঙ সাহেব তার একজন অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

মেরি কার্পেণ্টার এদেশে এসে একটি স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। স্থানীয় বিদেশী ও এদেশী সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনাও করেন। ১৮৬৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সভা হয়। তাতে কুমারী কার্পেণ্টার ব্রিটেনের 'National Association for the Promotion of Social Science in Great Britain'-এর শাখাপ্রতিষ্ঠানরূপে বাংলা দেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি বিবেচনা করে সভা সম্বন্ধে প্রাথমিক খসড়া-পরিকল্পনা রচনা করবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেণ্ড লঙ, জাস্টিস্ নর্মান, জাস্টিস্ ফিয়ার, জাস্টিস্ সীটনকার, ই. সি. বেইলি, আর্থার গ্রোট, অ্যাটকিন্সন, ফার্গুসন, ম্যাকেন্জি, ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জি, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কমিটি ব্রিটেনের সমাজবিজ্ঞান সভার শাখা হিসেবে এদেশে কোনো সভা স্থাপন করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং Bengal Social Science Association নামে একটি স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৮৬৭ সালের ২২ জানুয়ারি মেট্‌কাফ হলের সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রস্পেক্টস-এ বলা হয়:

> The object of the Association is to promote the development of social progress in the Presidency of Bengal, by uniting Europeans and Natives of all classes, in the collection, arrangement and classification of facts, bearing on the social, intellectual and moral condition of the people.

সভার কাজ চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়: ১. আইন ২. শিক্ষা ৩. স্বাস্থ্য ৪, অর্থনীতি ও বাণিজ্য। প্রত্যেক বিভাগে কি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে তাই নিয়ে সিলেবাসের মতো একটি করে 'সার্কুলার' তৈরি করে সভ্যদের বিতরণ করা হয়। এই বিভাগীয় সার্কুলারগুলি থেকে অনুসন্ধানযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি:

আইন-বিভাগ

ট্রাস্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমান হিন্দু ও মুসলমান আইন পর্যালোচনা করা, তার ফলাফল বিচার করা এবং তা কাম্য কি বিবেচনা করা।

'বেনামী' রীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

পঞ্চায়েত প্রথা, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব। বিবাদ-নিষ্পত্তির ব্যাপারে তার আবশ্যকতা কি?

বিচারালয়ে উৎকোচ গ্রহণের দুর্নীতির অনুসন্ধান—তার কারণ কি? প্রভাব কতদূর? দুর্নীতি দমনের পন্থা কি?

অপরাধ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা—অপরাধ কারা করে, অপরাধীরা কোনো বিশেষ জাতির লোক কি না? তা যদি হয়, তাহলে সেই জাতির স্বভাব, অভ্যাস, আর্থিক অবস্থা কি রকম? কি কারণে অপরাধ করে তারা? তার জন্য দারিদ্র্য কতটা দায়ী? মাদক-নেশা ইত্যাদি কুঅভ্যাসই বা কতটা দায়ী?

আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান—আইন করে আত্মহত্যা বন্ধ করা সম্ভব কি না?

শিক্ষা-বিভাগ

গত অর্ধশতাব্দীতে বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে শিক্ষার ফলাফল কি?

নিম্নবঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না হবার কারণ কি?

প্রত্যেক জেলার শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা—কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কতটা শিক্ষার বিস্তার হয়েছে? কৃষকদের মধ্যে, কারিগরদের মধ্যে, ভৃত্যদের মধ্যে?

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব কি না—হলে কতটা সম্ভব হতে পারে?

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার—হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতদূর হয়েছে? বিস্তারের পথে বাধা কি? বাধা দূর করার উপায় কি?

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য এক-একটি বিষয়ে কর্মীদের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করে দেওয়া হত। 'স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে এই ধরনের একটি প্রশ্নমালার পরিচয় দিচ্ছি:

১. জেলায় ক'টি বিদ্যালয় আছে বালিকাদের জন্য? শুধু বালিকাদের জন্য, না বালক-বালিকা উভয়েরই জন্য?
২. ছাত্রীসংখ্যা কত? দৈনিক ক'জন ক'রে গড়ে উপস্থিত থাকে?
৩. বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে জাতিগত বাধা আছে কিনা?
৪. ক'বছর বয়সে সাধারণত বালিকাদের স্কুলে ভর্তি করানো হয়, এবং কত বছর বয়সে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়?
৫. স্কুল ছাড়ার প্রধান কারণ কি?
৬. স্কুলের পাঠ্য কি?
৭. বিধবা, না বিবাহিতা স্ত্রীলোক, শিক্ষকতার পক্ষে কাদের ভালো মনে হয়?
৮. হিন্দুদের পারিবারিক জীবনের গড়ন স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় কি না? তরুণ স্বামীরা তাঁদের নববিবাহিতা তরুণী স্ত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেন কি না—করলে, কতটা করেন? ইত্যাদি।

বিভাগীয় বিষয়ের সার্কুলার এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নমালা দেখলে বোঝা যায়, যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হত। বাংলার বিদ্বৎসমাজের মধ্যে শুধু সমাজবোধ জাগানো নয়, সামাজিক জীবন ও তার সমস্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির বিকাশেও বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার বিশেষ দান আছে।[৪১]

রামমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিদ্বৎসভার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে ধীরে ধীরে সেগুলি লোপ পেতে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল—আলোচনার স্বাধীনতা, মতামতের উদারতা, পারস্পরিক

মিলন ও ভাববিনিময়, সমাজচেতনা, বিদ্বৎসমাজের সামাজিক দায়িত্ববোধ, নবীন বিদ্যোৎসাহীদের প্রেরণাদান ইত্যাদি। যদিও বাঙালী হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টানদের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে তখন মতবিরোধ যথেষ্ট তীব্র ছিল, নবীন ও প্রাচীনদের মধ্যে পথের ব্যবধানও ছিল বিস্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্বৎসভার আসরে সকলের মিলনের পথে তেমন অনতিক্রম্য কোনো অন্তরায় ছিল না। আজকের রাজনৈতিক সংঘাতের তীব্রতার যুগে যে দুর্লঙ্ঘ্যপ্রায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন সে-বাধার সৃষ্টি হয়নি। সাধারণভাবে আজ প্রায় সকল শ্রেণীর সভা-সমিতির চরিত্রই বদলে গেছে। রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব সর্বত্র সমান স্পষ্ট না হলেও, তা থেকে একেবারে মুক্ত থাকা সম্ভব কি না সন্দেহ। বিদ্বৎসভার ক্ষেত্রেও এই প্রভাব অল্পবিস্তর দেখা যায়। রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও, সামাজিক অর্থ নৈতিক জীবনের সমস্যাও আজ আগেকার তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাব-বিনিময়ের স্বাভাবিক সামাজিক ইচ্ছা-বাসনা পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হয়। মানবোচিত সাধারণ উদারতাবোধটুকুও যেন আমরা হারিয়ে ফেলছি। এ হল ধনতান্ত্রিক যুগের অব্যর্থ অভিশাপ। বেশ বোঝা যায় যে আজ এই পরিবেশে, বিদ্বৎসভার মুক্ত অঙ্গনে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, বিদ্বৎজনদের পক্ষে উনিশ-শতকী কায়দায় মিলিত হওয়া খুবই কঠিন। তাই সেকালের মতো কোনো বিদ্বৎসভা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করা আজ আর সম্ভব নয়। কিন্তু একালের উপযোগী কোনো বিদ্বৎসভা আজও গড়ে উঠেছে বলে, অথবা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ মানুষের জীবনের সামনে আজ এত জিজ্ঞাসা, এত সমস্যা এসে ভিড় করেছে যে বিদ্বৎজনদের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে তার উত্তর বা সমাধানের নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়। বিদ্বৎজনদের ঐতিহাসিক ভূমিকারই আজ বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়ে গিয়েছে। যে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানবতন্ত্র ও যুক্তিবাদের বাতি জ্বালিয়ে মানুষ মধ্যযুগের অন্ধকার গহ্বর থেকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের তথাকথিত আলোকরাজ্যে প্রবেশ করেছিল, সেই যুগ এবং ধনতন্ত্রের সেই চেহারাও আজ নেই। আজ তাই উনিশ শতকের বিদ্বৎসমাজ বিদ্বৎসভা কোনোটারই পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবা যায় না।

১৩৬২ সন

১। Robert H. Lowie: *Primitive Society* (London 1949) অধ্যায় ১০—১১

২। *Encyclopaedia* of *Social Sciences* (1951), vol. 6, 'Family'.

৩। A. F. Pollard : *Factors in Modern History* (London, 1932) অধ্যায় ৩

৪। Encyclo. Soc. Sc. Vol. 9, 'Learned Societies'.

৫। A. V. Martin : *Sociology of The Renaissance* (*London, 1945*) ২৭—৪৬

৬। পোলার্ডের পূর্বোক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়।

৭। (পৃষ্ঠা ৫৯-এর ইংরেজী উদ্ধৃতি) *Johnson's England* ; An Account of the Life and Manners of his Age ; ed. by, A. S. Turberville (Oxford, 1933) ; vol. 1, ২১০—১১

৮। G. M. Trevelyan, *English Social History* (London, 1948) , ২৯০—৩২৮

৯। Thomson : *Stranger in India.* etc. (London 1843) ৬৭—৬৮

১০। Trevelyan, পূর্বোক্ত গ্রন্থ : ঐ

১১। Centenary Review of Asiatic Society of Bengal, 1784-1883, pt. I.

১২। Karl Mannheim : *Man and Society* (London, 1940) ৮৪ পাদটীকা

১৩। সমাচার দর্পণ ৮ মার্চ ১৮২৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, ৯-১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৪। Martin : *Sociology of the Renaissance*, ৩৯—৪০

১৫। Rev. Lal Behari Dey : *Recollections of Alexander Duff* (London, 1879), ১৮

১৬। Thomas Edwards : *Henry Derozio* (Calcutta, 1884), ১—৯

১৭। লাল বিহারী দে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৯

১৮। ঐ, অধ্যায় ৩

১৯। *Bengal Past and Present*, vols. 36 (Part II), 37 (Parts I & II), Rev. Krishna Mohan Banerjee, by Harihar Das.

২০। Amrita Lal Basu, *Speeches of Babu Ram Gopal Ghose*, with a Biographical Sketch (Calcutta, 1885), p. VII.

২১। *Encyclopaedia of Social Sciences* (1951), vol. 6, 'Free-thinkers' by Robert Eisler. এ ছাড়া J. B. Bury লিখিত *A History of Freedom of Thought* (London, 1913) দ্রষ্টব্য।

২২। Rev. A. Duff : *India and India Missions* (Edin. 1879) p. 640.

২৩। Rev. L. B. Day : *Recollections of Alexander Duff* (Lond. 1879). অধ্যায় ৩

২৪। অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট।

২৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩২

২৬। *Bengal Hurkaru*, November 22, 1824.

২৭। অ্যালেকজাণ্ডার ডাফের পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টের বিবরণ থেকে গৃহীত।

২৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১২১-১২৯

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ সংকলন করা হয়েছে।

২৯। J. K. Majumdar : *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, ২৭১-৭৪

৩০। George W. Thomson : *The Stranger in India*, ১৫৩

৩১। *Bengal Hurkaru*, February 27, 1843.

৩২। 'সমাচার দর্পণ' থেকে 'সংবাদপত্রের সেকালের কথায়' ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

৩৩। *Bengal Hurkaru*, January 16, 1843.

৩৪। *Bengal Hurkaru*, February 13, 1843. "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের ১৮৪৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। দক্ষিণারঞ্জনের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ১৮৪৩ সালের ২ ও ৩ মার্চ।

৩৫। "তত্ত্ববোধিনী সভার" বিবরণ দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী", ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" (৩য় ভাগ), রাজনারায়ণ বসুর "আত্মচরিত", শিবনাথ শাস্ত্রীর *History of the Brahmo Samaj* (Vol. 1) প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩৬। Sivanath Sastri : *History of the Brahmo Samaj*, vol. I, (Calcutta, 1919), ৮৬—৮৮

৩৭। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ ফাল্গুন ১৭৬৭ শক।

৩৮। বেথুন সোসাইটির বিবরণ সোসাইটির ট্রানজাকশান্‌স ও রিপোর্টগুলি থেকে গৃহীত।

The Proceeding of the Bethune Society (1859-60, 1860-61) ; Calcutta 1862.

The Proceedings and Transactions of the Bethune Society (Nov. 10 1859—April 20, 1869) ; Calcutta, 1870.

৩৯। সুহৃদ্‌ সমিতির বিবরণ প্রাচীন পত্রিকাদি ছাড়া, মন্মথনাথ ঘোষের "কর্মবীর কিশোরীচাঁদ" গ্রন্থে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৯৯-১১১ পৃষ্ঠা) আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন জীবনচরিতেও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

৪০। 'ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব" সম্বন্ধে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী প্রসঙ্গে হরিহর দাস আলোচনা করেছেন—*Bengal Past and Present*, Vol. 38, Part 1 (July-September 1929)। ক্লাবের বাৎসরিক রিপোর্টও প্রকাশিত হতো।

৪১। *Transactions of the Bengal Social Science Association ; 1867-1872.*

পরিশিষ্ট

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রচারপত্র

COUNTRYMEN,—Though humiliating be the confession, yet we cannot, for a moment, deny the truth of the remark so often made by many able and intelligent Europeans, who are, by no means, inimical to the cause of native improvement, that in no one department of learning are our acquirements otherwise than extremely superficial. We need only examine ourselves in order to be convinced of the justice of the remark. After the ground-work of our mental improvement has been laid in the School, (and a school tuition seldom does more) we enter into the world and never think of building a solid superstructure. *The fate of our Debating Associations, most of which are now extinct, while not one is in a flourishing condition,* as well as the puerile character of the native productions that appear in the periodical publications, are lamentable proofs of this sad neglect. If a tree is to be known by its fruits, where, with but one or two solitary exceptions, are the fruits to which we can point with pride and satisfaction, as manifesting any degree of intellectual energy or extent of learning? We have ever sincerely regretted the want of an institution, which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindus, and of exciting an emulation for mental excellence. There is at present no occasion whereby we are ever called upon to congregate on an extensive scale for the purpose of mutual improvement, and whence we may receive an impetus for applying ourselves to useful studies. Is it then not desirable to unite in such a laudable pursuit, by which the bonds of fellowship may be strengthened, the acquisition of knowledge promoted, and the sphere of our usefulness extended?

With a view therefore to create in ourselves *a determined and well regulated love of study,* which will lead us to dive deeper than the mere surface learning, and enable us to

acquire a respectable knowledge on matters of general and *more especially, of local interest*, we have thought it expedient to invite you to meet, in order to consider the proposal of establishing an institution which, in our humble opinion, is eminently calculated not only to effect this great end but likely to promote mutual good feeling and union—an object of no less importance. We cannot, of course, within the limits of a circular, give a detailed account of the plan we propose to lay before you, but allow us to state the following brief outline.

Such members of the proposed Society, as may be willing, should undertake to deliver at its meetings, written or verbal discourses, on subjects suided to their respective tastes, at such times as may be previously fixed by them with a view to their convenience, and to the degree of research and attention which the subjects may require , and, *if they should fail without satisfactory reasons, to fulfil their pledges, they will be liable to pay a pecuniary fine.* The purpose of this circular is to call a general meeting, to consider the propriety of establishing the proposed institution, and to arrange the details.

It is at this general meeting, Gentlemen, that we most earnestly solicit your attendance. You must be well aware that the success of a public object, like the one we propose, must depend on the degree of cordial cooperation we may receive from the members of our community. We cannot believe that in such a cause, coldness will be manifested by any person that entertains the least regard for his own improvement, or breathes any love for his own country , and we flatter ourselves with the hope, that we shall meet with your hearty support in a proposal, which none can look upon with indifference, unless lost to all sense of duty, or sunk in apathy. Those who may, from circumstances, be unable to take an active share in our proceedings, can at least countenance the object by their presence, for which they may be assured of our thanks.

We have, through the kindness of Baboo Ramcomul Sen, Secretary to the Sanscrit College, obtained permission to use the Sanscrit College Hall for our meeting, where precisely at 7 o'clock P. M. on Monday, the 12th March next, we earnestly entreat and hope, that every one of you, Gentlemen, will have the godness to try your best to be present.

Calcutta, February 20, 1838.

TARINEY CHURN BANERJEE
RAMGOPAUL GHOSE
RAMTONOO LAHIRY
TARA CHAND CHUKERBUTTEE
RAJKRISHNA DAY

যন্ত্র গণতন্ত্র জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধির বেসাতি করে বেঁচে থাকা ক্রমেই বুদ্ধিমানদের সমাজে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমস্যাটা যে কত জটিল ও গভীর তা আজ আর বিদ্যার ব্যাপারীদের বুঝতে বাকি নেই। তবু বুদ্ধিমান সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষই যেহেতু নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সচেতন, তাই তার নিশ্ছিদ্র অহমিকার লৌহবর্ম ভেদ করে সহজে এই সমস্যা কোনো নূতন চৈতন্য সঞ্চার করতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাপারে মানুষের মতো এমন অঘোর অচৈতন্ত আত্মপ্রেমিক জীব আর কেউ নেই। তার কারণ, বুদ্ধি থাকলেও মানুষ ছাড়া আর কোনো জীবের বিদ্যার্জনের সুযোগ নেই এবং অর্জিত বিদ্যার অহংকারও নেই কারও। নিজের বুদ্ধির শূন্যকুম্ভের শব্দঝংকার নিজের কানেই অপূর্ব শ্রুতিমধুর মনে হয় এবং ঘুমপাড়ানি গানের মতো সেই শব্দে নেশায় বিভোর হয়ে থাকতে ভাল লাগে। রাস্তার রাম-রহিম থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাবুদ্ধির দুর্ভেদ্য সাধনচক্রেব সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলকেই সমান স্তরের আত্মকামুক বলা যায়। তাই কবি এজরা পাউণ্ডের এই বীতরাগকে মনে হয় ব্যতিক্রম :

> O God...patron of thieves,
> Lend me a little tobacco-shop,
> Or instal me in any profession
> Save this damn'd profession of writing,
> Where one needs one' brain all the time

প্রবঞ্চকদের পৃষ্ঠপোষক ভগবানকে আহ্বান করে কবি যে তামাকের দোকান ভিক্ষা করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেহের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মাথার উপর অনেকের আস্থা অগাধ। মাথাটাকে অন্যান্য 'কমোডিটি'র মতো তাঁরা বাজারস্থ করতে চান না, যদিও গোটা জগৎটাই বাজার এবং বুদ্ধিজীবী ও তাঁর বুদ্ধি ধনতান্ত্রিক বাজারের পণ্য। বাজারদরের কথা যদি নিতান্তই ওঠে তাহলে 'প্রফেসার' নিশিকান্ত (সঙ্গীতজ্ঞ), 'প্রফেসার' পঞ্চানন (যাদুকর), 'প্রফেসার' রামচন্দ্র (ব্যায়ামবীর পালোয়ান) ও 'প্রফেসার' প্রফুল্লকুমার (কলেজ মাস্টার), সকল শ্রেণীর 'প্রফেসার' একবাক্যে মাথার দর সমান দাবি করবেন। মুশকিল হল, মাথা এমনই এক পদার্থ

যা বিল্বফলের মতো ফাটিয়ে দেখে যাচাই করা যায় না। মগজের ব্যাপারীদের সবচেয়ে বড় সুবিধা সেইখানে। বাকি থাকে, মগজের 'প্রোডাক্ট' দেখে যাচাই করার পন্থা। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠবে, কে যাচাই করবে কার 'প্রোডাক্ট'? কোন্ কৃতী কার কীর্তি বিচার করবেন?

এক মাথা যখন অন্য মাথার বিচার করবে, তখনই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগবে। একই পণ্যের দুই ব্যবসায়ী যেমন নিজের পণ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত থাকেন, মস্তিষ্কের কীর্তির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিযোগীর সেই হীন আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রকাশের ব্যস্ততা সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে। মাথা থাকা সত্ত্বেও মাথা নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা নেই, সেই সব সাধারণ লোক, মস্তিষ্ক-প্রধানদের অন্তরের দৈন্য দেখে শিউরে উঠবেন। নানা আকারের অগুণতি গোলাকার মাথার চকমকিঘর্ষণে যে অগ্ন্যুদ্গীরণ হবে, তাতে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত সকলের বিদ্যাবুদ্ধিই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। অর্থের মূলধন সমাজে কত অনর্থ ঘটাতে পারে, তা নিয়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্কস যুগান্তকারী গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির মূলধনও যে সমাজের কত অকল্যাণ, কত অনিষ্ট করেছে এবং করছে, তা নিয়ে বিশ শতকের মধ্যভাগে আজ রীতি-মত চিন্তা করার সময় এসেছে। বর্তমানে সমাজের চিন্তামণিরা তা নিয়ে অবশ্য চিন্তা করছেন, কিন্তু সমস্যা এত বেশি যে চিন্তার কোনো কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা।[8] একালের ধাবমান সমাজের দিকে চেয়ে মগজসর্বস্ব এলিট্‌শ্রেণী বা বিদ্বৎশ্রেণী সম্বন্ধে কোনরকম উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বিশেষ উপরি সমাদর, স্বীকৃতি ও সম্মান ভবিষ্যৎ সমাজে আদৌ লভ্য হবে কিনা, সে বিষয়েও অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে, যত দিন যাচ্ছে এবং বুর্জোয়া সমাজের গণতান্ত্রিক গতির বেগ যত বাড়ছে, ততই এই সন্দেহের কৃষ্ণছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে তাঁদের মনে।

বুদ্ধিজীবীর বা এলিটশ্রেণীর সত্তার স্বাতন্ত্র্য ভবিষ্যতের জনসমাজে স্বীকৃত হবে না। কোনো বিশেষ সমাদর ও সামাজিক উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবেন না তাঁরা। তাঁদের সমস্ত কীর্তি, ভেলকির মতো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হলেও, দৈনিক সংবাদপত্রের চমকপ্রদ সংবাদের মতোই গৃহীত হবে এবং ক্ষণিকের স্থায়িত্বই হবে তার প্রাপ্য। কীর্তিমানেরা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রাতঃকালে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে, সেইদিন অপরাহ্নে বিস্মরণের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবেন। বহু

কীর্তিমানের অজস্র ছোট-বড়-মাঝারি কীর্তির তলায় পূর্বের কীর্তি সমাধিস্থ হয়ে যাবে। ছোট-বড়-মাঝারি সকল রকমের মাথাই থাকবে সমাজে, কিন্তু কেবল তাদের আকারগত নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব ছাড়া আর কোনো 'গুরুত্ব' আরোপ করা হবে না। খ্যাতির বাতি জ্বলে উঠতে উঠতে ফুৎকারে দপ করে নিভে যাবে। পয়লা কার্তিকের কীর্তিমানদের পয়লা অগ্রহায়ণ চিনতে পারবে না কেউ। বিদ্যাবুদ্ধির নার্সিসাসদের তখন একমাত্র সান্ত্বনা হবে (যদি অবশ্য সমাজের গতির সঙ্গে তাঁরাও নিজেদের মানসিক গড়ন না বদলান)—'আমার কীর্তির চেয়ে আমি যে মহৎ'—এই মন্ত্র জপ করে বেঁচে থাকা। ক্রমে তাঁরা দেখবেন, তাঁদের কীর্তি তো দূরের কথা, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মহত্ত্বও তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি কর্ষণ-সাধনের গুহ্যচক্রের একশত বর্গ ফুট (১০ ফুট × ১০ ফুট একটি ঘরের আয়তন) এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার জৌলুষের একটা রশ্মিও তার বাইরে ঠিকরে পড়ছে না, এবং বৃহত্তর সমাজে তা নির্মমভাবে উপেক্ষিত। দুদ্দাড়গতি বর্তমান জনসমাজের রথচক্রের সমস্ত রহস্যময় ইন্টিলেকচুয়াল সাধনচক্র চূর্ণ হয়ে যাবে। এক-একজন সিদ্ধপুরুষ ও তাঁর দু-চারজন মন্ত্রশিষ্য নিয়ে যে সব elite group গড়ে ওঠে সমাজে এবং মধ্যে মধ্যে তাঁরা যে সব ফতোয়া জারি করেন, তার মূল্য নির্ধারিত হবে বাইরের সমাজের প্রতিদিনের অসংখ্য হ্যাণ্ডবিল ইশতেহারের মতো। চাঞ্চল্য যদিও বা জাগে কোনো কারণে, তাহলেও বাইরের বিচিত্র চাঞ্চল্যের প্রবল ঘূর্ণিতে সেই একটি-মাত্র ইন্টিলেকচুয়াল চাঞ্চল্যের কোনো আকর্ষণই থাকবে না। চাঞ্চল্যের প্রতিযোগিতায় বিদ্যাজীবীরা সকলের পশ্চাতে পড়ে থাকবেন।

চলচ্চিত্র রাজনীতি খেলাধূলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে জনতার কাছে প্রত্যক্ষ চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ আছে, সেখানে কৃতী ব্যক্তিরা উত্তেজনা সঞ্চার করতে পারেন অনেক বেশি। আজকের সমাজে তাই অভিনেতা খেলোয়াড় ও রাজনৈতিক নেতার আবেদন হাজারগুণ বেশি জনসমাজে, বিদ্বৎজনের তুলনায়। কারণ বিদ্বানদের সঙ্গে জনসমাজের সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। এই পরোক্ষতার খেসারত দিতে হবে তাঁদের, হয় পর্দার আড়ালে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, অথবা ঠিক খেলোয়াড় অভিনেতাদের মতো ক্রমাগত তাৎক্ষণিক উত্তেজনার খোরাক যুগিয়ে। অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও খেলোয়াড় হতে হবে, জবরদস্ত জিমন্যাস্ট। একবার খেলা দেখালেই হবে না, ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে হলে ক্রমাগত খেলা দেখাতে হবে, নিত্যনূতন খেলা। বিদ্যার ক্ষেত্রে

নিত্যনূতন খেলা দেখানো যে কত কঠিন, তা বিদ্যাজীবী মাত্রই জানেন। তার উপর বিদ্যাসমাজ আধুনিক গণশিক্ষার ফলে যত প্রসারিত হবে এবং বিদ্যা-ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা যত তীব্র হবে, তত তাঁদের নূতন নূতন লেবেল-আঁটা পণ্য সরবরাহের দিকে নজর দিতে হবে। তা না হলে, তথাকথিত অবাধ প্রতিযোগিতায় তাঁদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। মোদ্দাকথা, যেদিক থেকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিচার করা যাক না কেন, বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকা, তাঁদের কীর্তিকর্মের মূল্যায়নের মানদণ্ড, খ্যাতিমর্যাদা ইত্যাদি সব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একদিকে মানুষেরই বুদ্ধিজাত যন্ত্র, অন্যদিকে তারই আকাঙ্ক্ষিত বুর্জোয়া বারোয়ারী গণতন্ত্র (mass democracy), এই দুই বস্তু আজ বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্য আত্মম্ভরিতা গোষ্ঠীসংকীর্ণতা বিদ্যাগৌরব, এমন কি সুকীর্তি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করতে সমুদ্যত। যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের রূপায়ণে বুদ্ধিজীবীরা অন্তত দুই শতাব্দী ধরে তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিপ্রতিভা নিয়োগ করেছেন, সেই সমাজ আজ তাঁদের বিশাল বুদ্ধিহীন যন্ত্রের নাটবলটুতে পরিণত করে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যাভিমান গ্রাস করতে উদ্যত। ইতিহাসের এক বিচিত্র পরিহাস।

আজও যাঁরা সমাজচিন্তায় নিযুক্ত, তাঁরা সকলে এই ধরনের সব এমন কথা বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে বলেন যাতে হতাশ হয়ে যেতে হয়। বহুযুগের উন্নত মাথার হঠাৎ এমন শোচনীয় পতনের কথা ভেবে অনেক মাথাওয়ালা ব্যক্তি নিশ্চয় বিমর্ষ হবেন, কেউ কেউ হয়ত বিদ্রোহীর মতো আস্ফালনও করবেন। কিন্তু আস্ফালন বৃথা। সমাজের নিশ্চিত গতি মস্তিকের ডিভ্যালুয়েশনের দিকে। ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের মজবুত বলটু হিসেবে তার দাম বাড়বে, কিন্তু সামাজিক দাম কমবে। অবশ্য সামান্য একটু দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, মস্তিষ্কের বাজারের এই তেজিমন্দার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু থাকে না। কোনো মাথাই যখন চিরদিন স্থায়ী হবে না, তখন সেই মাথার কর্মকীর্তির স্থায়িত্ব নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন? গির্জাপ্রাঙ্গণের গোরস্তানে হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে।

> There's another: way may not that be the skull of a lawyer? Where be his quiddits now, his quiliets, his cases, his tenures, and his tricks? Why does he suffer this rude knave now to knock him about the

sconce with a dirty shovel, and will not tell him of his action of battery?

কিন্তু এই অদার্শনিকের সমাজে, দুঃখের বিষয়, দার্শনিক দৃষ্টি অতিশয় দুর্লভ। বিত্তের পুঁজিপতিদের তো নেই-ই, বিদ্যার পুঁজিপতিদেরও নেই। সুতরাং তা নিয়ে আমাদের আলোচনারও প্রয়োজন নেই। সব মাথার খুলির শেষ পরিণতি যে একই, তা আমরা বিস্মৃত হতে পারি বলেই মস্তিষ্কচেতনা জীবদ্দশায় আমাদের এত প্রখর। আমাদের প্রতিপাদ্য হলো, বিদ্যাচেতনার এই প্রাখর্য ভবিষ্যতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জনতাসমাজে স্তিমিত হয়ে আসবে, এবং বনগ্রামে শৃগালরাজত্বকালের 'প্রতিভা'র যে সংজ্ঞা তাও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যাত হবে।

কেন হবে?

হবে প্রধানত দুটি কারণে, একটি যান্ত্রিক বা টেকনোলজিক্যাল, এবং আরএকটি সামাজিক।

যন্ত্র ক্রমে মানসলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং মন্থরগতিতে নয়, দ্রুতগতিতে। মানবমনের যা কিছু ধর্ম ও কর্ম, যা নিয়ে এত দর্প এবং এতকালের রহস্যাচ্ছন্ন ইন্দ্রপুরী রচনা, তা সমস্তই আজ যন্ত্র অধিকার করতে উদ্যত। যে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ যন্ত্র গড়েছে, সেই বুদ্ধির বিনাশের পথ আজ প্রস্তুত করছে যন্ত্র। 'Cybernetics' বা যন্ত্রমানসবিদ্যা নামে এক নূতন সাধনোপযোগী বিদ্যারই বিকাশ হয়েছে সম্প্রতি। আজও যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্বান-বুদ্ধিমান বলে পরিচিত তাঁরা বলছেন যে ভবিষ্যতে এই সাইবারনেটিক্সই অতীতের সমস্ত বিদ্যার জৌলুষ আচ্ছন্ন করে ফেলবে। যান্ত্রিক সমাজে, যান্ত্রিক মানুষ প্রধানত যন্ত্রমানসবিদ্যার চর্চা করবে। সেই ভবিষ্যৎটা আর কত দূরে যদি জানা যেত, তাহলে হয়ত ক্রমবিলীয়মান বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কস্ফীতির দুরারোগ্য ব্যাধির খানিকটা উপশম হতো। কিন্তু তা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। তাই পদে পদে ব্যর্থ হয়েও অপদার্থ বুদ্ধিজীবীদের আশার অন্ত নেই। নৈষ্কর্ম্যের নামান্তর বুদ্ধিবিলাসের আত্মতৃপ্তিও তাঁদের অফুরন্ত। কিন্তু তাহলেও যন্ত্রের অনিবার্য নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি নেই। Cybernetics-এর একখানি পপুলার বইয়ের মুখবন্ধে সম্পাদকরা লিখেছেন:

একদা এক সাধুপুরুষ এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, যা দিয়ে দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। খুব বুদ্ধিমান যন্ত্র না হলে এ রকম কাজ করতে পারে না। কিন্তু তার চেয়েও বুদ্ধিমান হলেও সাধুপুরুষটি, এত বুদ্ধিমান যে আজ পর্যন্ত কোনো যন্ত্র তাঁর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয়নি। কোনো যন্ত্রের সাহায্যে আজ পর্যন্ত এমন একজন সাধুপুরুষ তৈরি করা সম্ভব হয়নি যিনি যাই হোক কিছু প্রমাণ করতে পেরেছেন।

তাহলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান শতাব্দীতে যন্ত্র ও মনের ব্যবধান অনেক কমে গেছে। হিসেব-নিকেশ, সমস্যাপূরণ ইত্যাদি নানারকমের কাজ যা এতদিন মানবমনের অন্যতম কর্ম বলে পরিগণিত হতো, আজ তা বিচিত্র সব যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক কর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সব কর্মরত যন্ত্রগুলি সত্যই ভয়াবহ। তাদের দিকে তাকালে মনে হয়, মনোরাজ্যে এই যন্ত্রের অভিযান কতদূর পর্যন্ত চলবে এবং কোথায় এর শেষ হবে! কেউ আজ নিশ্চিত বলতে পারেন না যে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক দাবাখেলায় যন্ত্রে যন্ত্রে প্রতিযোগিতা হবে কি না। কেউ এমন কথাও বলতে পারেন না যে যন্ত্রই ভবিষ্যতে ভাল ভাল সনেট ও কবিতা লিখবে কি না এবং সেগুলি ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে সংকলনে স্থান পাবে কি না। শিল্পীদের মতো ভাল ভাল ছবিও যে যন্ত্র আঁকতে পারবে না, যা রয়াল আকাদেমির প্রদর্শনীতে স্থান পাবে, এমন কথাও কেউ বলতে পারেন না আজ। অনেক শিল্পীচক্রের জটিল সাধনারও প্রতিদ্বন্দ্বী হবে যন্ত্র!

এই সব ঘটনা হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে। আরও অনেক দূর এগোতে হবে যন্ত্রকে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই, কারণ যন্ত্র দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রকে আজ উপেক্ষা করলে চলবে না, মানুষ মতো তাকেও বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। যন্ত্রকে না বুঝলে মানুষ নিজেকেও বুঝতে পারবে না।*

যন্ত্রের দুর্ধর্ষ অগ্রগতির এই চিত্র নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কিন্তু আজ আমাদের কাছে যা ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষের কাছে তা স্বাভাবিক ও সুখাবহ হতে পারে। যন্ত্রযুগের শৈশবকালে যে সব যন্ত্র মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ

* W. Sluckin, *Minds and Machines*, Foreword.

মনে হয়েছিল, আজ তা এককণা বিস্ময়ও উদ্রেক করতে পারে না। মনোযন্ত্র ও বুদ্ধিযন্ত্র আজ যতই তাজ্জব মনে হক, ভবিষ্যতে তা মানুষের মনসহা হয়ে যাবে। তার বৈপ্লবিক সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাতেই আজ আমরা স্তম্ভিত ও মর্মাহত হলেও, ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের মনোভাবকে অর্ধবর্বর মনে করে মুচকি হাসবে। সমাজের আর কোনো জনশ্রেণীর এই সর্বাত্মক যান্ত্রিকতায় বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় না, বরং লাভেরই সম্ভাবনা বেশি। সমূহ ক্ষতি হবে বুদ্ধিজীবীদের, তাঁদের একূল-ওকূল দুকূল যাবে। মগজের রহস্যলোকের সূক্ষ্মতম স্নায়ুচক্র যদি বাইরের অভিনব যন্ত্রের জটিল কলকব্জায় রূপান্তরিত হয় এবং তার আধিভৌতিক ক্রিয়ার সমস্ত বাহাদুরি যদি সেই দানবীয় যন্ত্র আত্মসাৎ করে বসে, তা হলে বেচারা বুদ্ধিজীবীর সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাবে। যন্ত্র যদি সনেট লিখতে বসে, দুর্বোধ্য ইন্টিলেকচুয়াল কবিতা অনর্গল রচনা করে যায়, বড় বড় অঙ্ক ফরমুলা স্ট্যাটিস্টিক্স একনিমেষে সমাধান করে ফেলে, অতীতে কবে কি হয়েছিল, সন তারিখ বসিয়ে দিলে যদি তার ঘটনাপঞ্জী তৈরি করে দেয় কয়েকটি চরিত্র (যেমন একটি ছেলে দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে সাতটি মেয়ে তেরটি ছেলে একটি মেয়ে ইত্যাদি) ফানেলের মধ্যে কাগজের টুকরোয় লিখে, পুরে দিলে যদি সেই যন্ত্র পার্মুটেশন-কম্বিনেশন করে হাজার রকমের উপন্যাস-কাহিনী রচনা করে ব্রডকাস্ট করতে পারে, তা হলে বুদ্ধিজীবীদের এতদিনের কারসাজি এবং সৃজনশীল (creative), মননশীল (intellectual) ইত্যাদি সাহিত্যকর্মের সমস্ত বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। বুদ্ধিজীবীরা তখন কি করবেন ?

কবি এলিঅটের ভাষায় —'Birth and Copulation and Death' ছাড়া—অর্থাৎ যান্ত্রিক উপায়ে 'জন্মগ্রহণ, যান্ত্রিক উপায়ে 'রমণ' এবং যান্ত্রিক উপায়ে 'মরণ' ছাড়া তাঁদের করণীয় আর কিছু থাকবে না। সৃজন-মননের যাবতীয় কর্ম তখন যন্ত্রই করবে, কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ শ্রমজীবী, কেউ কৃষিজীবী, এই ধরনের সনাতন সামাজিক শ্রেণীভেদ আর থাকবে না। সকলেই একশ্রেণীর মানুষ হবে—যন্ত্রজীবী। যে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে চার লাইন কবিতা লিখবে বা উপন্যাস নামে কাহিনী রচনা করবে সে সৃজনশীল, এবং যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে চিন্তাশীল বিষয় রচনা করবে সে মননশীল, শোনা যাচ্ছে যে বুর্জোয়াযুগের এই সব বস্তাপচা বিচারভেদ ধূলিসাৎ করে দেবে আগামীকালের মহাযন্ত্র। বুদ্ধিজীবীদের

একশত বর্গফুটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক বুদ্ধিচক্র থেকে যদি কোনো সিদ্ধপুরুষ কয়েক হাজার ভোল্টেরও বুদ্ধির খেলা দেখান, তাহলেও সমাজের লোক নির্বাক বিস্ময়ে তাঁকে আর প্রাগৈতিহাসিক যাদুকরের মর্যাদা দেবে না।

সেই মহাযন্ত্রের যুগ আসছে বললেও ঠিক হবে না, তার পদধ্বনি ক্রমেই জোরে শোনা যাচ্ছে। সশরীরে আবির্ভাবের আগে তার অশরীরী যান্ত্রিক আত্মা সমগ্র সমাজকে এর মধ্যেই প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এখন আর কোনো মানুষের সামগ্রিক (total) সত্তা বলে কিছু নেই। যে-কোনো ক্ষেত্রের যে-কোনো মানুষ এখন 'অংশ' (part) মাত্র, নাট-বল্টু মাত্র, সম্পূর্ণ মানুষ নয়। এখনকার 'সাহিত্যিক' বলতে এমন কি সেদিনকার বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক বোঝায় না। সকলেই ভগ্নাঙ্গ (বা বিকলাঙ্গ) 'লেখক' মাত্র। কেউ গল্প, কেউ কবিতা, কেউ উপন্যাস, কেউ রম্যরচনা, কেউ সমালোচনা—প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদির 'লেখক'। অথচ এর মধ্যেও কাহিনীলেখক ও পদ্যলেখকরা সৃজনশীলতার আত্মম্ভরিতাটুকু শেষ পুঁজিপাটার মতো আঁকড়ে ধরে আছেন। টুকরো-টুকরো হয়ে গেছেন, তবু প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করছে। আজ আর 'ঐতিহাসিক' বলে কেউ নেই। কেউ অষ্টাদশ, কেউ উনবিংশ শতাব্দীর, কেউ মোগলযুগ, কেউ ব্রিটিশ যুগ, কেউ গুপ্তযুগের, কেউ রাজনৈতিক ইতিহাসের, কেউ সামাজিক, কেউ বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের, কেউ আবার একই শতাব্দীর একটিমাত্র পর্বের (যেমন ১৭০০ থেকে ১৭২৫ খ্রীঃ) 'বিশেষজ্ঞ'। আজ আর 'ডাক্তার' বলেও কেউ নেই। চোখ নাক দাঁত গলা হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির স্বতন্ত্র সব 'বিশেষজ্ঞরা' আছেন। কোনো ব্যাধির জন্য হয়ত চোখ গলা দাঁত পেট ও ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রণা দিচ্ছে। তার জন্য পাঁচজন বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে, তাঁরা পাঁচখানা প্রেসক্রিপশন দেবেন। কিন্তু সবকটি মিলিয়ে আসল ব্যাধিটা কি হয়েছে তা জানতে গেলে, পাঁচখানা প্রেসক্রিপশন নিয়ে কার কাছে যেতে হবে জানা নেই। এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সমাজের সর্বক্ষেত্রের কর্মই যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, খণ্ডিত হয়ে যন্ত্রের কলকব্জার মতো টুকরো হয়ে গেছে। সব মানুষই বিকলাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ মানুষ নেই যান্ত্রিক সমাজে। এহেন অবস্থায় বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ গোবি মরুভূমির মতো ধূসর, চেরাপুঞ্জী থেকে একখানা মেঘও সেখানে আর উড়ে আসবে না কোনোদিন, অন্তত বর্তমান ধনতান্ত্রিক শ্রেণীসমাজের আকাশে।

সবার উপর বুর্জোয়া যন্ত্রযুগের বারোয়ারী গণতন্ত্রের (mass democracy) ধাক্কা তো আছেই। সব ঘটনার গুরুত্ব ও কীর্তির মহত্ত্ব আজ স্নায়ুমণ্ডলীর সাময়িক শিহরণ-সুড়সুড়ি দিয়ে মেপে দেখে বিচার করা হয়। খ্যাতি-অখ্যাতি, প্রিয়তা-অপ্রিয়তা, প্রশস্তি-নিন্দা, সবই এ সমাজে সোডার জলের মতো বজবজিয়ে উঠে বিলীন হয়ে যায়। রাজনীতির নির্বাচনের (election) ক্ষেত্রে, নেতানুগমনের ক্ষেত্রে, সর্বদাই এই দৃশ্য নজরে পড়ে। যন্ত্রভিত্তিক স্নায়ুশিহরণসর্বস্ব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জনতাসমাজের এটি একটি উল্লেখ্য উপসর্গ। সাহিত্য অথবা বুদ্ধিজীবীদের বেচাকেনার 'পণ্য' সমাজবহির্ভূত বস্তু নয়। সুতরাং উপসর্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে হয়েছে, বাংলা দেশেও। এই উপসর্গ একজন সমাজতত্ত্ববিদ্ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :*

> The elites are not in direct contact with the masses. Between the elites and the masses stand certain social structures, which, although they are purely temporary, have nevertheless a certain inner articulation and constancy. Their function is to mediate between the elites and the masses. Here, too, it can be shown that the transition from the liberal democracy of the few to real mass-democracy destroys this intermediate structure and heightens the significance of the completely fluid mass.

ম্যানহাইম বলেছেন, বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে জনসমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। সেই সংযোগ মধ্যবর্তী কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটা যে নিজস্ব চরিত্র থাকে তা হঠাৎ বদলায় না। সংখ্যালঘিষ্ঠের উদার গণতন্ত্রের যুগ থেকে যতই আমরা বারোয়ারি গণতন্ত্রের যুগে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সমাজের এই মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলির গড়ন ও চরিত্র দুইই বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ম্যানহাইম যে কথাটি পরিষ্কার ক'রে বলেননি, সেটি হলো প্রতিযোগী ধনতন্ত্রের যুগ থেকে যত একচেটিয়া ধনতন্ত্রের যুগে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, তত এই সমস্ত উপসর্গ দেখা দিচ্ছে

---

* Mannheim, Man and Society, pp. 96-97.

সব ভেঙেচুরে নৈরাকার হয়ে গিয়ে সমস্ত সমাজটা একটা চেনাপরিচয়হীন নামগোত্রহীন জনস্রোতে পরিণত হচ্ছে। সাহিত্য শিল্পকলা সবই সেই স্রোতের অনুগামী। তার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলেছেন :*

> **It is in a society in a stage of dissolution that such a public supplants the permanent public which was formerly selected out of well-established and stable groups. Such an inconstant, fluctuating public can be reassembled only through new sensations. For authors, the consequence of this situation is that only their first publications tend to be successful, and when the authors, have produced a second and a third book the same public which greeted their first work may no longer exist. Wherever the organic publics are disintegrated, authors and elites turn directly to the broad masses. Consequently they become more subject to the laws of mass psychology…**

এই ধরনের সদাপ্রবহমান সমাজে স্থিতিশীল বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। জনতাসমাজের যেমন স্থিতি নেই, তেমনি তাদের আদর্শ আচার চিন্তা-ভাবনা রুচি নীতিনীতি, কোনোটারই স্থিতি নেই। স্থিতিহীন জনগোষ্ঠীকে বারংবার নূতন নূতন উত্তেজনার বৈদ্যুতিক 'শক্' দিয়ে নাড়া দেওয়া প্রয়োজন এবং সেইভাবে নাড়া না দিলে তাদের একত্রে জড়ো করা যায় না। সেইজন্য দেখা যায়, একালের সাহিত্যিক-লেখকরা যাঁরা হঠাৎ একখানা বই লিখে রাতারাতি 'বিখ্যাত' হয়ে গেলেন, 'গরম কেকে'র মতো যাঁদের বই বিক্রি হলো, দুদিন পরে পাঠকজনগোষ্ঠী তাঁদের ততোধিক দ্রুত-গতিতে ভুলে গেল এবং তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বই আর বিকলো না তেমন। জনমনের গতি লক্ষ্য করে লেখকরা তখন তারই পরিতুষ্টির পথে অগ্রসর হলেন। সস্তা 'stunt', বিচিত্র সব উত্তেজনা, তাঁদের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য করতে হল। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় এই উপসর্গ যেমন প্রকট হয়ে উঠছে, তেমনি অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও হচ্ছে। প্রতিভা বুদ্ধি মননশক্তি অথবা তথাকথিত 'সৃষ্টিশক্তি', সবই যদি ক্ষণিকের চমক ও

* Ibid.

উত্তেজনা সঞ্চারের কর্মে নিয়োগ করতে হয়, তা হলে বুদ্ধিজীবীর সনাতন স্বাতন্ত্র্যাভিমান আর টিঁকে থাকে না। সেকালের ম্যাজিসিয়ান পুরোহিতদের সগোত্র একালের বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত 'সৃষ্টিশীল' শিল্পীরা, তাই মনে হয়, যন্ত্র ও বারোয়ারী গণতন্ত্র দুই-এর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে লোপ পেয়ে যেতে বাধ্য। ফরাসী মনীষী পল ভ্যালেরী (Paul Valery) তাঁর 'Our Destiny and Literature' রচনায় এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত করে গেছেন। দেশ-বিদেশের আরও অনেক চিন্তাশীল মনীষী স্বগোষ্ঠীর এই অবশ্যম্ভাবী বিলোপের কথা বলছেন। সমাজবিদরা তো বলছেনই। বুর্জোয়া যন্ত্র-গণতন্ত্রের যুগে কেবল বুরোক্রাটিক বিপুল রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনৈতিক উৎপাদনযন্ত্র এবং নিত্য-উদ্ভাবিত সব বুদ্ধিকর্মযন্ত্র থাকবে, এবং মানুষ থাকবে তার কব্জা-বল্টু হয়ে। অনুভূতি বুদ্ধি প্রতিভা এসব কথার তাৎপর্যের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। 'মস্তিষ্ক' মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য অঙ্গ হলেও, দেহের হস্তপদাদি অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে তার গুণগত কোনো পার্থক্য থাকবে না। যন্ত্রদেবতা মানবসমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে। মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টদের রজতমুদ্রার যাদুতে যান্ত্রিক সমাজে সমস্ত মনন-চিন্তাভাবনা কাজকর্ম চেতনা অনুভূতি যন্ত্রবৎ পরিচালিত হবে। আমরা এই সামাজিক পরিবেশেই আজ বাস করছি। তাই বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্য ও অহামকা আজও আমরা তৃণখণ্ডের মতো আঁকড়ে আছি, মস্তিষ্কের ঐন্দ্রজালিক মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। এ মোহ যখন কাটবে, এবং দৈহিক ও মানসিক মেহনতের পার্থক্য যখন আমরা ভুলতে পারব, তখন আমরা নূতন সমাজের উপযোগী মানুষ হয়ে উঠতে পারব।

১৩৬৫ সন

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ

উনিশ শতকের চতুর্থাংশে বাঙালী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর সামাজিক রূপ খানিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রধানত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই এই রূপায়ণ আরম্ভ হয়। স্বভাবতঃই প্রথম পর্বের বুদ্ধিজীবীদের এই রূপায়ণ অনেকটা অস্পষ্ট, কিন্তু তা হলেও তার সামাজিক গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য তখনকার পরিবেশের মধ্যে কিছুটা ফুটে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তখন প্রধানত দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম গোষ্ঠীকে আমরা **Traditionalist** বা ঐতিহ্যপন্থী বলতে পারি, এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে বলতে পারি **Anglicist** বা পাশ্চাত্যপন্থী। দুই গোষ্ঠীকেই কতকটা 'চরমপন্থী' বলা যায়। ঐতিহ্যবাদীরা প্রাচীন দেশীয় ঐতিহ্যকে অনেকটা অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন, নূতন যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে তার পুনর্বিচার করতে চাননি পাশ্চাত্যবাদীরা ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে এতদূর ধাঁধিয়ে গিয়েছিলেন যে দেশীয় ঐতিহ্যকে একনিঃশ্বাসে নস্যাৎ করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। প্রথম পর্বের সংঘাত এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই তীব্র হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় আর একটি গোষ্ঠীর বিকাশ এই সময় থেকে হতে থাকে—তাঁদেরই আমরা '**Humanist**' বুদ্ধিজীবী বলতে পারি। এদেশের ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে, তার কালোপযোগিতা বিচার করে, বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে তার মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের 'হিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবী বলতে বাধা নেই। পাশ্চাত্যবাদীরাও হিউম্যানিস্ট ছিলেন, কিন্তু জীবনবোধ ও যুগাদর্শের দিক থেকে যতটা ছিলেন, নিজেদের ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক আচরণের দিক থেকে ততটা ছিলেন না। তবু তাঁরা যে 'হিউম্যানিস্ট' ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, একটিকে বলা যায় 'পাশ্চাত্যবাদী. হিউম্যানিস্ট' আর একটিকে বলা যায় 'ক্ল্যাসিক্যাল হিউম্যানিস্ট'।

কিন্তু হিউম্যানিস্ট কারা, এবং হিউম্যানিজম কি? সনাতন ঐতিহ্যবাদী বা **traditionalist**-রা কেন হিউম্যানিস্ট নন? হিউম্যানিজম নবযুগের মানুষের এগিয়ে চলার পথের **ideology** বা জীবনদর্শন। 'নবযুগ' মানে অবশ্য ইতিহাসের

দিক থেকে ধনতান্ত্রিক যুগ, এবং নবযুগের মানুষ মানে সেইযুগে যাঁরা প্রধান হয়ে ওঠেন সেই ধনিকশ্রেণী। এই ধনিকশ্রেণীর প্রথম অভ্যুদয়কালে এমন একটি জীবনদর্শনের প্রয়োজন তাঁদের ছিল যা মানুষকে পারত্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত করে জাগতিক চিন্তায় আকৃষ্ট করবে, ঈশ্বর-মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্ম-বিশ্বাসী হতে উদ্‌বুদ্ধ করবে, এবং অতিপ্রাকৃত পরমার্থবোধের বদলে মানবমুখী জীবনবোধেব বিকাশে সাহায্য করবে। এই আদর্শসংগ্রামে যেহেতু তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্যের 'চ্যালেঞ্জে'ব সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেইজন্যই তাঁদের প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে নূতন যুগোপযোগী আদর্শ ও নীতি পুনরনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়েছিল। সমাজচিন্তা ও মানবচিন্তার জন্য তাঁরা সেদিন সংগ্রাম করেছিলেন, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধির জন্য—আর্থিক মুনাফার চিন্তার চেয়ে পরমার্থ-চিন্তা তাঁদের অধিকতব কাম্য ছিল না, তাই মানুষকেও সেই চিন্তা থেকে তাঁরা মুক্ত কবতে চেয়েছেন। তাঁদের কাম্য ছিল নগদ metallic অর্থচিন্তা, তাই ইহজগৎ ও ব্যক্তিসত্তাব চিন্তার দিকে তাঁরা মানুষের মনকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ধনিকশ্রেণী তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের জন্য এই আদর্শ প্রচার করলেও, সাধাবণভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে সেই সময় এই আদর্শ খানিকটা সাহায্য করেছে। ধনিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে মার্কস্‌-এঙ্গেলসের বিখ্যাত উক্তির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part. The bourgeoisie · has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his natural superiors, and has left remaining no other nexus between man and man than naked self-interest, than callous cash payment. It has drowned the most heavenly ecstasies of religious fervour, of chivalrous enthusiasm, of phillistine sentimentalism, in the icy water of egotistical calculation. It has resolved personal worth into exchange-value

নবযুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীরা ধনতন্ত্রের উন্মেষপর্বে ইয়োরোপে তাঁদের জাগতিক ও মানবমুখী আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে এইজন্যই ইতিহাসের সম্মুখগতিতে সাহায্য করেছেন এবং এই কারণেই তাঁরা প্রগতিশীল। এইজন্যই

দেখা যায়, নবযুগের সূচনাকালে নূতন বিত্তবানশ্রেণী ও বিদ্বানশ্রেণী, সমাজের প্রায় একই স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংলা দেশে হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীরা এই ঐতিহাসিক অর্থেই হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের পাশ্চাত্ত্যবাদীদের সাংস্কৃতিক আচরণের দিক থেকে এবং কিছুটা বিদ্যার দিক থেকেও, আদর্শ হিউম্যানিস্ট বলা যায় না। কারণটা অবশ্য আমাদের ইতিহাসের দিক থেকে করুণ। পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের যুগে, ঐতিহাসিকরা একবাক্যে বলেছেন—"Classical learning was endowed with magic qualities."—কিন্তু আমাদের দেশে কি ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতাবিদ্যা আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মনে সেইরকম যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল? তা পারেনি, এবং তার কারণ হল আমাদের পরাধীনতা। বাংলার নবযুগের বুদ্ধিজীবীদের বড় একটা অংশ ইংরেজদের ইংরেজিবিদ্যায় যতটা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, নিজেদের দেশীয় বিদ্যায় তা হননি। বিশেষ করে অ্যাংলিসিস্ট বা পাশ্চাত্ত্যবাদীরা তো হনইনি। নূতন ইংরেজ রাজার রাজভাষা ও রাজবিদ্যা উদীয়মান বাঙালী বিত্তবান ও বিদ্বান উভয়শ্রেণীর মনে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ ইংরেজিবিদ্যা বিত্তলাভ ও সামাজিক মর্যাদালাভের সহায়ক। সে প্রভাব দু-এক পুরুষে নয়, আজকে প্রায় সাত পুরুষেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময় পর্যন্ত, এদেশে ব্রিটিশ শাসকদের শিক্ষানীতি ছিল, ক্ল্যাসিকাল প্রাচ্যবিদ্যার পোষকতা করা। সেজন্য কলকাতায় মাদ্রাসা ও বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৮১১ সালে লর্ড মিণ্টো তার শিক্ষাপ্রস্তাবে নবদ্বীপে ও ত্রিহুতে দুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন, এবং প্রসঙ্গত এদেশের প্রাচীন বিদ্বৎসমাজের ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন :

> The number of the learned is not only diminished, but the circle of learning even among those who still devote themselves to it appears to be considerably contracted.

কেবল বিদ্যারই যে অবনতি হয়েছিল তাই নয়, বিদ্বৎগোষ্ঠীর সংখ্যাও যে কত কমে এসেছিল, মিণ্টো সেকথা ইঙ্গিত করেছেন। রাষ্ট্র-দুর্যোগ, অর্থ-

নৈতিক কারণ, এবং প্রধানত সেকালের জমিদারশ্রেণীর পোষকতার অভাব— এই কয়েকটি কারণে প্রাচীন বিদ্বৎসমাজের বিলোপ ঘটাছল। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠার পর, এবং সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য জেলা-আদালতে জজপণ্ডিত নিয়োগের ফলে, বিশেষ করে ইংরেজ শাসকদের প্রাচ্যবিদ্যার পোষকতার জন্য, কলকাতা শহরে সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বৎসমাজের নূতন একটি গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছিল। পাদ্রী উইলিয়ম ওয়ার্ডের *A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ১৮২০ সালের কলকাতার টোল-চতুষ্পাঠীর একটি বিবরণ পাওয়া যায়। কলকাতায় তখন প্রায় ২৮ জন পণ্ডিতের টোল ছিল এবং তার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ১৭৩ জন। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, নূতন বিদ্যাকেন্দ্র কলকাতা শহরেও উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই traditionalist পণ্ডিতদের একটি সমাজ বা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই বিদ্বৎগোষ্ঠীর অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করে সেকালের পণ্ডিতগোষ্ঠী একালের বিদ্বৎসমাজের নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পান।

কিন্তু ইংরেজরা যখন প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন ক্ল্যাসিকালবিদ্যার পোষকতা করছিলেন, এবং ইংরেজি শিক্ষার ভাল প্রতিষ্ঠান যখন কিছুই ছিল না, তখন থেকেই দেখা যায়, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর আগ্রহ বাড়ছিল। রামকমল সেন ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় তার উল্লেখ করেছেন :

> In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary.

তখন ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সাহেব অ্যাটর্নি ও অ্যাডভোকেটদের বাঙালী কেরানীরা। তাঁরা ইংরেজিতে আবেদনপত্রাদি লিখতে পারতেন, এবং কাজকর্ম চালানোর মতো yes no very well প্রভৃতি কিছু ইংরেজি শব্দের স্টকিস্ট ছিলেন। একটি নোটখাতার মধ্যে তাঁরা ইংরেজি শব্দ লিখে-লিখে স্টক করে রাখতেন। যাঁর যত বেশি স্টক থাকত, তিনি তত বড় ইংরেজির পণ্ডিত বলে খাতির পেতেন। রামকমল সেন তাঁর অভিধানের ভূমিকায় কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে,

তিনি বলেছেন, যতদূর অনুসন্ধান করে জানা যায়, রামরাম মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ "**was the first who made any considerable progress in the English language.**" অনেক বাঙালীবাবু তখন তাঁর ছাত্র ছিলেন। রামরামের পর রামনারায়ণ মিশ্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, এবং আরও পরে রামকমল বলেছেন, ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত ও অন্য দু-একজন "**were celebrated as *complete* English scholars.**" ইংরেজির এই **complete scholar**-দের বিদ্যা তখন একখানি **Spelling Book** ও **Word Book**-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এঁরা নিজেরা স্কুল করে ইংরেজি শিক্ষা দিতেন এবং বাঙালী ছাত্রদের কাছ থেকে তার জন্য বেতন নিতেন ৪৲ টাকা থেকে ১৬৲ টাকা পর্যন্ত।*

বিবরণটি বাইরে থেকে কিছুটা লঘু মনে হলেও, সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আঠার শতকের শেষপাদ থেকে উনিশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত, অন্তত ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত, বাংলা দেশে নূতন ইংরেজি শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি এর মধ্যে কয়েকটি রেখার আঁচড়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল নবযুগের বাংলায় নূতন বিদ্বৎসমাজের ঐতিহাসিক রূপের সমস্ত বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তখনকার দিনে মাসিক চার টাকা থেকে ষোল টাকা বেতন দিয়ে কারা তাঁদের ছেলেদের শিবু দত্ত-ভবানী দত্ত-রামলোচন নাপিত, অথবা তাঁদের সমসাময়িক ফিরিঙ্গী আরাতুন পিক্রশ, শেরবোর্ন ড্রামণ্ড হুটেম্যান প্রভৃতিদের স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠাতেন? কলকাতা শহরের নূতন মধ্যবিত্তসমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা—দেওয়ান-মুন্সী-বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দি ব্যবসায়ীদের পরিবার নিয়ে গঠিত নূতন শহুরে উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণী। এই সমাজই তখন কলকাতা শহরে 'বাবুসমাজ' বলে পরিচিত ছিলেন। এই সব **complete English scholar**-দের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা নেহাৎ অল্প ছিল না, কারণ এ-রকম স্কুল খুলে অনেকে তখন যথেষ্ট ধনোপার্জন করেছিলেন। চার টাকা থেকে ষোল টাকা বেতন আদায়ের মনোভাবটিও কালোপযোগী, কারণ কার্ল মার্কসের ভাষায়, সবকিছুর **value**-ই তখন **exchange-value**-তে পরিণত

* প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। তিনিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের একজন। তিনিও 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে 'কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার বিবরণ, শিশুশিক্ষার প্রসঙ্গ'-এ এদেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বলেছেন।

হয়েছে, এবং সব মানবিক সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে ক্যাশ-টাকার সম্পর্কে (cash nexus-এ)। সেকালের টোল-চতুষ্পাঠীর গুরু ও পণ্ডিতদের নিঃস্বার্থ বিদ্যাদানের আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন বুর্জোয়াযুগের বুদ্ধিজীবী শিবু দত্ত-শেরবোর্ন-রাম নাপিতের নূতন বিদ্যাদর্শ টাকার ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই সঙ্গে ঘটে গেছে। ব্রাহ্মণের কুলগত বৃত্তি ছিল শাস্ত্রব্যবসা ও অধ্যাপনা। নবযুগের ধনতান্ত্রিক সমাজে তা একটি কোনো বিশেষ কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বিহারী ব্রাহ্মণ রামরাম মিশ্র থেকে ভবানী দত্ত, আনন্দী দাস, রামলোচন নাপিত, সকল কুলেরই বিদ্যাবৃত্তির অধিকার স্বীকৃত হল। সকল কুলের গুরুর কাছে সকল জাতের ছাত্র টাকার বিনিময়ে আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা করতে আরম্ভ করল। যতই দান করা যাবে ততই বেড়ে যাবে, নবযুগে বিদ্যার এই আদর্শ আর রইল না। নবযুগের বিদ্যা হল বিত্তলোভী এবং তার বিত্তও হল খানিকটা বিদ্যাশ্রয়ী। বিদ্যা দান করলে বিদ্যা বাড়ে না, বিত্ত বাড়ে।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে, বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল ছুটি স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট ধারায়—একটি ধারা দেশীয় ঐতিহ্যের, আর একটি ধারা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুগামী। ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ এবং ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই দুই বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর আরও দ্রুত বিকাশ হতে থাকে, এবং তাঁদের সামাজিক রূপটিও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ইংরেজরা তখনও প্রকাশ্যে পাশ্চাত্যবিদ্যা বা ইংরেজিবিদ্যাকে তাঁদের শিক্ষানীতি হিসেবে ঘোষণা করতে পারেননি। দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রথাকে, নিজেদের শাসনস্বার্থেই, তাঁরা হঠাৎ আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের অনেক আগেই এদেশের নূতন উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ইংরেজি শিক্ষার তৎকালিক শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিন্দুকলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই নূতন উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক, এবং ইংরেজদের তুলনায় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এঁদের অনেক বেশি আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের বশে, সরকারী পোষকতার মুখাপেক্ষী না হয়েই, তাঁরা হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আগ্রহের মূলে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রেরণা বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রখর ছিল তাঁদের সজাগ বাস্তববুদ্ধি। নূতন সমাজে সচল বিত্ত যেমন মূলধন হতে পারে, তেমনই ইংরেজিবিদ্যাও যে

নবযুগের অর্থ নৈতিক মূলধনের পরিপূরক মূলধন হতে পারে, এ সত্য তাঁরা শ্রেণীগত চেতনা থেকেই অনেক আগে উপলব্ধি করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা, শোভাবাজারের রাজপরিবারের গোপীমোহন দেব ও রাধাকান্ত দেব, ধনশালী রক্ষণশীল রাধামাধব অথবা রামকমল সেন ও রসময় দত্ত, এঁরা কেউ-ই নবযুগের হিউম্যানিস্ট আদর্শের সমর্থক ছিলেন না এবং তা উপলব্ধি করার মতো মানসিক গড়নও তাঁদের ছিল না। অথচ এঁরাই হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। নূতন রাজার আমলে রাজবিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা তাঁরা বণিকসুলভ স্বার্থবুদ্ধি থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন।

হিন্দুকলেজের ছাত্ররা কয়েকজন আদর্শবাদী বিদেশী শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষা লাভ করে, নবযুগের বাংলার অগ্রগণ্য হিউম্যানিস্ট ইন্‌টিলেকচুয়াল হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে, কোনো মহৎ জীবনাদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য হিন্দুকলেজের বাঙালী উদ্যোক্তারা উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই উক্তির সপক্ষে আরও একটি বড় প্রমাণ আছে, যা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নবযুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দীক্ষাগুরু যিনি, সেই রামমোহন রায় হিন্দু-কলেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেননি, এবং তাঁর ব্রাহ্মধর্মচিন্তা ও সংস্কারমুখী সমাজচিন্তাই তার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, এবং নিজেরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ 'secular' শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু তাঁদের এই প্রচারিত উদ্দেশ্য নিতান্তই হাস্যকর মনে হয়, কারণ হিন্দুকলেজের পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সকলেই প্রায় রক্ষণশীল ধর্মসভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং হিন্দুকলেজের চৌহদ্দির বাইরে তাঁরা ধর্মসভার আন্দোলনে ও ব্যবসাবাণিজ্যের ধান্ধাতেই কালাতিপাত করতেন। তবু তাঁরা 'হিন্দুকলেজ' নাম দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন কেন? Money ও Intellect-এর co-relation স্থাপনের জন্য। ধনতান্ত্রিক নবযুগের টাকা যেহেতু neutral, তাই নবযুগের বিদ্যাও neutral হওয়া বাঞ্ছনীয়। সিমেলের (Simmel)-এর ভাষায়:

> **The Intellect as such is a-moral; it is neutral like money which lends itslf without protest to the most dastardly machinations.**

রামমোহন রায় এই ধরনের amoral শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেননি, কিন্তু উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে দেশের মধ্যে যে নূতন বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠবে, আদর্শ ও নীতির দিক থেকে সমাজে তাঁরা যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন, তা তিনি জানতেন। তাই তিনি দূরে থেকেও হিন্দুকলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন।

নবযুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম দীক্ষাগুরু ছিলেন রামমোহন। সরকারী অর্থে সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হচ্ছিল যখন, রামমোহন রায় তখন বড়লাট আমহার্স্টকে প্রতিবাদ জানিয়ে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি সরকারীনীতির সমালোচনা করে মন্তব্য করেন (১৮২৩) :

> We now find that the Government are establishing a Sanskrit School under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known 2000 years ago, with the. addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men, such as is already commonly taught in all parts of India.

সংস্কৃত শিক্ষার বদলে তিনি এদেশের লোককে আধুনিক ইয়োরোপের শিল্পকলা সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্ম আবেদন করেছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা রামমোহন একেবারে বর্জন করতে চাননি, এবং এই পত্রে ঠিক সে কথা বলবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। ইংরেজদের অত্যধিক প্রাচ্যবিদ্যাপ্রীতি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেছিল। তাই তিনি তাঁর পত্রে পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে ইংলণ্ডে বেকনের জীবন-দর্শন প্রচার না করে যদি মধ্যযুগের ধর্মশিক্ষার গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরে থাকা হত, তা হলে ব্রিটিশ জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি কি সম্ভব হত? রামমোহন নিজে ক্ল্যাসিক্যাল স্কলার ছিলেন, সংস্কৃত আরবী ফার্সীতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, এবং সেই পাণ্ডিত্য তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে অর্জন করেছিলেন। সুতরাং সংস্কৃতবিদ্যার প্রতি তাঁর

বিশেষ কোনো অশ্রদ্ধা ছিল না, এবং সেই অশ্রদ্ধার জন্ত তিনি আমহার্স্টকে পত্র লেখেননি। তাঁর ভয় ছিল যে ইংরেজরা এদেশে আধুনিক ইয়োরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসার কামনা করেন না, তার বদলে সেকালের শাস্ত্র-বিদ্যার পুনরুজ্জীবন কামনা করেন। এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর ঐতিহাসিক পত্রখানিতে ফুটে উঠেছে। পরবর্তীকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি আমূল সংস্কার করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং বারাণসী সংস্কৃত কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইনের সঙ্গে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর যে বাদানুবাদ হয়েছিল, তার মধ্যে এমন অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন যা রামমোহনের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। বোঝা যায়, শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের হিউম্যানিস্ট আদর্শের উত্তরসাধক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহনকে যদি নবযুগের বাংলার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দীক্ষাগুরু বলা যায়, তা হলে বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বলা যেতে পারে, যিনি হিউম্যানিস্ট বিদ্যাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন, এবং যাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশে সত্যকার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের একটা প্রভাব-শালী গোষ্ঠী উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে গড়ে উঠেছে।

রামমোহনের আশঙ্কা যে ভিত্তিহীন ছিল না তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে অ্যাংলিসিস্ট ও ওরিয়েণ্টালিস্ট, এই দুই গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের বাদানুবাদেই প্রমাণিত হয়েছিল। ১৮৩৫ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের শিক্ষাসংক্রান্ত বিখ্যাত 'মিনিটে' এই বাদানুবাদের অবসান হয়ে যায়। মেকলে স্পষ্ট ভাষায় বলেন: **"The literature of England is now more valuable than that of Classical antiquity."**—এবং এদেশের ক্ল্যাসিক্যাল শাস্ত্রবিদ্যার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেন:

> **··can we reasonably or decently bribe men, out of the revenues of the State, to waste their youth in learning how they are to purity themselves after touching an ass, or what texts of the Vedas they are to repeat to expiate the crime of killing a goat ?**

মেকলে ও বেণ্টিঙ্কের প্রস্তাবে ১৮৩৫ সাল থেকে ইংরেজি শিক্ষা সরকারী নীতি হিসেবে গৃহীত হয়, এবং তার ফলে বাংলার সমাজে অ্যাংলিসিস্ট

বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি যে খুব দ্রুতহারে হয়নি তা হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যার হারবৃদ্ধি থেকে বোঝা যায়। ইংরেজি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান তখন হিন্দুকলেজ, অতএব তার ছাত্রসংখ্যা থেকে এদেশের অ্যাংলিসিস্ট বুদ্ধিজীবীদের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮২৪-২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় আট বছর ছাত্রসংখ্যা গড়ে একশোর বেশি হয়নি। ১৮২৭-২৮ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা ৩৫০ থেকে ৫৫০ পর্যন্ত হয়েছিল, অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৪৫০ বলা যায়। এই ৪৫০ ছাত্রসংখ্যা থেকে বোঝা যায়, বাংলা দেশে সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ও ধনিক পরিবারের সংখ্যা, উনিশো শতকের মাঝামাঝি, কলকাতা শহরে খুব বেশি হয়নি। এই সঙ্কীর্ণ ধনিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই তখন আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিল বললে ভুল হয় না। ১৮৫৪ সালের Wood's Despatch-এ যে শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়, তাতে এই কথা আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়:

> ...By the division of University Degrees and distinctions into difficult branches, the exertions of highly educated men will be directed to the studies, in future necessary to success in the various active professions of life. We shall therefore have done as much as a government can do to place the benefits of education plainly and practically before the higher classes of India.

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Degree' ও 'Distinction'-এর উদ্দেশ্য হল—'success in the various active professions of life'। এই কথা জানিয়ে চার্লস উডের Despatch-এ পরিষ্কার ঘোষণা করা হল যে এই উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও উপকারিতা কেবল ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই পাবেন অর্থাৎ ব্রিটিশ-সরকারের উদ্দেশ্য হল, এদেশে এমন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী গড়ে তোলা যাঁরা প্রধানত তাঁদেরই আদর্শ ও নীতির সমর্থক হবেন। ব্রিটিশ শিক্ষানীতির ফলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে তৃতীয় পাদের মধ্যে বাংলা দেশে একটা 'Upper Class Intellectual Aristocracy' গড়ে উঠেছিল এবং সেটা হিন্দুপ্রধান। এই অভিজাত এলিটশ্রেণীর বংশধরেরাই স্কলার ও টিচার হয়েছেন, সিভিল সারভেন্ট, সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি,

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, গ্রন্থকার ও সাংবাদিক হয়েছেন, এবং তাঁরাই ক্রমবর্ধমান বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর 'লীডার' ও 'গাইড' হয়েছেন।

তা হলে এ যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারাটি, গোষ্ঠী-বিন্যস্তরূপে, মোটামুটি এইভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে :

প্রধান দুটি বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী হল : পাশ্চাত্ত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদী, যাঁদের সাধারণভাবে অ্যাংলিসিস্ট ও ওরিয়েণ্টালিস্ট বলা হত। ওরিয়েণ্টালিস্টদেরই আমরা ট্রেডিশনালিস্ট বলতে পারি। হিউম্যানিজম কথার পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক অর্থে, এই দুই গোষ্ঠীতেই আধুনিক হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর বিকাশ হয়েছিল। বাস্তববুদ্ধি ও মানবপ্রধান চিন্তার দিক থেকে পাশ্চাত্ত্যবাদীদের যেমন 'হিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবী বলা যায়—তেমনই এইদিক থেকে বিচার করে এদেশের অনেক ক্ল্যাসিকাল পণ্ডিতকেও 'হিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবী বলা যেতে পারে। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র—এঁরা ছিলেন পাশ্চাত্ত্যবাদী হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর অগ্রগণ্য। এঁদের হিউম্যানিজমের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মিশ্রণ একটু বেশি ছিল। রামমোহন রায় ও তাঁর 'আত্মীয় সভা'-গোষ্ঠী থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যগোষ্ঠী পর্যন্ত আরও একটি হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর বিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়, যাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য হিউম্যানিজম ও আমাদের দেশীয় ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিজমের আনুপাতিক সংমিশ্রণ হয়েছিল, এবং সেইজন্য তাঁরা মডারেট (moderate) উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও একটি উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছিল একই পথে। তাঁরা তাঁদের জীবনে ক্ল্যাসিকালবিদ্যা ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন। এই ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অনেকে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের দিক

থেকে তো নিশ্চয়, প্রখর বাস্তববুদ্ধির দিক থেকেও, এদেশীয় এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগোষ্ঠী নবযুগের আদর্শ হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। এ ছাড়া আর একদল বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী বরাবরই ছিলেন যাঁরা অন্ধ ঐতিহ্যপন্থী। এঁরা আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বলতেন যে সবই শাস্ত্রে আছে, এবং শাস্ত্রে যা নেই তা বুদ্ধি ও বিদ্যার বিচারবহির্ভূত।

মোটামুটি এই চারটি গোষ্ঠীতে বাংলার আধুনিক বিদ্বৎসমাজ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যবাদী বা ইংরেজিশিক্ষিত হিউম্যানিস্টদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল—একটিকে Radical এবং আর একটিকে Moderate-গোষ্ঠী বলা যায়। ডিরোজীয়ান বা ইয়ং বেঙ্গল ও তাঁদের অনুগামীরা Radical-গোষ্ঠী ছিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনীর দল Moderate-গোষ্ঠী ছিলেন। এদেশীয় ক্ল্যাসিকালবিদ্যার পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা হিউম্যানিস্ট ছিলেন তাঁরা সকলেই প্রায় মতামত ও আদর্শের দিক থেকে Moderate ছিলেন। তাই দেখা যায়, সমাজসংস্কার শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি আদর্শগত সংগ্রামের ব্যাপারে এই তিন গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবী প্রায় সব সময়ই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন সামাজিক আদর্শগত ঐক্য ছিল, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও মিল ছিল। বিত্ত ও বিদ্যা দুটিকেই সকলে নবযুগের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদালাভের অপরিহার্য মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনপন্থী, ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে অনেকে বুদ্ধিজীবীসমাজে যতখানি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, বণিক-সমাজেও তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম প্রতিষ্ঠা পাননি। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে বেশ প্রতিপত্তিশালী স্বাধীন ব্যবসায়ী ও জমিদার ছিলেন। ক্ল্যাসিক্যাল হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতো দু-একজন অবাধ বাণিজ্যের উৎসাহে বণিকশ্রেণীর অনেককেই হার মানিয়ে দিয়েছিলেন। বাকি যাঁরা পণ্যের বাণিজ্য করেননি, তাঁরা কতকটা বণিকের মনোভাব নিয়ে নিজেদের অর্জিত বিদ্যাকে বাণিজ্যের পণ্যে পরিণত করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত। বাংলা দেশে মুদ্রণ ও পুস্তক-প্রকাশনার ব্যবসায়ে, এবং পত্রপত্রিকা পরিচালনায় এঁরা প্রথম যুগের উদ্যোগীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। এ ছাড়া সরকারী

চাকরি অধ্যাপনা ইত্যাদি করে অনেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছেন, এবং সেই অর্থের জোরে সমাজের উচ্চমধ্যবিত্ত স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এইভাবে নবযুগের বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠির বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যা ও বাণিজ্যের দৌলতে নিজেদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করে, সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন।

হিউম্যানিজমের অন্তর্নিহিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের গুরুত্ব এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাছে বড় ছিল বটে, কিন্তু মার্টিনের ভাষায় বলা যায়:

> More and more it came to mean intellectual *studium*··· signifying initiative and ability, and all forms of dynamic striving by the individual.

বিত্ত ও বিদ্যাই যে সমস্ত সামাজিক শক্তি ও প্রভাবপ্রতিপত্তির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল—বিত্তহীনের বিদ্যা নয়, বিত্তবানের বিদ্যা—তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিত্ত ও বিদ্যার মিলন সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন:

> It became more and more generally accepted that only their union within one man would allow, especially in politics, the most complete exploitation of all ways of using power.

বাংলার বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক, কোনো ইতিহাসেই এই নিয়মের তেমন ব্যতিক্রম হয়নি। উনিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশের সমস্ত বড় বড় বিদ্বৎ-সভাগুলির পরিচালক মণ্ডলীর সামাজিক শ্রেণীবিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাঁরা বিদ্বান ও বিত্তবান দুই-ই, তাঁরাই প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। রামমোহনের আত্মীয়-সভা থেকে আরম্ভ করে গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, সুহৃদ্ সমিতি, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কেশবচন্দ্র সেনের Good-will Fraternity ও সঙ্গত সভা প্রভৃতি সমস্ত বিদ্বৎসভায় এই উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধি-জীবীরাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। এই বিদ্বৎসভাগুলিই ছিল নবযুগের আদর্শ প্রচারের প্রধান প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম এবং এইগুলির ভিতর দিয়েই বুদ্ধিজীবীরা সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে তাঁদের নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ দিকে বুদ্ধিজীবীদের এই উচ্চমধ্যবিত্ত

সামাজিক ভিত্তি ক্রমে প্রসারিত হয়েছে বটে, কিন্তু সামাজিক ইনস্টিটিউশনের নেতৃত্ব প্রধানত বিত্তবান বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর হাতেই থেকেছে। সেইজন্য দেখা যায় বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের ধারা কোনসময়ই একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে তরঙ্গায়িত হয়ে যায়নি। রামমোহনের আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গল দলের আন্দোলন, দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের আন্দোলন, কেশবচন্দ্র সেনের আন্দোলন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী-আনন্দমোহন বসু-বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির সংস্কার-আন্দোলন, প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজের একটা স্তরের মধ্যেই সঙ্কীর্ণ বৃত্তাকারে প্রসারলাভ করেছে। শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উচ্চ-মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, তা আরও বিস্ময়কর মনে হয়। বিদ্যাসাগরের মতো হৃদয়বান নির্ভীক সমাজসংস্কারকও মেকলের filtration policy-র অসহায় victim হয়ে, নিজের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিক সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং জনশিক্ষা ও শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষার নীতি প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। কেশবচন্দ্র সেনের মতো তেজস্বী সংস্কারক কতরকমের পরস্পরবিরোধী আদর্শের আবর্তে পড়ে শেষ পর্যন্ত দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাও আমরা জানি। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের সমস্যায় প্রবল আন্দোলন বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে হওয়া সত্ত্বেও, উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ কিভাবে তাঁর প্রেতাত্মা খুঁড়ে তুলে, তীব্র বাদানুবাদের মধ্যে নিজেদের রক্ষণশীল হিন্দুভাবপ্রধান মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, তা ভাবলেও মাথা হেঁট হয়ে আসে। আর আদর্শের দিক থেকে যাঁরা হিন্দু অবতারবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও এই একই মনোভাব জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আগাগোড়া ব্যক্ত হয়েছে। এইভাবে দেখা যায়, নবযুগের বাংলার বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীগত চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব, বাংলার সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ধারাকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই নিয়ন্ত্রণ অবশ্য ঐতিহাসিক নিয়মানুগত, যদিও তার সংকীর্ণতা স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

বিদ্যা বিদ্বান বিদ্যালয় বিদ্যার্থীবিদ্রোহ

বাংলার লোককবি রূপচাঁদ পক্ষী তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর বিবাহবর্ণন' কাব্যে বিদ্যা বিদ্বান বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু বিবাহের বর্ণনায় বিদ্যার বিবরণ কেন? বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের কথা কেন? এনট্রান্স, এল.এ., বি.এ., এম.এ. পাসের কথাই বা কেন? 'ছেলে হলে গুণবন্ত, এক রাত্রে হতেম ভাগ্যবন্ত', কিন্তু ভাগ্য মন্দ তাই 'পোড়াকপালী' (অর্থাৎ সহধর্মিণী) 'ভ্যাড়াকান্ত ধরে গর্ভেতে'। কেন এই আক্ষেপ! কারণ কবি রূপচাঁদ পক্ষী একশো বছর আগেই সমাজে বিদ্যার সঙ্গে টাকার অঙ্গাঙ্গিতার সম্পর্ক দেখেছিলেন। ব্রিটিশ আমলের বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন জ্ঞানবিদ্যার পাঠ তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা চলে। তার মধ্যেই তিনি পাস-করা বিদ্বানদের বাজারদর দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। বিদ্যার বাজারদর আছে, যেমন চাকরির বাজারে, তেমনি বিবাহের বাজারে। 'একপেশে (এনট্রান্স), 'দোপেশে' (এল. এ.), 'তেপেশে' (বি.এ.), 'চারপেশে' (এম্.এ.)—যার যে রকম বিদ্যা এবং যে-যে রকম বিদ্বান, সেই অনুপাতে তার বাজারদর। তখন 'চারপেশে'র বাজারদর ছিল তেজী, যেমন আজকাল আই. এ. এস. আর এঞ্জিনিয়ারদের। তাই রূপচাঁদ বলেছেন, বিবাহবাজারে 'চারপেশে কর্ত্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্ব্বভক্ষ'।*

কেবল জ্ঞানের কথা নয়, রূপচাঁদ বিজ্ঞানের কথাও কিছু বলেছেন, সমাজ-বিজ্ঞানের কথা। যেমন সমাজবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন :

> **Priest and feudal noble were displaced from their hegemony by the new economic power of money and the indirect beneficiary of the power of money, the independent intellect.**[১]

ধনতান্ত্রিক যুগের আবির্ভাবে নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর মতো নতুন বিদ্বানশ্রেণী

---

* বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র-৪' ; রূপচাঁদ পক্ষী : সঙ্গীত রসকল্লোল।

(স্বাধীন!) টাকার অর্থনৈতিক আধিপত্যে লাভবান হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। টাকা ও বিদ্যার এই অঙ্গাঙ্গিভাবের কথা আরও অনেক সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন (যেমন সিমেল, ভেবলেন, হ্বেবার, ম্যানহাইম)। আমাদের সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে কম্প্রাডোর বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে নব্যবিদ্বানশ্রেণীও অর্থনীতিক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, এমনকি অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ইংরেজতোষণের জোরে অর্থলাভের দিক থেকে মুচ্ছুদ্দি বেনিয়ানদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বাংলা দেশে বিশেষ করে, বিদ্বানদের দু-টি বাজার রীতিমতো জমজমাট হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলে, একটি চাকরির বাজার, আর একটি বিবাহের বাজার। ইংরেজরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরীক্ষাপাস' ও 'ডিগ্রি' বিদ্যার মাপকাঠি বলে ঘোষণা করলেন এবং তার দ্বারা চাকরির বাজারদরও নির্ধারিত হতে থাকল, তখন আমাদের পণপ্রথাবদ্ধ ফিউডাল সমাজে বিয়ের বাজারে ও বিদ্বানপাত্রের দর চড়ে গেল। তার উপর বিদ্বান যদি সরকারী চাকরে হন তাহলে তাঁর দর আরও বেশি। ব্রিটিশ আমলের পর ভারতীয়দের রাজত্বে বিদ্বানদের চাকরির বাজার হালে মন্দা হলেও, বিবাহের বাজার যে বিশেষ মন্দা হয়নি তা আজকের দিনেও খবরের কাগজে 'পাত্রপাত্রী'র বিজ্ঞাপনের বাইশহাত বহর দেখলে বোঝা যায়। আজকাল অনেক সময় বিদ্বানদেব অবশ্য বিবাহের বাজারের ভিতর দিয়েও চাকরির বাজারে পৌঁছতে হয়। বেকার শিক্ষিত যুবকের ভাগ্যে যদি নিরাকার ব্রহ্মের মতো মহাশক্তিমান শ্বশুরলাভ ঘটে, তাহলে চাকরির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে উচ্চপদাভিষিক্ত হওয়ার আর কোনো সমস্যা থাকে না।

কিন্তু কবি খগপতি 'বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হল নির্মূল, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সুরু যে হতে' বলে যে 'inter-caste mobility'-র ইঙ্গিত করেছেন, তার সামান্য লক্ষণ বাঙালি সমাজে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে দেখা গেলেও, সেটা সামাজিক বাস্তব সত্যে কদাচ পরিণত হয়নি, আজ পর্যন্ত না। খুব সংগত ঐতিহাসিক কারণেই হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে আমাদের দেশের ফিউডাল সমাজের মূল অর্থ নৈতিক ও সামাজিক গঠনের পরিবর্তন হয়নি, ধনতান্ত্রিক যুগের নতুন 'economic power of money'-র ভিত্তির ওপর কেবল তা পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। অতএব ফিউডাল সমাজের মূল্যবোধ ভালমন্দবোধ নীতিবোধ বিচারবোধ জাতিবর্ণভেদ ধর্মবৈষম্য প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক সাংস্থানিক শক্তির উৎস আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়েছে, দুর্বল

বা নিষ্ক্রিয় হয়নি। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই, পূর্বোক্ত 'পাত্রপাত্রী'র বিজ্ঞাপনই বড় প্রমাণ। যত বড় ডিগ্রিধারী বিদ্বান পাত্র বা পাত্রী হন না কেন, আজকের দিনেও বিজ্ঞাপনে জাতিবর্ণের উল্লেখ থাকে প্রথমে, তারপর বিদ্যা চাকরি ও পণের প্রলোভন। উনিশ শতকের রূপচাঁদের কালের কথা নয়, বিশ শতকের একাত্তরের কথা। কাজেই টাকা ও বিদ্যা পাশ্চাত্ত্য সমাজে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণকালে যে ব্যাপক ভাঙাগড়ার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আমাদের ভারতীয় সমাজে তা করতে পারেনি। তার প্রথম কারণ পাশ্চাত্ত্য সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য আছে, এবং দ্বিতীয় কারণ বৈদেশিক পরাধীনতার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক সমাজের অগ্রগতির স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দধারা ব্যাহত হয়েছে। তার জন্য 'টাকা ও বিদ্যা' ব্রিটিশ রাজত্বকালে ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়কালের ভাঙাগড়ার শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেও, আমাদের সমাজে কোনো মৌল রূপান্তর ঘটাতে পারেনি, পুরাতন ফিউডাল গড়নের মধ্যে নতুন বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে মাত্র। অর্থাৎ টাকা ও বিদ্যা দুই-ই একধরনের নতুন শ্রেণীবৈষম্য (class-hierarchy) রচনা করেছে পুরাতন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়ের বৈষম্যের (caste-community-hierarchy) মধ্যে। বিত্তবান ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক সদ্গোপ মাহিষ্য এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিত সমবর্ণের মধ্যে শুধু জাতিবর্ণগত বৈষম্য নয়, এক নতুন ধরনের বিত্তগত ও বিদ্যাগত শ্রেণীবৈষম্যও রচিত হয়েছে। তেমনি হয়েছে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। বিত্তের মতো বিদ্যাও শ্রেণীগত বৈষম্যের মানদণ্ড হয়েছে, পুরাতন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। তার ফলে আমাদের সমাজ আরও বেশি খণ্ডিত বিভক্ত ও বৈষম্য ভারাক্রান্ত হয়েছে, যেহেতু বিদ্বানদের সঙ্গে বিত্তবানদের অঙ্গাঙ্গিতা ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে।

মোটকথা টাকা মহত্তর সত্য, জ্ঞানবিদ্যা টাকার উপাসক। প্রসঙ্গত আমেরিকান লেখক এডগার স্নো-র সঙ্গে নব্যচীনের ছাত্রীদের কথোপকথনের কথা মনে পড়ছে :[২]

ছাত্রীরা : আপনাদের দেশে গরীব চাষীরা কি কলেজে পড়ে ?

স্নো : না, গরীব চাষীরা পড়ার তেমন সুযোগ পায় না, কারণ কলেজে পড়তে টাকা লাগে তো !

ছাত্রীরা : ঐখানেই তফাৎ। আমাদের দেশে শিক্ষার জন্ত টাকা লাগে না, এবং শ্রমিক ও চাষীরা সর্বপ্রথম শিক্ষার সুযোগ পায়। আমেরিকায় কলেজের শিক্ষা হল ধনিকদের ছেলেদের জন্ত, এবং তার লক্ষ্য হল টাকা রোজগার করা।

স্নো : ঠিক ঐভাবে না বলে, বরং বলতে পার যে আমেরিকায় কলেজ চালানো হয় ছাত্রদের টাকা রোজগারের কৌশল শেখাবার জন্ত—'it's more accurate to say they are run to *teach students* how to make money.'।

সোজা কথাবার্তা, সহজবোধ্য, কোনো টীকার প্রয়োজন নাই। তাই দেখা যায় আজকাল ধনতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার-ধনবিজ্ঞানই অন্যতম গবেষণার বিষয়। শিক্ষার সাইকোলজির কথা অনেকদিন ধরেই আমরা জানি। বিদ্বানরা অনেক বড় বড় বই শিক্ষার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন, মানুষের বুদ্ধি (I. Q.) মাপা থেকে আরম্ভ করে অবাধ্য উশৃঙ্খল বিদ্রোহী ছাত্রদের মনোরাজ্যে সার্চলাইট ফেলে তাঁরা অনেককিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অবশ্য তাতে মানুষের বুদ্ধি বাড়েওনি কমেওনি, শুধু বোঝা গেছে যে আই. কিউ. টেস্ট হল শিক্ষা-ক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখার একটা কৌশল বিশেষ। তাছাড়া মনো-বিজ্ঞানীদের মহাসমুদ্রবৎ গভীর জ্ঞানদান সত্ত্বেও দেখা যায় যে পৃথিবীর কোনো দেশে (ধনতান্ত্রিক) অবাধ্য অশান্ত বিদ্রোহী ছাত্ররা শান্তশিষ্ট গোপাল হয়ে যায়নি, বরং তাদের বিদ্রোহ ক্রমেই ব্যাপক ভয়াল মূর্তি ধারণ করেছে এবং ভোগের স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি। পরে সেকথা বলছি। কাজেই কেবল সাইকোলোজিতে আর কুলোচ্ছে না। এখন শিক্ষার সোসিওলজি, শিক্ষার টেকনোলজি প্রভৃতি অনেক নতুন বিদ্যার আমদানি হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হলো শিক্ষার অর্থনীতি (Economics of Education) এবং কেন প্রধান তার যুক্তি এই :[৩]

> The costs of schooling and the money returns resulting from investment in schooling are currently receiving more and more attention by economists, not only because of their possible implications for economic growth, but also because they may help individuals to determine how much they should invest in the development of their own human capital.

আধুনিক ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিকাল সমাজ, যার মডেল আমেরিকা, তার অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে শিক্ষার মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব টেকনোলজি এবং সবার উপরে শিক্ষার অর্থনীতি। তার কারণ বর্তমানের বিশাল ধনতান্ত্রিক সমাজের জটিল টেকনোস্ট্রাকচার চলমান রাখার জন্য বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এত বিচিত্র রকমের বিদ্বান উৎপাদনের প্রয়োজন হয়েছে আজ, এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক কারণে এতরকম বিষয়ে গবেষণার তাগিদ বেড়েছে যে শিক্ষার দর্শন (Philosophy) ও আদর্শনীতির (Ideology) চেয়ে শিক্ষার লাভলোকসানগত অর্থনীতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। Manpower রিসার্চের ইনস্টিট্যুট ধনতান্ত্রিক ও তার আশ্রিত দেশগুলিতে (যেমন ভারতবর্ষে) গড়ে উঠেছে।[৪] প্রধানত আমেরিকার শিক্ষাটেকনোলজির বিশেষজ্ঞরা এই সমস্ত সংস্থার ফিলজফার ও গাইড। এঁরা সমাজের সমস্ত মানুষকে 'মূলধন' মনে করেন, একেবারে পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'capital' অর্থে এবং বলেনও 'human capital'।[৫] এই human capital-এর 'investment dimension', 'consumption dimension' এবং 'social demand' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁরা অনুসন্ধান অনুশীলন করেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর রাষ্ট্রনায়কদের শিক্ষানীতি (educational policy) এবং শিক্ষাপ্রকল্প (educational planning) অনেকটা নির্ভর করে। অর্থনীতির সূত্রের মতো শিক্ষানীতির কয়েকটি সূত্রও গবেষকরা রচনা করেছেন। যেমন একটি সূত্র হল, কোনো দেশে শিক্ষার সামাজিক চাহিদা যদি অর্থনৈতিক গতির manpower-এর প্রয়োজনের চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। বিষয়টাকে সাধারণ অর্থনীতির ডিমাণ্ড সাপ্লাইয়ের সূত্র অনুযায়ী বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নপরিকল্পনায় শিক্ষিত বা বিদ্বান কর্মীদের যে চাহিদা থাকে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানা থেকে বিদ্বানদের উৎপাদন হতে থাকে, তাহলে কর্মের বাজারে বিদ্বানদের দর কমে যায়, এমনকি অত্যধিক সাপ্লাই হলে বিদ্বানরা বেকার অবস্থায় অবিক্রীত পণ্যের মতো গুদামজাত হয়েও থাকতে পারেন। ভারতের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বর্তমানে গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিদ্যার অর্থনীতিটাই প্রধান, ইডিওলজি (বিশুদ্ধ জ্ঞান

অর্থে) নয়। বিদ্যাব্যবস্থার সঙ্গে প্রচলিত সমাজরাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক ইতিহাসে চিরদিনই ছিল, বর্তমানে শুধু তার জটিলতা বেড়েছে। সেই জটিলতার ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিদ্যাবিদ্বানবিদ্যালয়ের সম্পর্ক অনেক সময় পরিষ্কার দেখা যায় না, তাই তাদের 'স্বাধীন' অস্তিত্ব সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের মতো অধ্যাসের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাভাবনার উদ্ভট মিশ্রসমাজে বিদ্বানমহলে এই বিভ্রমের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকে আজও মুনিঋষি ও মনীষীদের বচন আবৃত্তি করে বিদ্যাকে তপোবনের পরিবেশে স্থাপন করতে চান। বিদ্যাবিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁদের এই অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহদের আমলের ধ্যানধারণা বিশেষ যে বদলায়নি তা আচার্য উপাচার্য অধ্যাপকদের নিয়মিত ভাষণ থেকে এবং মহাজ্ঞানীদের এক-ঘেয়ে জ্ঞানদানের ঘ্যানঘ্যানানি থেকে বোঝা যায়। তবু বিদ্বানদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সুবুদ্ধিমান যাঁরা আছেন তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে বর্তমানের বিদ্যাসংকট বিদ্বান-সংকট বিদ্যালয়সংকট কোনো বিচ্ছিন্ন বিষফোড়া নয়, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের শিরায় শিরায় বিষাক্ত রক্তপ্রবাহের বাহ্যপ্রকাশ। কিন্তু বুঝেও না-বোঝার ভান করে তাঁরা ধোঁয়াটে কথার অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকেন, হয়ত তাঁদের বিদ্যাভিমান সামাজিক সত্যের স্বীকৃতি ও বলিষ্ঠ প্রকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যাভিমান ছাড়াও টাকার স্বার্থ, অর্থাৎ চাকরির স্বার্থও বড় বাধা হতে পারে। তাই বলে তাঁদের খাতিরে একথা স্বীকার করতে বাধে যে বর্তমানে বিদ্যা বিশুদ্ধ, জ্ঞান নিরপেক্ষ, বিদ্বান সর্বজনপূজ্য এবং বিদ্যালয় বিশ্ব-বিদ্যালয় পবিত্র দেবমন্দির।

'Dare to know !' দার্শনিক কান্টের উক্তি এবং 'know' থেকে 'knowledge'। জানবার জন্য অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য দুঃসাহসী হও। সর্বনাশ ! যেখানে নোটবই পড়লে, সাজেসন্‌স মুখস্থ করলে, কোচিংক্লাসে ঠিকেদার মাস্টারদের টাকা দিলে শিক্ষক অধ্যাপকদের মোসাহেবি করলে পরীক্ষায় পাস করে যা জানবার সবই জানা যায়, সমস্ত জ্ঞান ট্যাবলেটের মতো গিলে ফেলা যায়, তখন জ্ঞানের জন্য দুঃসাহসী হওয়াটা আবার কি ! আসলে ব্যুরোক্রাসির পেষণে dare to know-এর যুগ শেষ হয়ে গেছে। ব্যুরোক্রাসির প্রতাপ সর্বত্র সমান, শ্মশান থেকে কর্পোরেশন, সরকারী অফিস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও কমবেশি নেই। জ্ঞান বিদ্যার শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটেছে এই আমলাতান্ত্রিক জগদ্দলের চাপে। বিদ্বানদের ব্যুরোক্রাসি প্রশাসনিক ব্যুরোক্রাসির চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক। বিদ্যালয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগারে ও শিক্ষাসংস্থায় জরদ্গব বিদ্বান-ব্যুরোক্রাটদের কুটিল চক্রান্তে কত বলিষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষা ও প্রতিভার যে অপমৃত্যু ঘটেছে ও ঘটছে তার হিসেব নেই। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন গবেষণা, নতুন জ্ঞানলাভের অভিযান, বিদ্বানদের আমলাতন্ত্রে নিষিদ্ধ। এই বিদ্বান ব্যুরোক্রাটরা সমাজের শাসক শ্রেণীর আদর্শ ও চিন্তাভাবনার ধারক বাহক। অতএব তাঁদের সেই চিন্তা ও আদর্শের গণ্ডির মধ্যে যাঁরা বিচরণ করতে পারবেন না, তাঁরা যতবড় জ্ঞানীগুণী হন না কেন, সমাজে তাঁরা প্রত্যাখ্যাত ও অবহেলিত হতে বাধ্য। আর তাঁরা যদি চাকরিজীবী হন, তাহলে তাঁদের পদোন্নতির চেয়ে পদচ্যুতির সম্ভাবনাই বেশি।

এর মধ্যে 'free intellect'? যেমন আমেরিকার 'ফ্রি সোসাইটি'—যেখানে দুস্তর শ্রেণীবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক যাদুবলে নাকি শ্রেণীসংঘাত বিলীয়মান এবং জনসন নিক্সনদের মতে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগসুখের স্বর্গরাজ্যে সতত বিরাজমান, এবং যে-সাম্য ও স্বাধীনতা উপঢৌকন দেবার জন্ত আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমিক শাসকদের ভিয়েতনাম পর্যন্ত সামরিক অভিযান—ঠিক তেমনি 'ফ্রি ইনটিলেক্‌ট', অর্থাৎ 'ফ্রি' যদি বিদ্বান বুদ্ধিমানরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি বন্ধক দিয়ে এই 'ফ্রি সোসাইটি'র উপজীব্য যোগান, সেবা করেন, নচেৎ ফ্রি নয়।

*

অতএব বিদ্যা বিদ্বান অথবা তার উৎপাদনকেন্দ্র বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কেউ স্বাধীন নয়, স্বতন্ত্র নয়, পবিত্র নয়, সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। যেমন সমাজ তেমনি বিদ্যা। যেরকম সমাজের চেহারা, ঠিক সেইরকম বিদ্বানের চেহারা। যেরকম সমাজের গড়ন, সমাজের নীতি, ঠিক সেইরকম বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ন ও নীতি। সমাজের বাজার বা মার্কেট আছে, বাজারী অর্থনীতি বা 'মার্কেট ইকনমি' আছে, বিদ্যারও বাজার আছে, বিদ্বানদেরও বাজারী অর্থনীতি আছে। পণ্যের বাজারে যেমন বিজ্ঞাপননির্ভর প্রতিযোগিতা আছে, যার বিক্রয়কৌশল যত আকর্ষণীয় তার তত বেশি কাটৃতি, তেমনি বিদ্যার বাজারেও প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু তা যত গুণনির্ভর নয়, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞাপননির্ভর, অর্থাৎ বিদ্যাবেচার ও বিদ্যাকেনার কৌশল বা অপকৌশল যার যত বেশি আয়ত্তে, সেই বিদ্বানের ভাগ্য বাজারে তত বেশি উঠ্‌তি। বিদ্যাবেচার কৌশল সর্বজনবিদিত। বিদ্যাকেনার কৌশলের কথা শুনে অন্তত আমাদের দেশের লোক বিস্মিত হবেন

না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে (যেমন বিহারের), শিক্ষাসমস্যার সেমিনারে, টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কেনার পর্যন্ত অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, ডিগ্রি অনুপাতে টাকা। যেমন ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে :

> **Institutes and colleges affiliated to Bhagalpur University carry a bad reputation and the University itself has in the past been a convenient place for persons to buy a degree at Rs. 175 or more.**

যেখানে টাকার লেনদেন কম, অথবা পরোক্ষ, সেখানে বিদ্বানদের মোসাহেবি না করে বিদ্যার্থীদের উপায় নেই। তার ফলে গবেষণা ও তার ডিগ্রি পর্যন্ত ক্রমেই সারশূন্য হয়ে গেছে। একথা আমাদের ভারতসরকার নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও (১৯৬৬) বলা হয়েছে। পরে এসব কথা আসবে। আপাতত একথা মানতেই হবে যে সমাজের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গি। যে-সমাজের শিকড় পর্যন্ত পচে গেছে, যার প্রতিটি অঙ্গে বিষাক্ত বিস্ফোট, তাকে যেমন কোনো সংস্কার-চিকিৎসায় (reform) সুস্থ-সবল করা যায় না, তেমনি তার দেহলগ্ন বিদ্যাব্যবস্থার বাহ্যসংস্কারেও কোনো সুফল ফলে না। জীর্ণ বস্ত্রের মতো জীর্ণ সমাজ পরিত্যাজ্য, দক্ষতম দর্জির রিপুকর্মেও তা ব্যবহার্য নয়। তেমনি তার বিদ্যাব্যবস্থাও আমূল পরিবর্তনীয়, যা সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া কখনো সম্ভব নয়।

এবার বিদ্যাসংকটের প্রকৃত রূপটা কিরকম দেখা যাক। প্রথমেই বলা দরকার যে এই বিদ্যাসংকট হল প্রধানত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের সমস্যা, যেমন আমেরিকা ইংলণ্ড ফ্রান্স ইত্যাদি, এবং অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশ যারা উন্নয়নের পথে এই সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে তাদের সমস্যা। সমাজতান্ত্রিক দেশে এই সমস্যা বা সংকট নেই, যে-সমস্যা আছে তার স্বরূপই আলাদা—সোভিয়েট রাশিয়াতেও নেই, চীনেও নেই, দুটি বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বর্তমানে নীতিগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন। লক্ষণীয় হল, অত্যুন্নত ও অনুন্নত অথবা উন্নতিশীল ধনতান্ত্রিক সমাজে এই শিক্ষাসংকটের মূল পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই তো বটেই, উপরন্তু সেই সংকটের বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রসমাজের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের চেহারাও প্রায় একরকম। যেমন আমেরিকার ইংলণ্ডে ফ্রান্সে, তেমনি আমাদের

ভারতবর্ষে, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মধ্যে হিংসাত্মক নাশকর্মই বেশি। তাই কেউ কেউ বলেছেন, 'This is a world educational crisis' এবং যে-কোনো 'food crisis' অথবা 'military crisis'-এর চেয়ে তা কম বিপজ্জনক নয়।৬

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের গোড়া থেকে, সারা পৃথিবীব্যাপী শিক্ষার এত দ্রুত প্রসার হতে থাকে যা ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি। অনেক দেশে বিদ্যার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যায়, শিক্ষাখাতে খরচ দ্রুতহারে বাড়তে থাকে এবং ক্রমে শিক্ষা রীতিমতো একটা বড় 'ইণ্ডাস্ট্রি' হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসারের গতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। কিন্তু শিক্ষার এই প্রসারমান আলোকরাজ্যের পাশে অশিক্ষার অন্ধকারও ক্রমে বিস্তীর্ণ জনসমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। জনসংখ্যার যত বৃদ্ধি হতে থাকে, তত দেখা যায় অশিক্ষিত নিরক্ষর, লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে (ধনতান্ত্রিক) বেড়ে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেখা যায় প্রায় ৪৬ কোটির বেশি লোক (adult) অশিক্ষিত ও নিরক্ষর যা তাদের মোট কর্মক্ষম লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ (১৯৬৮-৬৯)। ধনতান্ত্রিক জগতের শিক্ষার এই রেখাচিত্রের মধ্যে শিক্ষাসংকটের রূপটিও পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। সেই রূপটা কি? একদিকে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, আর একদিকে অশিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার। যদি শ্রেণীগতভাবে বলা যায় তাহলে বলতে হয় যে ধনতান্ত্রিক সমাজ আজ বিদ্যার দিক থেকেও দু-টি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, একটি বিদ্বানশ্রেণী, আর একটি মূর্খশ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আগেই বলেছি, যেমন সমাজের চেহারা, তেমনি হবে তার শিক্ষার চেহারা। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজের বর্তমান রূপের সঙ্গে তার এই শিক্ষারূপের সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির আশ্চর্য উন্নতির ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে অপরিমিত ভোগের মধ্যেও ধনবৈষম্য অনেক বেশি বেড়েছে ও বাড়ছে। অর্থাৎ ধনিকশ্রেণীর মধ্যে যেমন অতিধনিক মধ্যধনিক ও ধনিকদের স্তরবিন্যাস হচ্ছে, বিত্তশালী মধ্যবিত্তের প্রসার হচ্ছে, তেমনি দরিদ্রশ্রেণীরও ক্রমবিস্তার হচ্ছে। বিদ্যার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হচ্ছে। বিদ্যার প্রসার ও বিদ্বানের সংখ্যাবৈচিত্র্য যেমন বাড়ছে, কতরকমের টেকনোলজিস্ট বৈজ্ঞানিক স্কলার এক্সপার্ট ও বিদ্বান তার হিসেব নেই, অথচ অন্যদিকে তেমনি অশিক্ষিত নিরক্ষরের সংখ্যাও

ক্রমহারে বাড়ছে। অর্থনীতিক্ষেত্রের মতো বিদ্যাবিধানের ক্ষেত্রেও শ্রেণী-বিভাজনের এই সাদৃশ্য বাস্তবিক বিস্ময়কর।

ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতিশীল (developing) দেশ, যদিও তার বেশি কৃতিত্ব বৈদেশিক সাহায্যের (Foreign Aid) প্রাপ্য, স্বদেশী প্রয়াসের নয়। এই foreign aid হলো বর্তমানকালের একটি মুখোস, যা ধনিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের জন্ম ব্যবহার করে। বৈদেশিক সাহায্যদানের কত বিচিত্র সংস্থা, কতরকমের তার নাম ও নামের সংক্ষেপ (abbreviations)। এহেন বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্ম ভারত সরকারের প্রয়োজন হয় নয়াদিল্লীতে মধ্যে মধ্যে রাজসূয়যজ্ঞ অনুষ্ঠানের। যদিও প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই 'মাহাত্ম্য' অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ১৯৬১ সালেই ঘোষণা করে বলেছিলেন[৭]:

> foreign aid is a method by which the United States maintains a position of influence and control around the world, and sustains a good many countries which would definitely collapse or pass into the Communist bloc.।

'ফরেন এড' প্রসঙ্গে এই কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন হল ভারতের মতো ডেভালাপিং ইকনমির প্রকৃত স্বরূপ বোঝার জন্ম। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবপুষ্ট এ এক নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। সাহায্যদাতা এই বিদেশী হাতের বিস্তার শিল্পবাণিজ্য ও যান্ত্রিক কৌশলের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার মধ্যে প্রধান হল শিক্ষাসংস্কৃতিক্ষেত্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক টেকনোলজিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাপ্রসার (বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা) ও বিভিন্ন বিদ্যাকুশলতার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে 'ফরেন এড'ও শিক্ষাভিমুখী হয়ে উঠেছে। শুধু ইকনমি নয়, ডেভালাপিং দেশের ইডিওলজিও সাহায্যদাতা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা আবশ্যক, তা না হলে কেনেডির কমিউনিজমের বিভীষিকা বাস্তব সত্য হবার সম্ভাবনা। তাই দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যোন্মুখ বিশাল একটি থাবা আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। গত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মধ্যে এদেশীয় বিদ্বানদের বিদেশে আনাগোনা কতগুণ যে বেড়ে গেছে তার ঠিক নেই। কত রকমের বিদ্যার এক্সপার্ট হবার জন্ম এবং কতরকমের গবেষণার জন্ম যে বিদেশে যেতে হয়, বিশেষ করে আমেরিকায়, তারও হিসেব নেই। 'ফরেন এড'

এসব ক্ষেত্রে স্কলারশিপ গ্র্যান্ট, ভিজিটিং প্রফেসরশিপ প্রভৃতির বেশ [illegible] করে আসে এবং তাতে আমাদের দেশের বিদ্যাবিজ্ঞানবিদ্যালয় সকলেরই উপকার হয়। বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও গত দুই দশকের মধ্যে আমাদের দেশে যত রকমের শিক্ষা-সংস্থা বা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে, যাদের উপর বৈদেশিক সাহায্যের মুদ্রার অবিরাম ধারাবর্ষণ হচ্ছে, তার তালিকাও অনেক দীর্ঘ হবে। যেমন ম্যানপাওয়ার ম্যানেজমেন্ট (নানা রকমের ম্যানেজেরিয়াল বিদ্যা) বিজ্ঞান ফলিতবিজ্ঞান শিল্পবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশাসনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ইনস্টিটিউট। এই সমস্ত সংস্থার উপদেষ্টা পরামর্শদাতা ও এক্সপার্টদের মধ্যে অনেক বিদেশী বিদ্বান আছেন এবং তাঁরা প্রধানত আমেরিকান। আমাদের নয়া ঔপনিবেশিক উন্নতিশীল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে গতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্ক যে কত অঙ্গাঙ্গি তা এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। সেই কারণে আমাদের দেশের শিক্ষাসংকটের সঙ্গে আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশের শিক্ষাসংকটের মূল পার্থক্য বিশেষ নেই। শুধু শিক্ষা-সঙ্কটের সাদৃশ্য নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের রূপও প্রায় একরকম, এবং তার হিংসাত্মক প্রকাশ উভয় ক্ষেত্রেই মারাত্মক। কাজেই 'ডেভালাপিং' ভারতের বিদ্যাসংকট অনিবার্য কারণে শিল্প-বিজ্ঞানোন্নত দেশের মতোই 'ডেভালাপ' করেছে, এবং 'ডেভালাপিং' বলে তার উপসর্গগুলি অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

চতুর্থ অর্থ নৈতিক প্রকল্পের প্রান্তে পৌঁছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় অর্থনীতির তথাকথিত 'সোশ্যালিস্ট প্যাটার্ন' কিভাবে বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতির প্যাটার্নের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় সমাজে অতি-ধনিক মধ্যধনিক ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিত্তশ্রেণী (প্রধানত ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত এলিটশ্রেণী) মুদ্রাস্ফীতির স্বর্ণ সুযোগে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন। মহলানবীশ, হাজারী ও আরও কয়েকজনের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, কিভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক শক্তি মুষ্টিমেয় মনোপলিস্ট ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংহত হচ্ছে। তার পাশাপাশি যেমন দ্রুতহারে ভারতের জনসংখ্যা বাড়ছে, তেমনি দীর্ঘতর ও গভীরতর হচ্ছে তার গণদারিদ্র্যের সীমারেখা।[৮]

সমাজের আকৃতিটা হচ্ছে মিশরীয় পিরামিডের মতো। পিরামিডের শিখরে অর্বুদপতিদের অবস্থান, তার নিচে কোটিপতি ও লক্ষপতিরা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এবং তার সুবিস্তৃত পাদদেশে বিশাল জনসমাজ নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্যের অন্ধকারে

[illegible] নির্বাসিত। এই হল বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কদের সমাজতন্ত্রের প্যাটার্ন। শিক্ষাক্ষেত্রেও অবিকল এই প্যাটার্নের প্রতিফলন দেখা যায়।

১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময় ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে। সময়ের এরকম শুভমিলন সচরাচর ঘটে না এবং মনে হয় না এটা কোনো আকস্মিক ঘটনার মিলন। বিদেশী শাসকবিরোধী বিদ্রোহ দমন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ শাসকরা একই সময়ে করেছেন, একই গূঢ় উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ বিদেশী শাসক ও এদেশী শাসিতদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্য এদেশী একদল বিদ্বানশ্রেণী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। ১৮৩৫ সালে এদেশে ইংরেজিবিদ্যা প্রচলনের সময় মেকলে বলেছিলেন :[৯]

> We must at present do our best to form a class who may be interpreter between us and the millions whom we govern ; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.

এই বিদ্বানশ্রেণী সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং তার মহৎ উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, চাকরিদান, ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র চালনার জন্য চাকরি এবং বিভিন্ন স্তরের চাকরির জন্য বিভিন্ন স্তরের বিদ্যায় 'ডিগ্রি'র ছাপ দেওয়া। এই ছাপ ও মার্কা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান 'বিশ্ববিদ্যালয়'। এদেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাকে ব্রিটিশ শাসকরা এই উদ্দেশ্যে গড়ে তোলেন[১০] —

> That whole system was determined by the fact that degrees were the passports to government service.

শাসকশ্রেণীর অনুগত এদেশের বিদ্বানদের সরকারী চাকরি দেবার জন্যই ডিগ্রি এবং সেই ডিগ্রি দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানদান বা প্রকৃত শিক্ষাদানের জন্য এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি, যদিও দেশের প্রকৃত শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বানদের মধ্যে অনেককে এই বিশ্ববিদ্যায়েরই গণ্ডি বাধ্য হয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। ইংরেজোত্তর ভারতীয়দের শাসনকালে, যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে, একরকম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারই বহন করা হচ্ছে বলা চলে। ভারতীয় শাসকরা মেকলের আদর্শকে অনেক বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে আজও অনুসরণ করে চলেছেন, সজ্ঞানে না

হলেও অজ্ঞানে, এবং মেকলের মতো বিদ্বানউৎপাদন নীতি সম্বন্ধে তাঁরাও বলতে পারেন :

> **We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern.**

কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলে-নীতি তাঁরা অনুসরণ করছেন ?

ইংরেজোত্তর যুগে ভারতের শিক্ষার প্রসার অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হবে, বিশেষ করে বিদ্বান বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থীদের সংখ্যার দিক থেকে। একাধিক কারণে এই সংখ্যাগত প্রসার হয়েছে, তার মধ্যে জনসংখ্যাস্ফীতি অন্যতম। অন্যান্য কারণ পরে আলোচ্য। আপাত শিক্ষার এই সংখ্যাগত প্রসার কিভাবে হয়েছে দেখা যাক :[১১]

ক.	প্রাথমিক স্তর	ক্লাস ১-৫	বয়স ৬-১১ ছাত্রসংখ্যা
	(১৯৫০-৫১)	(১৯৬৮-৬৯)	(১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য)
	১ কোটি ৯০ লক্ষ	৫ কোটি ৬০ লক্ষ	৬ কোটি ৯০ লক্ষ
খ.	মাধ্যমিক স্তর	ক্লাস ৬-৮	বয়স ১১-১৪ ছাত্রসংখ্যা
	(১৯৫০-৫১)	(১৯৬৮-৬৯)	
	৩ কোটি	১২ কোটি ৩০ লক্ষ	
গ.	উচ্চমাধ্যমিক স্তর	ক্লাস ৯-১১	বয়স ১৬-১৭ ছাত্রসংখ্যা
	(১৯৫০-৫১)	(১৯৬৮-৬৯)	(১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য)
	১২ লক্ষ	৬৬ লক্ষ	৯৭ লক্ষ
ঘ.	বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর	বয়স ১৮-২৪ ছাত্রসংখ্যা	
	(১৯৫০-৫১)	(১৯৬৮-৬৯)	(১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য)
	৩ লক্ষ ৬০ হাজার।	১৬ লক্ষ ৯০ হাজার।	২৬ লক্ষ ৬০ হাজার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ২৭, ১৯৬৯-৭০ সালে হয়েছে ৭৬।

ঙ. টেকনিক্যাল শিক্ষা

ডিগ্রি কলেজ : ৪৯ (১৯৫০-৫১), ১৩৮ (১৯৬৮-৬৯)

ডিপ্লোমা বিদ্যালয় : ৮৬ (১৯৫০-৫১), ২৮৪ (১৯৬৮-৬৯)

টেকনিক্যাল ডিগ্রি কলেজে ১৯৫০-৫১ সালে ৪০০০ ছাত্র থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে ২৫,০০০ ছাত্রের শিক্ষাব্যবস্থা এবং ডিপ্লোমা বিদ্যালয়ে এই সময়ের মধ্যে ৫৯০০ থেকে ৪৮,৬০০ ছাত্রের শিক্ষার সুযোগ করা হয়।

ভারতবর্ষে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের এই সংখ্যাগত বিস্তারের গতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় (১৯৭০ পর্যন্ত)—প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় তিনগুণ, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় চারগুণ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় ছয়গুণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় পাঁচগুণ, টেকনিক্যাল ডিগ্রিস্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় চারগুণ এবং টেকনিক্যাল ডিপ্লোমাস্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় আটগুণ।

শিক্ষার প্রসারের পাশে অশিক্ষার প্রসার লক্ষণীয়। এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে ভারতে অশিক্ষিত নিরক্ষরের (illiterates) সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি, এবং অক্ষরজ্ঞানের (literates) সংখ্যা বেড়েছে মোট লোকসংখ্যার ১৭% থেকে ৩৩%।[১২] ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১ কোটি। ভারতে জনসংখ্যার প্রসার হচ্ছে বাৎসরিক ২·৫% হারে, কিন্তু অক্ষরজ্ঞানের সংখ্যা বাড়ছে ০·৭৫% করে।[১৩] অর্থাৎ ১·৩০% করে (লোকবৃদ্ধি অনুপাতে) নিরক্ষরের সংখ্যা প্রতি বছরে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে ভারতেব জনসংখ্যা হয়েছে প্রায় ৫৫ কোটি, কাজেই নিরক্ষরের সংখ্যাও হয়েছে প্রায় ৪০ কোটির মতো। অর্থাৎ স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের শিক্ষাবিস্তারনীতির ফলে আজ প্রায় শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত।

অর্থনীতিক্ষেত্রে ভারতের গণদারিদ্র্যরেখা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের গণ-নিরক্ষরতারেখা, দৈর্ঘ্যে ও গভীরতায় একই রকম রূপ ধারণ করেছে। ইংরেজোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক শ্রেণীসমাজের যে মিশরীয় পিরামিডসদৃশ গড়নের কথা আগে বলেছি, তার সঙ্গে বিদ্বানশ্রেণীসমাজের তুলনা করলে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। উভয়ের আকৃতির সাদৃশ্য যমজের মতো, যেমন বিত্তশালী সমাজের, তেমনি বিদ্বানসমাজের। এই সাদৃশ্য এমনিতে গড়ে ওঠেনি, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতি অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। 'ফরেন এড'-আশ্রিত ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্বান-শ্রেণীর এইরকম বিন্যাসই সম্ভব, অন্যরকম বিন্যাস সম্ভব নয়, কারণ বিদ্বানশ্রেণী এই অর্থনৈতিক যন্ত্রের আসল কুশলী যন্ত্রী, এই বৈষম্যপ্রধান শ্রেণীসমাজের ও রাষ্ট্রের ধারক বাহক প্রচারক, মেকলের 'ইনটারপ্রেটার'শ্রেণী। কাজেই বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিকল্পনা ও নীতির মিল থাকা

ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণীর স্বার্থের দিক থেকে একান্ত আবশ্যক। সেই পরিকল্পনা ও নীতির জন্য আজ ভারতীয় সমাজের যে ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে তা এই[১৩]:

সামাজিক পিরামিডের পাদদেশে শতকরা প্রায় ৭৫ জন অতিদরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষ, যাদের বর্তমান ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তার উপরে বাকি শতকরা ২৫ জনের স্তরবিন্যাস, কতকটা এইরকম—

সর্বোচ্চ শিখরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতিধনিক।

তার নিচে ধনিকের বিভিন্ন স্তর, সচ্ছল মধ্যবিত্তের প্রান্ত পর্যন্ত।

তার নিচে বিপুল নিম্নমধ্যবিত্ত, আশানিরাশায় আন্দোলিত।

ঠিক তেমনি বিদ্বানদের ব্যুরোক্রাসির শ্রেণীবিন্যাস।

তফাৎ শুধু এই যে যাঁর যত বিত্ত তিনি তত প্রভাবশালী, কিন্তু যাঁর যত পাসকরা বিদ্যা তিনি তত বিদ্বান বা প্রভাবশালী সাধারণত নন। যাঁর বিদ্যা যত বেশি বর্তমান শাসকশ্রেণীর পৌরোহিত্যে উৎসৃষ্ট, তিনি তত বেশি 'বিদ্বান' বলে ঢক্কানিনাদিত ও সম্মানিত এবং অত বড় বিদ্বান-ব্যুরোক্রাট, আর স্বভাবতই বিত্তবান। তিনি সাধারণ বিদ্যালয়ের অনেক সুশিক্ষিত শিক্ষকের চেয়ে অনেক কম বিদ্বান হয়েও হয়ত দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান পুরোহিত হতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারেন, বড় বড় ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হতে পারেন। ব্রিটিশ শাসকরাও তাঁদের রাজত্বকালে, নিজেদের শাসনশোষণের স্বার্থে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বিদেশী শাসক বলে তাঁদের যেটুকু বাইরের মুখোসের প্রয়োজন ছিল, মনে হয় বর্তমান 'স্বদেশী' শাসকদের কাছে সেই মুখোসটুকুরও কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব তাঁদের নীতির নগ্নমূর্তিটাই স্বাভাবিক, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রকাশ অর্থনীতিক্ষেত্রের মতোই নির্মম।

ব্রিটিশ শাসকদের উত্তরাধিকার ভারতীয় শাসকরা কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বহন করছেন, তা পূর্বোক্ত শিক্ষাবিস্তারের প্যাটার্ন ও ডিজাইন থেকেই বোঝা যায়। ডিজাইনটা হলো: প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বিস্তার তিনগুণ, মাধ্যমিক স্তরের চারগুণ, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছয়গুণ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঁচগুণ, টেকনিক্যাল ডিগ্রি স্তরের চারগুণ, ডিপ্লোমা স্তরের আটগুণ। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বিস্তার সবচেয়ে কম, তার পর থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষাবিস্তার

আনুপাতিক হারে অনেক বেশি। যে-কারণে দরিদ্র লোকের মতো নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশি। অথচ বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্রা বলেন যে উন্নয়নপন্থী দেশে প্রাধান্যটা ঠিক বিপরীতমুখী হওয়া উচিত, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সর্বাধিক গুরুত্ব ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে কমা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়নি। হয়নি তার কারণ, আমরা প্রধানত সেই শ্রেণীর শিক্ষাতত্ত্ববিদ্দের সদুপদেশ শিরোধার্য করেছি যাঁরা 'ফরেন এড'-ছদ্মবেশী নয়াসাম্রাজ্যবাদী দেশের শিক্ষানীতির অন্ধ স্তাবক। এরকম একজন বিদেশী শিক্ষাবিদ্ বলেন যে উন্নয়নমুখী দেশে (যেমন ভারতে) প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম অর্থব্যয় করার ফল হল :

> it almost inevitably takes money from other more crucial forms of educational growth.

(সম্প্রতি 'growth' কথাটি যেমন অর্থনীতিক্ষেত্রে, তেমনি বিদ্যার ক্ষেত্রে পৃথক 'concept' হিসেবে বেশি প্রয়োগ করা হচ্ছে, 'development' ও 'progress' কথার বদলে)। শিক্ষার এই 'more crucial forms' কি, এই শিক্ষাবিদের মতে ? তিনি বলেন :[১৪]

> Most authorities are agreed that the best way of reconciling economic expediency with the technical requirements of a country is a *sound growth of secondary education*, providing the army of trained.. persons who are so greatly needed as *technicians*, *clerks*, *nurses*, *agricultural assistants*, *supervisors*, *foremen and businessmen*, who also in all these capacities form the basis of *solid citizenry*. (বাঁকা হরফ লেখকের)।

প্রাথমিক শিক্ষার বদলে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাজকর্মের দিক থেকে অনেক বেশি, কারণ এই শিক্ষা দিলে তবে টেকনিসিয়ান কেরানি নার্স কৃষিসহকারী সুপারভাইজার ফোরম্যান ব্যবসায়ী ইত্যাদির 'সাপ্লাই' পাওয়া যাবে এবং এই শ্রেণীর শিক্ষিতরা 'solid citizenry'-র পাকা ভিত্ হিসেবে গড়ে উঠবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় শক্তির সুসংহত সমর্থকশ্রেণী হবে। ভারতসরকার শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রায় বর্ণে বর্ণে পালন করে

মেকলের পন্থাই অনুসরণ করেছেন, কারণ এই শিক্ষানীতি, মিরডালের ভাষায়[১৫]—

> conforms rather closely to *the old colonial pattern of building up a highly educated elite* with an attached lower rank of technical personnel functioning as subalterns *while leaving the population at large in a state of ignorance*'. (বাঁকা হরফ লেখকের)।

মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত বিদ্যার্থীদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমাদের দেশে শিক্ষার সামাজিক চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে। এই চাহিদা কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীব্যাপী বেড়েছে। এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে বিশেষ উল্লেখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। এর কারণ জনসংখ্যাস্ফীতি নয় শুধু, অন্যান্য কারণও আছে। যেমন ১৯০০ থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৬৯-৭০) আমেরিকার জনসংখ্যা বেড়েছে মোট আড়াইগুণ, কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ১৯০০ সালের ১২% থেকে ১৯৬৭ সালে ৯০% পর্যন্ত, প্রায় আটগুণ এবং উচ্চশিক্ষার হার বেড়েছে ৪% থেকে ৪৪%, প্রায় এগারোগুণ। এরকম অন্যান্য দেশেও বেড়েছে। শিক্ষাসমাজতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে এই চাহিদাবৃদ্ধির কারণ তিনটি। প্রথম কারণ, আধুনিক পিতামাতার ও ছেলেমেয়েদের আকাঙ্ক্ষাবৃদ্ধি; দ্বিতীয় কারণ, জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে সরকারী শিক্ষাপ্রসারনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক; তৃতীয় কারণ, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষা-চাহিদার উপর যার প্রতিক্রিয়া 'quantitative multiplier'-এর মতো।[১৬]

এই তিনটি কারণই আমাদের দেশে অত্যন্ত সক্রিয়। গত একপুরুষকালের মধ্যে শ্রেণীনির্বিশেষে পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যধিক সজাগ হয়েছেন, এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে এই সজাগতা অত্যন্ত প্রবল। বরং অনেকক্ষেত্রে বিসদৃশভাবে প্রকট বলা চলে। পিতামাতা উভয়েই চাকরিজীবী, সাধারণ গৃহস্থ মধ্যবিত্ত, কিন্তু ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষাতে যা খরচ করেন তা একপুরুষ আগে দ্বিগুণ বিত্তবান পরিবারেও করা হত না। চতুর্গুণ বেতন দিয়ে কোনো ইংরেজিমিডিয়াম স্কুলে পড়ানো, একাধিক বিষয়ের জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ, টিফিন পোশাক যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ খরচ হিসেব

করলে দেখা যায় যে একটি ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া প্রায় হাতি পোষার মতো ব্যাপার। যাঁরা বিত্তবান তাঁরা যদি হাতি পোষার মতো ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ত ব্যয় করেন তো বলার কিছু নেই, কিন্তু উপসর্গটি অত সরল নয়। মধ্যবিত্তের মধ্যে একশ্রেণীর ভদ্রলোক, যাঁদের সংগতি নেই, তাঁরা অর্থের জন্ত প্রাণপণ খেটেও, পিতামাতা উভয়েই, ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্ত এই খরচ বহন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছেলেমেয়ের প্রকৃত শিক্ষালাভ যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি শিক্ষালয় সামাজিক মর্যাদালাভ এবং উচ্চবেতনে কোনো চাকরিলাভ। তাই ইংরেজিমিডিয়াম স্কুলের 'প্রাইভেট' বাণিজ্যের এত প্রসার এদেশে, বিশেষ করে কলকাতার মতো বড় বড় শহরে, কারণ আমরা 'স্বাধীন' হলেও এবং জ্ঞানবৃদ্ধ দেশপ্রেমিকরা জাতীয় মাতৃভাষায় শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে সদিচ্ছা পোষণ করলেও, ইংরেজিবিদ্যার কদর ইংরেজ আমলের চেয়ে স্বাধীন ভারতে অনেক বেশি বেড়েছে, সমাজে ও চাকরির ক্ষেত্রে। পরাধীন ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে আমরা কিভাবে বহন করে চলেছি, এবং অনেকটা অন্ধের মতো, এটা তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত। এর সামাজিক প্রতিফল দূরপ্রসারী এবং স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়বস্তু। সংক্ষেপে বলা যায়, কর্মব্যস্ত পিতামাতার অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত অথচ বিচিত্র এক ধরনের আহ্লাদী সোহাগে প্রতিপালিত এই ছেলেরা শিক্ষালাভ করে যৌবনে কর্মজীবনে উন্নাসিক হয়ে ওঠে, অর্থাৎ চল্‌তি বাংলায় পুরো 'ট্যাটোনে' পরিণত হয়। বিদ্যার 'ভাঁড়ে মা-ভবানী' অথচ ইংরেজি বুক্‌নিতে জবরদস্ত (চোখবুজে কথা শুনলে মনে হয় যেন ট্যাসফিরিঙ্গির বাচ্চা সব) এই semi-literate শ্রেণী, ডিগ্রি ও ইংরেজির জোরে সরকারী বেসরকারী বড় বড চাকরিলাভও করেন এবং দেশের বিদ্বানব্যুরোক্রাসির শীর্ষস্থান দখল করে বসেন। কর্মস্থলে এই বিদ্বানদের 'স্পোকেন ইংলিশ' ('স্পোকেন ইংলিশের কতরকমের ক্লাস, কত ইনস্টিটিউশন, এবং সেখানে চাকরিক্ষেত্রে মর্যাদালোভী শিক্ষিতদের ভিড়!) ও পদমর্যাদার দাপটে, তাঁদের অধীন বিদ্বানরা (ব্যুরোক্রাসির নিম্নস্তরের) সর্বদা থরহরিকম্পমান অবস্থায় দিন কাটান। আর পিতামাতারা যাঁরা সাধ্যের অতিরিক্ত করে, আহ্লাদে সোহাগে, ছেলেদের এরকম বিদ্বান করে গড়ে তোলেন, তাঁদের প্রতিদান হলো পুত্রপালনকর্তব্যান্তে নির্বাসন। বিদ্বান হাজারী-দু-হাজারী পুত্ররা তখন স্বাধীন 'ব্যক্তি'তে রূপান্তরিত, তাদের পৃথক পরিবার, পৃথক সংসার, পিতামাতারা জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যক্ত অবজ্ঞাত,

কারণ এই স্বাতন্ত্র্যই আধুনিকতা ও সভ্যতার লক্ষণ, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক শিল্পোন্নত দেশে, অতএব 'ডেভালাপিং' দেশেও।

শিক্ষার সামাজিক চাহিদা এই মধ্যবিত্তের স্তর থেকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, শহর থেকে গ্রামে। যেমন শহরে তেমনি গ্রামেও। জমিদার পত্তনিদার তালুকদারদের স্তর থেকে মধ্যবিত্ত চাষীর স্তর পর্যন্ত একদিকে, অন্যদিকে সমাদৃত উচ্চজাতিবর্ণের একচেটে অধিকার থেকে আজ অনাদৃত অবহেলিত জাতিবর্ণের স্তর পর্যন্ত (কিছুটা অন্তত) শিক্ষার অধিকার প্রসারিত। তার ফলে গ্রাম্যসমাজেও এক নতুন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। গ্রাম্য শিক্ষিতরা শহর-গ্রামের সেতুস্বরূপ হয়ে উঠছেন, গ্রাম্য পরিবারে পিতার বংশগত জাতিগত পেশার সঙ্গে (চাষী কর্মকার চর্মকার বণিক প্রভৃতি) নব্যশিক্ষিত পুত্রের চাকরিগত ও বিদ্যাগত পেশার অসংগতি ও বিরোধ বাড়ছে, নতুন পেশাগত মর্যাদার চেতনা যত প্রখর হচ্ছে তত পারিবারিক সংকট দেখা দিচ্ছে গ্রামে। শহরের শিক্ষাক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া কম হচ্ছে না। শহরের উচ্চবিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাজাতির নানাবর্ণের নানাবৃত্তির গ্রাম্য ছাত্রদের সমাগমের ফলে (এবং শহরের নানাস্তরের শ্রমিকশ্রেণীরও) বিদ্যার্থীদের সামাজিক শ্রেণীগত রূপের (social class composition) পূর্বেকার বিন্যাস ভেঙে যাচ্ছে। বিদ্যার্থীদের এই শ্রেণীগত বিন্যাসভঙ্গের ফলে শহরের শিক্ষায়তনে নানারকমের 'tension' দেখা দিচ্ছে। বিদ্যার্থীদের মনোভঙ্গি ও মূল্যবোধের পার্থক্যের সংঘাত বাড়ছে, দাবিদাওয়ার বিরোধ বাড়ছে এবং তার ফলে প্রতিবাদ-বিদ্রোহের স্বরগ্রামেরও তফাৎ হচ্ছে। শিক্ষার সামাজিক চাহিদাবৃদ্ধি ও শিক্ষাপ্রসারের এই সমস্ত সামাজিক ফলাফল প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু এবং এগুলি সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিভাগের কাজ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সামান্য কাজ করা হয়েছে, অধিকাংশই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আরও অনেক সরেজমিনে অনুসন্ধানসাপেক্ষ কাজ করার আছে। আমরা ফলাফলের ইঙ্গিত করেছি মাত্র। কথা হল, শিক্ষার চাহিদা যখন এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন কিভাবে তা মেটানো সম্ভব? দু-রকম উপায়ে মেটানো যায়। প্রথম উপায় হল, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সমস্ত দরজা (বিদ্যালয়ের) উন্মুক্ত করে দিয়ে বিদ্যার্থীদের যত সংখ্যায় খুশি প্রবেশের অবাধ অধিকার দেওয়া যায়। দ্বিতীয় উপায় হল, একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত (যেমন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক) প্রবেশের অবাধ অধিকার দিয়ে, পরবর্তী উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে অধিকার ক্রমেই সংকুচিত করা

যায়, অর্থাৎ চাহিদা খানিকটা মিটিয়ে বলা যায়, আর দরকার নেই, এবার অন্ত কিছু কর। প্রথম উপায়কে বলা হয় 'wide open system', দ্বিতীয় উপায়কে বলা হয় 'selective system'। আমাদের দেশে কোন্ উপায়টি অবলম্বন করা হয়েছে? স্বভাবতই দ্বিতীয় উপায়, কারণ জনসংখ্যানুপাতে শিক্ষার চাহিদা অবাধে মেটাতে হলে অনেক বিত্তালয়, অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রয়োজন, তার জন্ত অর্থের ও সংগঠনের প্রয়োজন। সেই আর্থিক শক্তি অথবা সংগঠনের সদিচ্ছা কোনোটাই আমাদের দেশীয় সরকারের নেই, কারণ 'ফরেন এড' শিক্ষাক্ষেত্রে বেশিদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক, এবং ডেভোলাপিং দেশের জন্ত সাহায্যদাতা বিদেশী ধনিক দেশের শিক্ষাকৌশল কি, তাও আগে বলেছি। সেই স্ট্র্যাটেজি কার্যকর করতে হলে শিক্ষাধিকার ও শিক্ষার চাহিদা যাচাই পদ্ধতিতে (selective process) নির্মমভাবে সংকুচিত করতে হয়। ব্রিটিশযুগে মেকলে-নীতিও ছিল তাই।

যাচাইয়ের গতানুগতিক টেকনিক হলো examination, পরীক্ষা। 'competitive examination' তার গালভরা নাম। বিত্তালয়ে প্রবেশকালে পরীক্ষা, প্রবেশের পর পরীক্ষার-পর-পরীক্ষা, ছাত্রজীবনের আগাগোড়াই পরীক্ষা। প্রবেশকালে পরীক্ষার প্রথম কারণ বিত্তালয়ে ও ক্লাসে স্থানাভাব, দ্বিতীয় কারণ 'মেরিট' ও 'আই. কিউ.' অনুযায়ী বিত্তার্থীরা প্রবেশাধিকার পাবে। যে-বিত্তালয় যত অভিজাত—যেমন দেশী বিদেশী মিশনস্কুল-কলেজ, সরকারী স্কুল-কলেজ—সেখানেপ্রবেশপরীক্ষা অথবা মার্কশিট টেস্ট তত কঠিন। পরীক্ষার বাহ্য ভড়ং দেখলে মনে হয় কত গণতান্ত্রিক, কিন্তু আসলে পরীক্ষা আদৌ গণতান্ত্রিক নয়, প্রভাবতান্ত্রিক।[১৭] আমাদের দেশে ফিউডালযুগের প্রভাবতন্ত্রের ঐতিহ্য আজও অত্যন্ত সজীব বলে, শিক্ষাক্ষেত্রে 'পরীক্ষা' 'মেরিট' ইত্যাদি নামে গণতন্ত্রের মুখোসগুলো অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক। উপমন্ত্রী থেকে রাজনৈতিক শাসক বা পার্টি-বসের চিঠি থাকলে বহু অভিজাত বিশ্ববিত্তালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, যদিও গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার খাতিরে পরীক্ষার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা প্রয়োজন। এদেশে এই প্রবেশপথের নাম backdoor, খিড়কি দরজা। খিড়কি দরজা হাটখোলা করে সদর দরজা একটু ফাঁক করে রাখা হয় গণতন্ত্রের নামে। তারপর বিত্তালয়ে, অর্থাৎ বিত্তার কসাইখানায় বলিদান দেওয়ার তান্ত্রিক উৎসব চলতে থাকে, প্রভাবতান্ত্রিক উৎসব। প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে বিষণ্ণ তরুণ যুবক যারা

ঘরে ফিরে আসে, গণতন্ত্রের ক্রিকিং-ফাঁক দরজায় মাথা ঠুকে, তারা অধিকাংশই প্রায় অসহায় দরিদ্র প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন পরিবারের সন্তান। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, উচ্চ উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে তারা অবাঞ্ছনীয় বস্তু, কারণ তাদের merit ও I. Q. গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-প্রতিযোগিতায় অচল। তাহলে তারা কি করবে? এবং তাদের কিছু করা-না-করার দায়িত্ব কার? দায়িত্ব যারই থাক না কেন, আমাদের রাষ্ট্রের অন্তত আপাতত কোনো দায়িত্ব নেই। তা হলে তারা কি হবে? অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ভিতর দিয়ে '*solid* citizenry'-র স্তরভুক্ত যখন তারা হতে পারল না, তখন তারা কি হবে? নিশ্চয় *liquid* অর্থাৎ *fluid* citizenry-র অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ drifter, dropout, যেভাবে হক তারা ভেসে বেড়াবে, এবং তারা খাবে কি না-খাবে, বাঁচবে কি না-বাঁচবে সে-দায়িত্বও রাষ্ট্রের নেই।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের ধারা ও ভাষা অনুসরণ করে বলা যায় যে বিদ্যার দুটো দিক আছে—একটা তার উপভোগ বা consumption-এর দিক (consumption dimension), আর একটা বিনিয়োগ বা investment-এর দিক (investment dimension)। বিদ্যার্থীরা যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন আশা করা হয় যে পারিবারিক পরিবেশের সীমানার বাইরে একটি বৃহত্তর সুস্থ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষালাভ করে তারা ক্রমে পরিপূর্ণ নাগরিক ও মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং বিদ্যা ও জ্ঞান তাদের জীবনসংগ্রামে (শুধু জীবিকাসংগ্রামে নয়) শক্তি যোগাবে, তাদের সুপ্ত বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করবে। এইটাই জ্ঞানবিদ্যার প্রকৃত উপভোগের দিক। এটা বিদ্যার আদর্শের দিক, অপূর্ণ আংশিক মানুষকে পরিপূর্ণ অখণ্ড মানুষ করে গড়ে তোলা। অখণ্ড মানুষের আত্মশক্তি সমাজবোধ ও বিশ্ববোধ অমূল্য সম্পদ, যে-সম্পদ সে সারাজীবন নিজে ভোগ করতে পারে, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যার আদর্শ প্রাচীন সমাজে অনেকটা অনুসৃত হলেও, ধনতান্ত্রিক সমাজে হয় না, বিদ্যার্থীদের সেখানে কোনো সুযোগ সম্ভাবনা নেই 'to enjoy the humanistic aspect of education as an end in itself.' এই সমাজে বিদ্যার ইনভেস্টমেণ্ট বা বিনিয়োগের দিকটাই প্রধান, কারণ মানুষ ঠিক টাকার মতো মূলধন তো বটেই, টাকা ছাড়া বিদ্যালাভও সম্ভব নয়। কাজেই বিদ্যার জন্য যে-টাকা ব্যয় করা হয়, এবং যে-সংখ্যায় মানুষকে নানারকমের

বিদ্বান তৈরি করা হয়, উভয়ই 'ইনভেস্টমেন্ট'। প্রথমটা 'পারিবারিক' ইনভেস্টমেন্ট, দ্বিতীয়টা 'জাতীয়' ইনভেস্টমেন্ট। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী তার কর্মীলোকসংখ্যা (manpower) পরিমাপ করা হয়—যেমন কত কেরানি, কত এঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান, কত বিজ্ঞানী, কত প্রশাসনকর্মী ইত্যাদি—এবং তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রসারেরও পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট শিক্ষাযন্ত্র থেকে সেই সমস্ত কাজের উপযোগী নানাশ্রেণীর বিদ্বান উৎপন্ন হতে থাকে। অতএব 'investment in human capital' নির্ভর করে আসল অর্থনৈতিক মূলধনের জাতীয় বিনিয়োগনীতি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারা ও লক্ষ্যের উপর। আমাদের দেশের জাতীয় উন্নয়নের ধারা যে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক তা বোঝার জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, জাতীয় গবর্নমেন্ট নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশনের অনুসন্ধান-রিপোর্ট পড়লেই জানা যায়। তার ফলে গত কুড়ি বছরে দেশের অর্থনৈতিক শক্তি চূড়ান্তভাবে সংহত হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর হাতে এবং বৃহত্তম জনসংখ্যার চরম দারিদ্র্যের বিনিময়ে ধনিক ও উচ্চবিত্তের স্তরায়ন হয়েছে সমাজের উপর তলায়। বিদ্যাবিদ্বানের ক্ষেত্রেও বিশাল ব্যুরোক্রাসির বিকাশ হয়েছে এবং সেখানেও প্রভূত ক্ষমতাশালী বিদ্বানদের স্তরায়ন হয়েছে সমাজের উপরতলায়, এবং অর্ধবিদ্বান অবিদ্বান নিরক্ষরদের নিয়ে গঠিত বৃহৎ জনস্তর ক্রমেই বৃহত্তর হয়েছে। যেমন প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে (২ জানুআরি, ১৯৭১) শ্রীআত্মা রাম, কতকটা ভূতের মুখে রাম-নামের মতো, ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে এক ভাষণে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে 'a new science bourgeois class' উদ্‌ভূত হয়েছে, যাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে এই 'বুর্জোয়া' বিজ্ঞানীরা—('বুর্জোয়া' কথা শ্রীআত্মারাম-ব্যবহৃত)[১৮]

> have never worked in a laboratory outside their degree career এবং they have drifted into new and attractive realms which make them important and influential…

তাহলেই তো হল, শ্রীআত্মা রাম নিজেও তা জানেন, 'important' ও 'influential' হওয়াই আসল কথা, জ্ঞানবিদ্যার চর্চা বা গবেষণা কোনদিন আমলাতন্ত্রের মই বেয়ে উপরে উঠতে ('attractive realm'-এ) কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের মতো অন্যান্য বিদ্যা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা।

বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র কমিটি সিণ্ডিকেট অধ্যক্ষ উপাচার্য ডীন প্রভৃতিদের নিয়ে দুর্ভেদ্য আমলাতান্ত্রিক চক্র এবং প্রধানত অযোগ্য অপদার্থ ব্যক্তিদের (অবশুই বিদ্বান) সর্বময় প্রভুত্ব। ডিগ্রি গবেষণা চাকরি সবই এই বিদ্বান-আমলাতন্ত্রের পোষকতানির্ভর। যেমন অধিকাংশ বিজ্ঞানী যাঁরা আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচালক, পাঠ্যজীবনে ল্যাবরেটারি দেখার পর আর কখনো সেখানে প্রবেশ করেননি, অন্যান্য বিদ্বানপ্রভুরাও ঠিক তাই। তিরিশ বছর আগে যিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের স্ট্যাটিস্টিক্স সংগ্রহ করে 'ডক্টর'-শ্রেণীর বিদ্বান হয়েছিলেন, তিনি হয়ত আজও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী কলেজে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক। যেমন ব্যাঙ্কিং কারেন্সির গবেষণা করে একদা যিনি 'ডক্টর' হয়েছিলেন, তিনি প্রকাণ্ড অর্থনীতিবিদ্। যিনি হয়ত ইতিহাসে 'মহাবীর সিং' সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন, তিনি বিরাট ঐতিহাসিক। তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দর্শনে ও অন্যান্য বিদ্যায়। এঁরা 'influential' ও 'important', অন্য কেউ যত বড় প্রতিভাবান ও শক্তিমান হন না কেন, ইচ্ছা করলে ডিগ্রি-চাকরির ক্ষেত্রে এঁরা তাঁদের খতম করে দিতে পারেন, কারণ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে এঁরা এক-একটা strategic position দখল করে বসে আছেন ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত। শুধু আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার জৌলুসের জন্যই এঁরা লালায়িত, বিদ্যার জন্য কদাচ নয়।

আমাদের শিক্ষানীতির এই হয়েছে পরিণাম, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলাফলের মতো। অর্থনৈতিক মূলধনের বিনিয়োগে বিভিন্ন প্রকল্পে যেমন ভুল হয়েছে অনেক, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে মানবিক মূলধন বিনিয়োগেও মারাত্মক ভুল হয়েছে। ভুলটা নীতিগত, লক্ষ্যগত। নিরক্ষরতাদূর ও প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত তো হয়েছে-ই, উচ্চশিক্ষার প্রসারও যতটুকু হয়েছে তা *অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে হয়নি।* অর্থাৎ কর্মীলোকের (manpower) জাতীয় চাহিদা অনুপাতে উচ্চশিক্ষারও প্রসার হয়নি। দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক চাহিদা থেকে বেশি পরিমাণে 'বিদ্বান' নামক সামগ্রীর সাপ্লাই হয়েছে উচ্চবিদ্যার উৎপাদনসংস্থা থেকে। তার কারণ, *অর্থনৈতিক চাহিদা—'growth' ও 'planning'—নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বৈদেশিক সাহায্যদাতাদের উপদেশ ও আদর্শ অনুযায়ী, তাই বিদ্বান-সরবরাহ অতিরিক্ত*

হয়ে গেছে। তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেশে আজ বিদ্বানদের বেকারসমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিদ্যাগবেষকরা বলেছেন :[১৯]

> After all, employed manpower with matriculate and graduate qualifications amounts to less than 4 per cent of the entire labour force of India : it is only the small apex of a vast pyramid and yet even at this apex the unemployment rate exceeds anything experienced in advanced countries since the Great Depression.

ভারতে মোট শ্রমনিযুক্ত লোকসংখ্যার শতকরা মোট চারজন ম্যাট্রিকুলেট থেকে গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু শতকরা এই মাত্র চারজন, বিশাল পিরামিডের চুড়োর যাঁদের অবস্থান, তাঁদের মধ্যেও বেকারসমস্যা আজ এত প্রকট হয়ে উঠেছে যা উন্নত দেশেও সেই ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনো হয়নি। এই গবেষকরা অবাক হয়ে গেছেন এইকথা ভেবে, যে-দেশে (ভারতে) বাৎসরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার, গত পনেরো বছর ধরে ৩·৫% ক'রে দাবি করা হয়, সেই দেশ তার পনেরো জন উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে গড়ে একজনকেও ঠিকমতো কাজ দিতে পারেনি।* তা সত্ত্বেও ডিগ্রির প্রতি এত মোহই বা কেন, আর কোথায় তার আকর্ষণ? একথা ঠিক যে 'ব্যাচিলার অফ আর্টস' ডিগ্রির চেয়ে 'ব্যাচিলার অফ এঞ্জিনিয়ারিং' ডিগ্রির চাকরিমূল্য (এবং বিবাহমূল্যও) বেশি, কিন্তু তাহলেও ভারতীয় অবস্থায় দেখা যায় যে বি. এ. ডিগ্রিরও চাকরিমূল্য আছে, অন্তত ম্যাট্রিকুলেটের চেয়ে (বর্তমান স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারি) বেশি—'his degree does

---

* ১৯৭০ সালে ভারতের মোট বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল manpower ছিল এঞ্জিনিয়ার ডাক্তার নিয়ে—মোট ১১ লক্ষ ৯ হাজার। তার মধ্যে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮০ হাজার এবং সায়েন্স পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯৫০ সালে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল ১৭,০০০, গত কুড়ি বছরে (১৯৫০-৭০) এই সংখ্যা ন-গুণ বেড়েছে। এই বিপুলসংখ্যক ডিগ্রিধারী বিজ্ঞানীর মধ্যে শতকরা ৩ জনের মতো বিভিন্ন ইণ্ডাস্ট্রীর সঙ্গে রিসার্চের কাজে নিযুক্ত। বাকি সকলে বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানদান করছেন, অথবা এমন সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন যার সঙ্গে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের 'সোস্যালিস্ট প্যাটার্নের' অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে দেশে যে কি পরিমাণ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর অপচয় হচ্ছে তা এই শোচনীয় অবস্থা থেকে বোঝা যায় (P. N. Chowdhury and R K. Nandy : 'Towards Better Utilisation of Scientific Manpower' in *Economic and Political Weekly*, June 19, 1971)

increase his chances of finding employment'—তাই মোহ ও আকর্ষণ।[২০] অবশেষে উক্ত গবেষকরা বলেছেন—'To be sure, there is more education than economic growth—' এবং এই প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন—

> that too much of the educational budget has gone to the higher levels and too little to the lower levels of the educational system.

আর উচ্চশিক্ষার অবস্থা হয়েছে কি ?

> *the quality of Indian higher education is now among the lowest in the world.'* (বাঁকা হরফ লেখকের)।[২১]

ভারতের উচ্চশিক্ষার মান আজ পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম, ডিগ্রি গবেষণা সবই অন্তঃসারশূন্য চটকদার প্যাকেজের মতো এবং তার কারণ পরীক্ষা দুর্নীতি স্বজন-মোসাহেবপোষণ ইত্যাদি কৌশল অবলম্বনে অপদার্থ বিদ্বানব্যুরোক্রাটদের বিদ্বৎসমাজের উপরতলায় একনায়কত্ব। বিকৃত বিলাসবাসনা চরিতার্থতার জন্য অনাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে, যৌনাবেদনপ্রধান মালকাট্তির বিজ্ঞাপনে, রঙবেরঙের বাহারে কনটেনার প্যাকেজের বন্যায় যেমন আমাদের দেশ আজ ভেসে গেছে, অথচ জীবনধারণের উপযোগী অত্যাবশ্যক জিনিসের উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়েনি এবং তার ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে কনোরকমে খেয়েপরে বেঁচে থাকার দায় হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি বিদ্যা-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়েছে (অনেকাংশে যা অন্তঃসারশূন্য), চটকদার প্যাকেজতুল্য ডিগ্রির আকর্ষণ বেড়েছে, কিন্তু অত্যাবশ্যক প্রাথমিক শিক্ষার বা অক্ষরজ্ঞানের অথবা প্রকৃত শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়নি। অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষানীতির এরকম গভীর অঙ্গাঙ্গিতা বাস্তবিকই বিরল।

এইবার যদি সেই তরুণ বিদ্বান বিদ্যার্থীদের দিকে ফিরে তাকাই যারা বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়ে 'মেরিট' ও 'আই. কিউ.' টেস্টের মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অনুত্তীর্ণ হয়ে ঘরে ফিরে গেছে [illegible] বেকারি [illegible] পায়নি—অথবা পিতার [illegible] দাঁড়িয়েছে যাতে বিদ্যার ব্যয়সংকুলান হয় না—[illegible] সমস্যার সমগ্ররূপটি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাব।

কেউ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিত্যালয়ে, কেউ মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিত্যালয়ে, কেউ উচ্চমাধ্যমিক থেকে কলেজে, কেউ বা বিশ্ববিত্যালয়ে প্রবেশ করতে চায়। কেন চায়? কারণ উচ্চ থেকে উচ্চতর ডিগ্রির পাসপোর্ট পেলে তাদের চাকরিলাভের সম্ভাবনা (chance) বেশি। কিন্তু প্রবেশ করতে পারল না, 'গণতান্ত্রিক' প্রতিযোগিতায় হেরে গেল, প্রমাণ হয়ে গেল যে তাদের 'মেরিট' কম, 'আই. কিউ.' কম, আসলে খিড়কিদরজা দিয়ে ঢুকে উপযুক্ত পাত্রের পদযুগলে তৈলদানের সামর্থ্যের অভাব। তাহলে তারা কি হল? কি হতে পারে? বা কি হবে?

মালতৈরির কারখানায় গেলে দেখা যায়, অসম্পূর্ণ মাল, ভাঙাচোরা ছেঁড়া-ছোটা 'ড্যামেজ্‌ড' মাল ('D' quality) পরিত্যক্ত অবস্থায় স্তূপাকার করা রয়েছে। এই অনির্বাচিত প্রবেশাধিকারবঞ্চিত বিষণ্ণ বিত্যার্থীরা হল বিত্যা কারখানার 'unfinished products', প্রাথমিক বিত্যালয় থেকে বিশ্ববিত্যালয়ের মধ্যবর্তী যে-কোনো স্তরে যাচাইয়ের পরীক্ষায় বাতিল হয়ে গেছে। তাদের বাজারমূল্য 'finished products'-এর চেয়ে অনেক কম, সেই জন্ত 'finished' এবং 'unfinished' বিদ্বানদের মধ্যে ('finishers' ও 'nonfinishers'-ও বলা যায়) পার্থক্যও যথেষ্ট, যেহেতু 'educational systems themselves make a sharp distinction between finished and unfinished products.'।[২২] যে-বিদ্বানরা তৈরি মাল ও যাঁরা আধাতৈরি মাল, তাঁদের মধ্যে *ব্যবধান প্রায় শ্রেণীগত ব্যবধানের মতো। আবার তৈরি ও আধাতৈরিদের* মধ্যেও, ডিগ্রি ও সার্টিফিকেটের 'ভ্যালু' অনুযায়ী, শ্রেণীসদৃশ পার্থক্য বিত্তমান। অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, সামাজিক মর্যাদা, এমনকি জীবনধারণের তাৎপর্য পর্যন্ত তাই পরীক্ষায় (examination) উত্তীর্ণ হওয়ার উপর নির্ভর করে, যেহেতু পরীক্ষালব্ধ ডিগ্রি সার্টিফিকেটই ইহজীবনে চলার পথে প্রধান অবলম্বন, ব্রহ্মনাম হরিনাম সততা দৃঢ়তা নিষ্ঠা অথবা স্বোপার্জিত (অর্থাৎ বিশ্ববিত্যালয়ের মোহরাঙ্কিত নয়) অগাধ পাণ্ডিত্যও তার তুলনায় অচল ও অক্ষম। তাই পরীক্ষাকালে এত উদ্বেগ, এত ভয়, এত জীবনমরণ সমস্যার মতো পরীক্ষার্থীর দুশ্চিন্তা—

> And, in a society where educational attainments symbolized by certificates and degrees, are closely linked to preferred categories of employment and social status,

the student who finishes has much more promising career prospects. The one who drops out or fails, on the other hand, burns important bridges to the future. When so much is at stake, including the whole family's social status, there is little reason to wonder why anxieties mount high as examination and admission times approach.… ।[২৩]

একদা ছিল সবার উপরে 'মানুষ' সত্য, সবার উপরে আদর্শ সত্য, সততা সত্য, অন্তত কিছুটা হয়ত ছিল, কিন্তু এখন পরীক্ষাই যখন জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য, কৈশোর যৌবনের সবচেয়ে উৎকট বিভীষিকা, পরীক্ষাই যখন জীবন-মৃত্যুর পরওয়ানা, সামাজিক সম্মান অসম্মানের মানদণ্ড, তখন পরীক্ষার ভীতি ও দুশ্চিন্তা তরুণ ছাত্রদের মধ্যে থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং যখন 'so much is at stake', এবং 'for what', অন্তত প্রকৃত জ্ঞানবিদ্যার জন্য কখনোই নয়, কেবল চাকরির একটি ছাড়পত্র লাভের জন্য, বেঁচে থাকার একটু 'chance' পাওয়ার জন্য, অন্তত মানুষের মতো না হলেও, প্রাণী জীবের মতো তখন পরীক্ষাকালে ছাত্রদের তথাকথিত দুর্নীতি (যেমন mass copying ইত্যাদি) যে কতখানি তাদের নৈতিক চারিত্রিক অবনতির পরিচায়ক, আর কতখানি হাড়িকাঠের সামনে কম্পমান জীবের আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে যা ইচ্ছা করার মনোভাবের প্রকাশ, তা মনোবিজ্ঞানীরা, এবং প্রাজ্ঞ উপাচার্যরাও ভেবে দেখবেন, অন্তত বিদ্যালয়ে পুলিসক্যাম্প স্থাপনের আগে। তা ছাড়া, বয়স অনুপাতে নীতিদুর্নীতিপ্রবণতার তুলনা করে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে বর্তমান সমাজের দুর্নীতিপ্রবণতা মধ্যবয়সী ও প্রবীণদের মধ্যে যতটা প্রবল, তরুণ কিশোর যুবকদের মধ্যে ততটা নয়। সামাজিক সর্বরকমের দুর্নীতির ক্ষেত্রে পরিপক্ক ঝানু ব্যক্তিদেরই একাধিপত্য, তরুণদের নয়, এমন কি দুর্নীতির শিক্ষানবীশ হিসেবেও নয়।[২৪]

পরীক্ষার সিঁড়ি অতিক্রম করে উঠবার সময় যে-কোনো ধাপে পরীক্ষার্থীর পতন হতে পারে এবং পতন যাদের হয় তাদের রণাঙ্গনের আহত নিহত সৈনিকদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিদ্যার রণক্ষেত্রে পরীক্ষার 'অ্যাম্বুশে' পর্যুদস্ত এই সমস্ত তরুণ 'বিকলাঙ্গ' বিদ্যার্থীদের বলা হয় dropouts, failures, repeaters, nonfinishers ইত্যাদি। বিদ্যার কারখানার এই সমস্ত ড্যামেজ্‌ড

মাল দেশের কর্মীমানবশক্তির বিপুল অপচয়, একথা যে-কোনো মতবাদের শিক্ষাবিজ্ঞানী স্বীকার করেন। আমাদের দেশে মানবশক্তির এই অপচয় বর্তমানে পর্বতপ্রমাণ আকার ধারণ করেছে, যেদিকে তাকালে রীতিমতো ভয় করে। বিদ্যাবিকলাঙ্গদের এই পর্বত শান্ত সুস্থির পর্বত নয়, বিস্ফোরণের অপেক্ষায় অস্থির অশান্ত পর্বত, ক্রোধ ও অসন্তোষের বহ্নি সর্বদা তার গহ্বরে ধূমায়মান। দমননীতি অথবা বয়োবৃদ্ধদের দাম্ভিক অভিভাবকত্ব তাতে অগ্নিসংযোগ করে মাত্র।

গবেষকরা বলেছেন যে আমাদের দেশে ব্যর্থবিদ্যার্থীর সংখ্যা শিক্ষার নিম্ন-স্তরের দিকে সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের অপচয় প্রায় ৭৮·৩৫%।[২৫] পরবর্তী উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে অপচয়ের পরিমাণ ক্রমে কমতে থাকে দেখা যায়। এটা নাকি ভারতের মতো অনুন্নত ও ডেভালাপিং দেশের বৈশিষ্ট্য। তাই বোধ হয় এদেশে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির ঝোঁক উচ্চবিদ্যার দিকে, প্রাথমিক বিদ্যার দিকে নয়। মিরডাল ঠিকই বলেছেন যে একথা অর্ধসত্য মাত্র, কারণ "large-scale waste exists in secondary and tertiary schools as well."।[২৬] শিক্ষার সর্বস্তরেই আমাদের দেশে অপচয় সমান শোচনীয়, প্রাথমিক স্তরে দরিদ্রদের খানিকটা ভিড় বেশি বলে অপচয়ের অঙ্কটা বেশি মনে হয়। প্রাথমিক স্তরের অপচয়ের আরও একটি বড় কারণ হল যোগ্য শিক্ষকের অভাব, অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রের সমান দুরবস্থা এবং শিক্ষামানের প্রতি চরম ঔদাসীন্য। তার মানে এই নয় যে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলা করে, দেশের দারিদ্র্যের মতো অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা বাড়িয়ে, বাজেটের বেশি অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ করতে হয়। যোগ্য শিক্ষকের সমস্যা খুব গুরুতর সমস্যা, প্রাথমিক স্তরের তুলনায় উচ্চশিক্ষার স্তরেও কিছু কম নয়। সেকথা শিক্ষকদের প্রসঙ্গে বলব।

কিন্তু প্রশাসনিক বৈজ্ঞানিক টেকনিক্যাল এলিটশ্রেণী গড়ে তোলার জন্য যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতসরকার বেশি মনোযোগ দিয়েছেন, সেখানেও দেখা যায় যে বাইরের জনসমাজের মতো এই শিক্ষিতসমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য ক্রমে দৃঢ়তর হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের এই নতুন এলিটশ্রেণী নতুন ধনিকশ্রেণীর পরিবারের ভেতর থেকেই প্রধানত গড়ে উঠেছে। যা হবার কথা, একই সীমানায় টাকা ও বিদ্যার মিলন, তাই হয়েছে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের (I. I. T.) একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে এই উচ্চশিক্ষার গতি

কোন্‌দিকে তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৬০ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা বড় স্তরের মধ্যে ছেলেদের এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ বেশ প্রবল ছিল। তার ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও (যাঁদের মাসিক আয় ৫০০ টাকার মধ্যে) এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন বিভাগে বেশ কিছু সংখ্যায় ভর্তি হত। কিন্তু পরে যখন ক্রমে এঞ্জিনিয়ারদের চাকরির সম্ভাবনা কমতে থাকল, তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকল, তখন দেখা গেল যে সাধারণ মধ্যবিত্তরা আর তাঁদের ছেলেদের ব্যয়সাধ্য এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিতে ঝুঁকছেন না, যে-কোনো চাকরি পাওয়ার মতো শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ১৯৭০-এর দিকে দেখা যায়, উচ্চমধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেদের মধ্যে এঞ্জিনিয়ারিংবিদ্যা ক্রমে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায়:[২৭]

১. মাসিক ২৫০ টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা I. I. T.-তে ১৯৬৬-৬৯-এর ৫-৬% থেকে ১৯৭০-এ ২% হয়েছে।

২. ২৫১-৫০১ টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ১৯৬৬ সালের ৩৪% থেকে ১০৬৮ সালে ১৪% হয়েছে এবং তার পর থেকে প্রায় একই রকম আছে।

৩. মাসিক ৫০০ টাকার বেশি আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। তার মধ্যে ৫০১-১০০০ টাকা মাসিক আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যার বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হয়নি, কিন্তু ১০০০-এর বেশি টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি বেড়েছে।

৪. ১০০১-১৬০০ টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ১৬% (১৯৬৮) থেকে ২৮% (১৯৭০) হয়েছে।

৫. মাসিক ২০০০ টাকা বেশি আয়ের পরিবারে ছাত্রসংখ্যা ৪% (১৯৬৬) থেকে ১৬% (১৯৭০) হয়েছে। তার মধ্যে ৩০০০ টাকার বেশি আয়ের পরিবারে ছাত্রসংখ্যা ২% থেকে ৬% হয়েছে।

অর্থাৎ I. I. T.-তে মাসিক ২০০০ টাকার বেশি আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, প্রায় চারগুণ। তার মধ্যে ৩০০০ টাকার বেশি আয়ের

পরিবারের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। ১০০০-১৬০০ টাকা মাসিক আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণের কিছু কম বেড়েছে, ৫০০-১০০০ টাকা মাসিক আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা প্রায় একরকমই আছে, এবং তার চেয়ে কম আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ক্রমে কমেছে। ঠিক এই ধরনের শ্রেণীরূপায়ণ সাধারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে (আর্টস ও সায়েন্স) হয়নি, কারণ I. I. T-র এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মতো সেগুলি তেমন ব্যয়বহুল নয়, যদিও বর্তমানে তাও নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। শ্রেণীবিন্যাসের প্যাটার্ন একরকম, কেবল এঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির ক্ষেত্রে যতটা উচ্চশ্রেণী-মুখী, সাধারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ততটা নয়। কাজেই ব্রিটিশযুগের মেকলের শিক্ষানীতি যে স্বাধীন ভারতে কিভাবে অনুসৃত হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে, তা আর বেশি ব্যাখ্যা করে বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই। অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-ক্ষেত্রের শ্রেণীরূপায়ণের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। ভারতীয় শাসকশ্রেণী ও বিশাল ভারতীয় জনসমাজের (দরিদ্র ও নিরক্ষর) মধ্যে যে বিদ্বান দোভাষীশ্রেণী তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে, তারা প্রধানত উচ্চমধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। 'পরীক্ষা' 'মেরিট আই. কিউ. টেস্ট' ইত্যাদির মাহাত্ম্যও এই আলোকে বিচার্য। এইজন্য শ্রেণীগত অথবা জাতিবর্ণগত গতিশীলতা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বাড়েনি, অনুন্নত জাতিবর্ণ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামান্য যেটুকু বেড়েছে তা উল্লেখ্যই নয়।

শিক্ষক পাঠ্যবই সিলেবাস বিদ্যালয় প্রভৃতিও বর্তমান বিদ্যাসংকট প্রসঙ্গে আলোচ্য। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পৃথক প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু। আমরা সংক্ষেপে শুধু সমস্যার স্বরূপটি উন্মোচন করব। শিক্ষার্থীদের পরেই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকরা হলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং যত কম বেতনই তাঁরা পান না কেন, তাঁরাই হলেন সবচেয়ে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ উপাদান:[২৮]

> **Teachers, next to students, are the largest, most crucial inputs of an educational system, They are also, by all odds, the most expensive inputs, even when they are underpaid.**

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকরা বিশেষ গুরুদায়িত্ব পালন করেন, অথচ অন্যান্য লোভনীয় কর্মক্ষেত্রের বিদ্বানদের মতো তাঁরা মোটা বেতন ভাতা উপরি ইত্যাদি পান না বলে তাঁরা নিজেদের অবহেলিত মনে করেন। কথাটা

একেবারে মিথ্যা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা প্রাইভেট বা পাবলিক সেক্টারে মোটা মাইনের কাজ পেয়ে যদি চলে যান, এবং ডেভালাপিং দেশে যাবার সুযোগও থাকে যথেষ্ট, তাহলে ক্ষীণ জোনাকিরা শুধু নিরুপায় হয়ে পড়ে থাকেন, বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সল্‌তেটি জ্বালিয়ে রাখার জন্য। সেইজন্য শিক্ষকতা অধ্যাপনার ক্ষেত্রে 'high proportion of "second choice" candidates'-এর ভিড় বেশি দেখা যায় এবং তার সঙ্গে 'widespread decline in teacher qualifications'-ও গুরুতর সমস্যা হয়ে ওঠে।[২৯] আমাদের দেশে এই সমস্যা যে কত ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে, কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট (*Report of the Education Commission 1964-66*, Govt. of India, New Delhi 1966. এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ডি. এস. কোঠারি) তা নানাভাবে বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

> In many of the weaker colleges and universities, a majority of teachers teach mechanically and listlessly.
>
> ...whatever research is done is usually of unconvincing quality.
>
> The hierarchical concentration of authority within the departments and colleges, the atmosphere of distruct between senior and junior teachers · the unseemly conflicts about offices and positions, and the attitude of envy towards persons of superior attainments...ইত্যাদি।

আরও অনেক মন্তব্য আছে। এই কয়েকটিই আপাতত যথেষ্ট। অধিকাংশ 'দুর্বল' বিদ্যালয়ে, (অর্থাৎ বেসরকারী বা প্রাইভেট সেক্টারের বিদ্যালয়ে) কোঠারি কমিশন বলেছেন, শিক্ষকেরা যন্ত্রের মতো শিক্ষা দেন। অতএব ছাত্ররা এই যন্ত্রের নির্যাতন সহ্য করে। কোনো শিক্ষক আরিস্ততল প্লেটো, কেউ ইতিহাস (হিন্দুযুগ), কেউ ক্যালকুলাস বা কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্স, কেউ দর্শন, কেউ অর্থনীতির মার্শাল পিগু কীন্‌সের তত্ত্বকথা বা ব্যাঙ্কিং কারেন্সি, কেউ অ্যালজাব্রা, কেউ সাহিত্যে ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য বা রবীন্দ্রনাথ, কেউ ভূগোল, কেউ শেক্‌সপীয়র, হয়ত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন, প্রায়

একপুরুষ ধরে, কেউ লেকচারের বদলে নোট ডিকটেট করছেন (বংশপরম্পরায় রক্ষিত নোটখাতাটি তাঁর শিক্ষকতাব্যবসায়ের মূলধন)—আর প্রতি বছরে নতুন নতুন টাটকা কিশোর যুবকরা এই সমস্ত বিদ্যার ব্যাখ্যান শুনছে। কী যে ঐশ্বরিক ধৈর্য তাদের তা সত্যিই কল্পনা করা যায় না! যদি তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তাহলে নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রবীণরা মুখর হয়ে ওঠেন, এমনকি তাদের নৈতিক চারিত্রিক অধঃপতনের কথা ঘোষণা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যদি অতিমধুর রবীন্দ্রসংগীতও চব্বিশঘণ্টা কর্ণকুহরে ধ্বনিত হতে থাকে, তাহলে তা কি শ্রুতিকটু ও কর্ণপীড়াদায়ক মনে হয় না? শিক্ষক অধ্যাপকদের বিদ্যাদানের লেকচারও তাই মনে হয়। কোঠারি কমিশন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ছাত্রদের কথা উল্লেখ করে :

> **…learning for them is mainly a matter of memorization… their main duty is considered to be to attend uninteresting lectures…**

সারা দুনিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, সমাজে রাষ্ট্রে জ্ঞানবিদ্যায় বিজ্ঞানে, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়ে, বিশেষ করে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই স্যার গুরুদাস স্যার আশুতোষের যুগে অবস্থান করে আজও এদেশীয় বিদ্বানরা ভাইস-চ্যান্সেলারি ও অধ্যাপনা করছেন। অপ্রচলিত বিদ্যার বেসাতি করছেন শিক্ষকরা, বছরের-পর-বছর, একসুরে একভঙ্গিতে একই কথা ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করছেন। অবশ্য শিক্ষক-অধ্যাপকদের কোনো অপরাধ নেই, কারণ তাঁরা চাকরির জন্য তা করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সিলেবাস বা সিস্টেম বদলাবার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। কাজেই তাঁরা নিরুপায়।[৩০]

পাঠ্যবিষয়ের অধিকাংশই 'অপাঠ্য'। এই কারণে অপাঠ্য যে যা দু-বছরে পড়ানো হয় তা দু-মাসে পড়ানো উচিত। আরিস্ততল প্লেটো নিয়ে দু-বছর ধরে বক্তৃতা দেওয়া, বুদ্ধ ও অশোকের বাণী শিলালেখ মুখস্থ করানো, মার্শাল কীন্‌সের অর্থতত্ত্বের চারবছর ধরে ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কলা-কৌশল বিশ্লেষণ করা, অধ্যাত্মবাদী দর্শনের সূক্ষ্মতা বছরের-পর-বছর বোঝানো, বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যশিল্পতত্ত্ব গলাধঃকরণ করানো, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামে আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কনস্টিটিউশনাল ইতিহাস

পড়ানো, ইন্টারন্তাশনাল ও কূটনৈতিক ইতিহাসের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা—এরকম আরও অনেক বিষয়ের কথা বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ধরে আলোচনা করলে আরও পরিষ্কার করে বলা যেত, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে। প্রসঙ্গত যা পাঠ্য নয় আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, এরকম একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি। যেমন মার্কসবাদ (Marxism), অর্থাৎ মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, মার্কসীয় ইতিহাসতত্ত্ব, মার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মার্কসীয় অর্থবিজ্ঞান, মার্কসীয় শিল্পসাহিত্যতত্ত্ব। আমাদের বিদ্যালয়ে বিষয়টি banned, নিষিদ্ধ, মুখে উচ্চারণ করাও taboo, হারাম। অথচ জ্যঁ-পল সার্ত্রের ভাষায় বলা যায়:[৩১]

> Marxism is the philosophy of our epoch ··Our whole thinking can grow only on this soil; thinking must stay within this framework, or be lost in a vacuum or become retrograde,

মার্কসবাদবিরোধী অনেক ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরাও মার্কসবাদের এই যুগান্তকারী গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকান ঐতিহাসিক 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তেই লিখেছেন যে "the whole science of dynamic sociology rests upon the postulate of Marx".[৩২] একজন বিখ্যাত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ্ স্বীকার করেছেন যে মার্কসীয় ইতিহাসতত্ত্ব "one of the greatest individual achievements of sociology to this day".[৩৩] আর একজন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে গত একশো বছর ধরে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ববিচার ও অনুশীলন হয়েছে তা প্রধানত মার্কসীয় প্রেতাত্মার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধের মতো—"the debate with Marx's ghost".[৩৪] এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলেছেন বিখ্যাত আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী রাইট-মিল্‌স, তাঁর *The Marxists* বইতে।[৩৫] তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ে মার্কসবাদের প্রবেশাধিকার নেই। প্রবীণ ভারতীয় মহাবিদ্বানরা অনেকে মার্কসবাদকে 'বিদেশী মতবাদ বা আদর্শ' (foreign ideology) বলে মনে করেন। যেন বাকি সব মতবাদ ও

আদর্শ বা পাঠ্যবিষয়ে ঠাসা রয়েছে তা সবই এদেশীয়! তা ছাড়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় সীমান্তের প্রশ্ন! তাই আমাদের শিক্ষার সিলেবাস বিদ্যাসাগরযুগ থেকেই প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে, মধ্যে মধ্যে কিছু সংস্কার করা হয়েছে, যেমন পোড়ো বাড়ি সংস্কার করা হয় তেমনি। আসলে গোড়ায় গলদ বলেই মার্কসবাদের মতো বিষয় আমাদের মতো দেশে পাঠ্য হতে পারে না, অন্যান্য বিদেশী জ্ঞানবিদ্যা সহজেই পাঠ্য হতে পারে। তার কারণ দেশের কিশোর যুবকশ্রেণী যদি মার্কসবাদী দর্শনে সমাজতত্ত্বে ইতিহাসতত্ত্বে শিক্ষালাভ করে, তাহলে এই সমাজরাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তাদের মনোভাব কি হবে এবং কোন্ পথে তারা এর প্রতিকার সন্ধান করবে, তা দেশের রাষ্ট্রনায়করা ও তাঁদের দোভাষীশ্রেণী (বিদ্বানরা) বিলক্ষণ জানেন। কাজেই বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা আজ—

> for all too familiar reasons, inevitably become purveyors of obsolete knowledge.[৩৬]

দোষ শিক্ষকদের নয়, শিক্ষাব্যবস্থার। শিক্ষকরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বেদীমূলে উৎসৃষ্ট। তাঁরা obsolete বিদ্যার বিক্রেতা হতে বাধ্য। কিন্তু বাধ্যতাই কি শেষ কথা? শুধু নৈতিক প্রশ্ন নয়, সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। স্কুল কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন আছে, মধ্যে মধ্যে তাঁরা নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ দাবিই হল বেতন-ভাতাবৃদ্ধির দাবি অথবা অন্য কোনো সুখসুবিধার। ট্রেড ইউনিয়নের গতি যেমন রাজনৈতিক চেতনাবর্জিত ‘ইকনমিজমে’র দিকে শিক্ষকদের আন্দোলনের গতিও তাই। জীবিকার সংগ্রাম শিক্ষকরা নিশ্চয় করবেন, বিশেষ করে আর্থিক অনটন যখন তাঁদের বাস্তবিকই আছে, কিন্তু তবু আশ্চর্য লাগে এই কথা ভেবে যে শিক্ষাসংক্রান্ত মুখ্য বা গৌণ কোনো সমস্যা নিয়েই তাঁরা কখনো আন্দোলন করেন না। যে-শিক্ষা বা বিদ্যা দান করে তাঁরা জীবিকা অর্জন করেছেন, ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন, সেই শিক্ষার গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁদেরও অন্তত আংশিক দায়িত্ব আছে। শিক্ষকরা কি সংঘবদ্ধভাবে দাবি করতে পারেন না যে obsolete বিদ্যা তাঁরা পরিবেশন করবেন না, পাঠ্যবিষয়ের যুগোপযোগী পরিবর্তন না হলে তাঁরা শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন? খানিকটা পারেন, এবং এক্ষেত্রে ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের সম্মিলিত দাবি অনেক বেশি জোরালোও হতে পারে। কিন্তু এরকম আন্দোলনের পথে

বাধা আছে অনেক। প্রথম বাধা নতুন জ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার অধিকার তাঁদের নেই। যতদিন না বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন হয় ততদিন তাঁরা 'obsolete' বিদ্যা শিক্ষা দিতে বাধ্য। নতুন জ্ঞানবিদ্যার গতিধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়েও, অধিকাংশ শিক্ষক, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, অচল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার যান্ত্রিক কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় বাধা, তাঁদের মধ্যবিত্ত মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভয়ভাবনা, অর্থাৎ চাকরির ভাবনা, পদোন্নতির ভাবনা ইত্যাদি। এরকম সংগ্রাম যেহেতু Establishment-এর সঙ্গে সোজাসুজি confrontation-এর মতো শিক্ষার মূলনীতিগত ও লক্ষ্যগত সংগ্রাম, তাই অনেক প্রকারের ভয় শিক্ষকদের মনে জমা হবার কথা। প্রধানত এই দুরকম বাধার জন্য শিক্ষকরা গতানুগতিক বিদ্যা বেচে জীবনধারণ করাই নিরাপদ মনে করেন।

প্রশ্ন হলো, এই সংকটের তাহলে শেষ কোথায়? সমাধানই বা কি? বর্তমানে আমেরিকান সমাজের একজন শিক্ষক লিখেছেন:[৩৭]

> "Students can change things if they want to because they have the power to say No.

বিদ্যার্থীবিদ্রোহের মধ্যে আজ আমাদের দেশেও এই 'No' কথাটি উচ্চারিত হচ্ছে। উচ্চারণের ভঙ্গির মধ্যে তফাৎ আছে, এবং মধ্যে মধ্যে সহিংস ভঙ্গিরও প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু ভঙ্গি নিয়ে বিতর্কের আগে প্রকৃত ব্যাধির বীজাণুটি সন্ধান করা অনেক বেশি প্রয়োজন। কারণ সহিংস ও অহিংস গণতান্ত্রিক ও অ-গণতান্ত্রিক ইত্যাদি নানারকমের বিক্ষোভভঙ্গি চিন্তার বিষয় হলেও, আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইতিহাসে কোনো বিদ্রোহই কোনকালে নিয়মশৃঙ্খলা সংযম সাবধানতার উপদেশ মেনে চালিত হয়নি, যুববিদ্রোহ তো হতেই পারে না, কারণ যৌবনের ধর্ম প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করা। তাই দেখা যায়, আজকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশে, আমেরিকায় ইংলণ্ডে ফ্রান্সে, বিদ্যার্থীবিদ্রোহ ও যুববিদ্রোহ তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' পন্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে অগণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই সমস্ত দেশে বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজের 'campus violence' কি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এখানকার পত্রিকাদিতে সেই সব সংবাদ প্রকাশ করা হয় না বলেই আমাদের দেশের (যেমন পশ্চিমবঙ্গের)

বিদ্যালয়বিদ্বানবিরোধী বিদ্রোহের উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশে আমরা অবাক হয়ে যাই। আমেরিকায় ছাত্রদের সহিংস প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ এমন চূড়ান্ত সীমায় আজ পৌঁচেছে যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিপুল জাতীয় ধনৈশ্বর্য টেকনোলজি ও সামরিক শক্তির শিখরে বসেও চোখে অন্ধকার দেখছেন। কেন চোখে অন্ধকার দেখেছেন তা তাঁরই নিয়োজিত, এবিষয়ে তদন্তের জন্য, স্ক্র্যানটন কমিশনের রিপোর্টের (১৯৭০) এই উক্তি থেকে বোঝা যায় :[৩৮]

> *A notion driven to use the weapons of war upon its youth is a nation on the edge of chaos. A nation that has lost the allegiance of part of its youth is a nation that has lost part of its future* A nation whose young have become intolerant of diversity, intolerant of the rest of its citizenry and intolerant of all traditional values has no generation worthy or capable of assuming leadership in the years to come (বাঁকা হরফ লেখকের)।

উদ্ধৃত তিনটি বাক্যের মধ্যে প্রথম দু-টি বাক্যের (বাঁকা হরফ) তাৎপর্য বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের শাসকরা গভীরভাবে চিন্তা করবেন। তৃতীয় বাক্যটি একটি অর্থহীন উক্তিবিশেষ, কারণ যে আমেরিকান সমাজের দায়িত্ব নিক্সন স্ক্র্যানটনের মতো একদা-যুবকরা আজ এইভাবে পালন করছেন, সেই সমাজের 'ভবিষ্যৎ' দায়িত্ব আজকের 'intolerant' যুবকরা শতগুণ বেশি সুন্দরভাবে নিঃসন্দেহে পালন করতে পারবে।

বিদ্যাসংকট বিদ্বানসংকট এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যার্থীবিদ্রোহ কোনো অসংলগ্ন শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষানীতি বা যুববিক্ষোভের প্রকাশ নয়, বর্তমান সমাজের সুগভীর সামগ্রিক সংকটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সংযুক্ত। সমাজের বহুবিধ ইনস্টিটিউশনের মধ্যে বিদ্যালয় অন্যতম। সমস্ত ইনস্টিটিউশনের যখন ভগ্নদশা, তখন বিদ্যালয়ে চুনবালির প্রলেপ লাগিয়ে, বিদ্বানদের খেতাব দিয়ে এবং উপনিষদযুগের বিদ্যা বিদ্যার্থী ও গুরুর মহান আদর্শ প্রচার করে, অথবা বিদ্যার্থীবিদ্রোহ দমন করে সংকটের সমাধান হবে না। এই সমাজে বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্য, বিদ্যার বিশুদ্ধতা,

বিদ্যালয়ের দেবমন্দিরতুল্য পবিত্রতা প্রভৃতির কথা বলাও অর্থহীন প্রলাপ ও প্রগল্‌ভতা ছাড়া কিছু নয়। সমাজের গড়ন আগাগোড়া বদলাতে হবে, কারণ

> A society that drives its members to desperate solutions is a non-viable society, a society to be replaced.[৩৯]

বিদ্বানদের সেমিনার সম্মেলন, বিদ্বৎসভার ঘনঘন বৈঠকেও কিছু হবে না, কারণ এই সমস্ত সেমিনার সম্মেলন বৈঠক হল হোটেলম্যানেজার ও প্লাম্বিং কন্‌ট্র্যাক্টরদের সম্মেলনের মতো, যেখানে বিদ্বানরা পরস্পর স্বার্থান্বেষণে মিলিত হন ও সংযোগ স্থাপন করেন:[৪০]

> ...the conferences of learned societies are, in structure and intention, identical with trade conventions, like those, let us say, of the Association of Plumbing Contractors or the, Association of Hotel Managers. At those conferences...old friends get together, and valuable commercial contacts are made.

সমাধান সম্ভব শতমুখী শোষণপীড়নের সোপানবিন্যস্ত সমাজের আমূল পুনর্বিন্যাসে, এবং বহুযুগের শ্রেণীদাসত্ব থেকে বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর পরিপূর্ণ মুক্তিতে। বিদ্যা বিদ্বান বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থীদের মুক্তি তখনই সম্ভব, তার আগে নয়।

১৩৭৮ সন

১। Alfred von Martin : *Sociology of the Renaissance*, London, reprint, 1945, p. 37.

২। Edgar Snow : *Red China Today*, Pelican 1970, p. 254.

৩। M. Blaug edited : *Economics of Education* I, Penguin Modern Economics, 1968, p. 137.

৪। Institute of Applied Manpower Research (সংক্ষেপে IAMR), New Delhi, এই সংস্থার Working Papers এবং মুখপত্র *Manpower Journal* থেকে শিক্ষা-সংক্রান্ত (প্রধানত ভারতবর্ষের) এই ধরনের গবেষণার ফলাফল জানা যায়। এই প্রবন্ধের বিষয়ালোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই সংস্থার অনেক গবেষণাপত্রের ফলাফল ব্যবহার করেছি।

৫। *Economics of Education* 1 : 'The Concept of Human Capital pp. 13-64.

Economics of Education 2, Penguin 1969 : 'The International-Comparisons Approach to Education Planning. Developing Countries', pp. 11-97. Mark Blaug এই গ্রন্থমালা সম্পাদনা করেছেন। সম্প্রতি Blaug (Layard ও Woodhall-এর সহযোগিতায়) *The Causes of Graduate Unemployment in India* (London 1969) নামে বই লিখেছেন।

৬। Philip H. Coombs. *The World Educational Crisis—A System Analysis*, Oxford U. P. N. Y. 1968, p. 4.

৭। Teresa Hayter. *Aid as Imperialism*, Pelican 1971, Foreword, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বিস্তারের বর্তমান কৌশল বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা সম্বন্ধে একাধিক বই আছে, কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীমতী হেটারের তথ্যবহুল বইখানি এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

৮। 'Poverty in India' by V. M Dandekar and Nilakantha Rath in *Economic and Political Weekly* vol. VI, Nos. 1, 2, January 2, 9, 1971.

'A Configuration of Indian Poverty, Inequality and Levels of Living' by P. D Ojha in *Reserve Bank of India Bulletin*, January 1970.

৯। G. M. Young *Speeches by Lord Macaulay with His Minute on Indian Education*, London 1835, p. 359.

১০। Gunnar Myrdal: *Asian Drama*, vol III, Pelican edition, p. 1941.

১১। ভারত সরকারের পরিকল্পনা-দপ্তরের মুখপত্র *Yojana*, September 6, 1970, বিশেষ শিক্ষাসংখ্যা থেকে গৃহীত তথ্য।

১২। Some 349 million Indians are illiterate, even though literacy has increased from 17% in 1951 to 33% in 1968-69, according to the Union Education Ministry, reports PTI',—*The Statesman*, April 21, 1969. সেইজন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের আহ্বান করে বলেন, 'আপনারা এই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করুন।' শোনা যাচ্ছে, ১৮৫৭ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাকি ১৯৭০ সালে বিদ্যাসাগরের সার্ধশতবর্ষ থেকে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করেছেন ও তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম থেকেই তার আনুষ্ঠানিক পদযাত্রা আরম্ভ হয়েছে।

১৩। *Yojana*, October 19, 1969 : 'Report on the National Conference on Functional Literacy' (Calcutta, Sept. 1969) 'Functional literacy' আর 'literacy' এক নয়। শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়, তার সঙ্গে হিসাবনিকাশের কাজ চালানোর মতো অন্তত অঙ্কজ্ঞান থাকা দরকার। সেইজন্য 'functional literacy'-কে কেউ কেউ 'arithmetical literacy' বলেন।

১৪। Adam Curle : *Educational Strategy for Developing Societies*, London 1963, p. 86.

১৫। Gunnar Myrdal: *Asian Drama*, vol. III, Pelican 1968, p. 1669. এই নীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করে মিরডাল বলেছেন, 'We think that this approach is wrong'.

১৬। Philips H Coombs: *The World Educational Crisis, A System Analysis*: London 1968, pp. 18-19.

১৭। Coombs বলেছেন, 'a highly selective system, entailing, open competitive examinations, only *seems to be democratic*. *In practice it is not*, because of the *inherent social bias of the academic system...*' (বাঁকা হরফ আমার), *op. cit.* p. 32.

১৮। Anniversary Address of Dr. Atma Ram, Director-General of the Council of Scientific and Industrial Research, at the Indian National Science Academy January 2, 1971, Bangalore.

১৯। Mark Blaug, Richard Layard, Maureen Woodhall: *The Causes of Graduate Unemployment in India*, London 1969, p. 2.

২০। Mark Blaug *et al.*: *op. cit*, p 4.

২১। Mark Blaug *et al.*: *op. cit*, pp 241-44

২২। Coombs: *op cit*, pp 64-65.

২৩। Coombs: *op. cit.*, p. 65.

২৪। R. F. Peak and R. J. Havighurst: *The Psychology of Character Development*, N. Y. 1960.

২৫। C. L. Sapra: *Educational Wastage and Stagnation in India*, National Council of Educational Research and Training, New Delhi 1967

Gore, Desai and Chitnis edited: *Papers on The Sociology of Education in India*. N. C. E. R. T. New Delhi 1967.

২৬। Myrdal: *op. cit*, vol. III, ch. 33 secs. and 3. p 1669.

২৭। A. D. King: Elite Education and the Economy—I.I.T. Entrance 1965-70'—*Economic and Political Weekly*, August 29, 1970. pp. 1463-72.

২৮। Coombs: *op. cit* pp. 30-31.

২৯। Coombs: *op. cit.*, pp. 35-36

৩০। "In theory, the class rooms of the world should have ready access to the great and growing stockpile of human knowledge. In fact, however, a barrier stands between them and knowledge'—Coombs, *op. cit.*, p. 109.

৩১। Quoted in Ernst Fischer's *Art Against Ideology*, Penguin, Allen Lane 1969, p. 60.

৩২। *Encyclopaedia Britannica*, 13th ed., XIII, p. 532.

৩৩। Joseph Schumpeter: *Capitalism, Socialism and Democracy*, N. Y 1962, p 10.

৩৪। Irving M. Zeitlin: *Ideology and the Development of Social Theory*, E. Cliffs 1968.

৩৫। C. Wright Mills: *The Marxists*, N. Y. 1962.

৩৬। Coombs; *op. cit*, p. 109.

৩৭। Jerry Farber: *The Student As Nigger*, N. Y. 1970, p. 17.

৩৮। *Scranton Report* (1970) মূল সংস্করণ দেখার সুযোগ হয়নি। *Newsweek* (October 5, 1970) পত্রিকায় প্রকাশিত এই রিপোর্টের অংশ থেকে গৃহীত।

[illegible] Frantz Fanon's *Resignation letter* to the Resident Minister of [illegible]eria, 1956.

৪০। Theodore Roszak edited : *The Dissenting Academy*, Vintage N. Y. 1968, p. 16. আমেরিকান সমাজে ধনপতি শিল্পপতি, প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান ও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ, সে সম্বন্ধে তথ্যবহুল অনেক বই ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে এই বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য— James Ridgeway : *The Closed Corporation* : *American Universities in Crisis*, N. Y. 1968.

গ্রন্থপঞ্জি

পাদটীকায় উল্লেখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ, ১৯৬১-৭১-এর মধ্যে প্রকাশিত :

Eric Ashby : *Technology and the Academics* (N. Y. 1963)

Jacques Barsun : *The American University* (N. Y. 1968)

Erik H. Erikson (ed.) : *The Challenge of Youth* (N. Y. 1963)

Alvin Toffler (ed.) : *The Schoolhouse in the City* (N. Y. 1968)

George Brosan and others : *Pattern and Policies in Higher Education* (Penguin Education Special 1971)

A. H. Halsey and M. Trow : *The British Academics* (Faber 1970)

Layard, King and Moser : *The Impact of Robbins* (Penguin 1969)

C. M. Philips : *Changes in Subject Choice in School and University* (London 1969)

Burgess and Pratt : *Policy and Practice* : *The Colleges and Advanced Technology* (Penguin Allen Lane 1970)

G. S. Becker : *Human Capital* (Princeton 1964)

J. Victor Baldridge : *Power and Conflict in the University* (N. Y. 1971)

পরিশিষ্ট ১

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। ১৮০০–১৯০০

বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হল বাংলা দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের (প্রধানত হিন্দু) উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক, সমাজবৈজ্ঞানিক পটভূমি বিচার করা, সেই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটি সামাজিক বর্গ (এঁদের 'শ্রেণী' বলা নিষ্প্রয়োজন) হিসেবে এঁদের বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌ভূমি বিশ্লেষণ করা। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত সমাজবিজ্ঞান অনুসারী, কেন না একটা 'সামাজিক বর্গ' কিংবা 'সামাজিক স্তর' হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের যে ইতিহাস, তার বিশ্লেষণের সবচেয়ে ভাল উপায় হল সামাজিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ক্রমের কাঠামোর মধ্যেই তাঁদের স্থাপন করা। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ভেঙে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের উত্তরণের যুগে সমাজে যে-পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আবির্ভূত হলেন আজ যাঁরা 'আধুনিক' বুদ্ধিজীবী নামে অভিহিত। ভূসম্পত্তির স্থাণু বিন্যাস যেমন ভেঙে পড়ল, তেমনি মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীদের বংশপারম্পরিক স্থাণু বিন্যাসও ভাঙতে থাকল। আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের উপসর্গের উদ্‌ভবের সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভূত হল বুদ্ধিজীবীদের এক নতুন স্তর যা গতিশীল, যা নিছক বংশগৌরবেই বুদ্ধিজীবী নয়। জনৈক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, অর্থ এবং বুদ্ধির দ্বৈত ভিত্তির উপর এক উদারচেতন 'বুর্জোয়াশ্রেণী' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল নবীন বুর্জোয়ারা। অর্থাৎ, কিনা, কেবল 'অর্থ'ই নয়, 'বুদ্ধি'ও আধুনিক যুগের সামাজিক গতিবিন্যাস এক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করল। যেমন অর্থ, তেমনি বুদ্ধিও হয়ে উঠল সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতার এক নতুন নির্ধারক। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অপর একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী: 'গোড়া থেকেই এই আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর ছিল এক দ্বৈত সামাজিক চরিত্র। একদিকে তারা পুঁজির মালিক, অন্যদিকে তারা সেই সব ব্যক্তিরও মালিক যাদের একমাত্র পুঁজি হল শিক্ষা।' কিন্তু, তিনি আরো বলছেন যে এই শিক্ষিতশ্রেণী তত্ত্বগতভাবে আদৌ সম্পত্তিবানদের সমমতাবলম্বী নয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এইটাই বোধহয় ঐতিহাসিক অর্থে

'আধুনিক' বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। পুঁজিতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ, অথচ একটা সামাজিক বর্গ হিসেবে এঁদের তাত্ত্বিক প্রতিশ্রুতির বেশ খানিকটা স্বাধীনতা রয়েছে, যদিও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্তর, তার সজীবতা এবং অন্যান্য গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল সে-স্বাধীনতা। এটা একটা বহুবিদিত ঐতিহাসিক সত্য যে বুর্জোয়াশ্রেণীবিরোধী প্রগতিশীল—এমনকি 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশ এসেছেন আসল বুর্জোয়াশ্রেণী থেকেই। এই একটা ঐতিহাসিক সত্য থেকেই বোঝা যায় যে বুর্জোয়া যুগের তাত্ত্বিক বর্ণালী বুদ্ধিজীবীদের মনোনয়নের জন্ম কী বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সুনির্বাচিত সর্বোত্তম যে অংশটুকু, যাকে 'বশিষ্ঠ' বলা হয়, তাঁদের সংগ্রহ করা হয় কি ভাবে? ইতিহাসে দেখি তিনটি নীতি এক্ষেত্রে কার্যকর: শোণিত (blood), সম্পত্তি (property), সিদ্ধি (achievement)। সামন্ততান্ত্রিক এবং প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত ও গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রার যুগে, শোণিত অর্থাৎ কুলগত মর্যাদার আদর্শই ছিল প্রধান। পুঁজিতন্ত্রের প্রাথমিক দিনগুলিতে এই তিনটি আদর্শেরই একটা সংমিশ্রণ দেখা যায়, কিন্তু গণতন্ত্র যত উন্নত আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠল তত গণতান্ত্রিক ঝোঁকটা ক্রমশ 'শোণিত' থেকে 'সিদ্ধি'র দিকে সরে আসতে লাগল। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, আধুনিক গণতন্ত্র এই তিনটি আদর্শের মিশ্রণসঞ্জাত একটা যন্ত্র, যা বুদ্ধিজীবী বাছাই করে নিতে বেশ সুপটু।

এর থেকে একটা জিনিস আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্‌ভবের ব্যাপারে, লক্ষণীয়। বুদ্ধিজীবীদের নিয়োজনের ক্ষেত্রে বংশ অথবা সম্পত্তির বদলে সিদ্ধির আদর্শকে প্রাধান্য দিতে গেলে পূর্বশর্ত হিসেবে একটা কাজ পালনীয়। তা হল প্রগতিশীল গতিবান্ একটি সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিতে প্রাণবন্ত করে তোলা। দুর্ভাগ্যবশত, ঔপনিবেশিক শাসনের বিড়ম্বিত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায়—বা ভারতবর্ষের কোনো জায়গাতেই—এ ব্যাপার সম্ভব হয়নি। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণ, যা আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্‌ভব ও বিকাশের জন্ম অপরিহার্য, তা আমাদের দেশে সংঘটিত হয়নি। কেন না, এই উত্তরণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ-বিরোধী। যারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্পষ্টচিহ্নিত সামাজিক স্তর হিসেবে

ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রথম ঐতিহাসিক আবির্ভাবের ক্ষেত্র এই বাংলা। এই বাংলাতেই আবার দেখি, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপার্শ্ব কিভাবে এই স্তরের বিকাশকে ব্যাহত করল, কেমনভাবে বাধা পেল তার স্বাভাবিক বহুমুখী বিস্তার, এবং পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় তার প্রত্যাশিত ঐতিহাসিক ভূমিকা কী প্রচণ্ডভাবে খর্ব হল। পরবর্তী ইতিহাস-পুনরীক্ষণ থেকেই তা স্পষ্ট হবে।

২ ফেব্রুআরি, ১৮৩৫-এর ইংরেজিশিক্ষাসংক্রান্ত একটি মিনিট-এ মেকলে মন্তব্য করেছিলেন : "ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণী কথা বলেন ইংরেজিভাষাতে। উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত দেশীয়রাও সরকারী কাজকর্মে কথা বলেন এই ভাষাতেই। বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি সম্ভবত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে প্রাচ্যের সাত সমুদ্রেই।" শাসকশ্রেণীর মুখের ভাষা এবং গোটা প্রাচ্যের বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে অতএব ইংরেজদের মাতৃভাষাকে ধরে নেওয়া হল ভারতের 'দেশীয় প্রজাগণে'র পক্ষে 'একান্ত প্রয়োজনীয়'। এই মিনিটে অভিব্যক্ত মতামতের সঙ্গে পরিপূর্ণ ঐক্য বজায় রেখে বেন্টিঙ্ক ৭ মার্চ, ১৮৩৫ তারিখে ঘোষণা করলেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে-অর্থ আলাদা করে রাখা হয়েছে, তার একমাত্র সার্থক নিয়োজন হবে ইংরেজি শিক্ষাতে।" এর আগেই দেখা যায় মেকলে তাঁর মিনিটে স্বীকার করেছেন যে উচ্চশ্রেণীভুক্ত দেশীয়রা ইতিমধ্যে সরকারী কাজকর্মে শাসকশ্রেণীর ভাষাব্যবহার শুরু করে দিয়েছিলেন। এইসব সরকারী কাজকর্মের অন্যতম পীঠস্থান কলকাতা। উঠতি মুৎসুদ্দিরা ইতিমধ্যেই, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই অনুভব করতে পারছিলেন যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শাসকদের ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। কেননা এই সময়েই ওয়ারেন হেস্টিংস্ কলকাতাকে ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন, আর ১৭৭৪ সালে এখানে স্থাপিত হয় সুপ্রীম কোর্ট। লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে এই সময় থেকেই ইংরেজি ভাষাজ্ঞান কাম্য এবং প্রয়োজনীয় মনে হতে লাগল। আধাশিক্ষিত কয়েকজন ইউরোপীয়, এবং সুপ্রীমকোর্টের ব্রিটিশ অ্যাটর্নি ও উকিলদের কজন বাঙালি অবাঙালি উদ্যোগী দালাল—এরাই হল আমাদের দেশের প্রথম 'প্রসিদ্ধ ও পরিপূর্ণ ইংরেজি-বিদ্বান' ও 'শিক্ষক'। এই 'শিক্ষক'দের বেতন ছিল ষোল টাকার একটি পয়সা কম নয়। এদের ইংরেজিবিদ্যার পুঁজি বলতে পকেটনোটবুকে টুকে রাখা কয়েকডজন শব্দ। দেশের যে সব ভুঁই-ফোড় অভিজাতরা এদের কাছে ইংরেজি শিখতে আসত, তাদের শিক্ষা

সীমাবদ্ধ থাকত মুখস্থ করা কয়েকটা শব্দে। ইংরেজি ভাষায় যা তারা প্রকাশ করতে অক্ষম হত তা তারা প্রকাশ করত নানারকম সংকেতচিহ্নের সাহায্যে। প্রকাশের ব্যর্থতা পূরণের উপায় হিসেবে দেশীয়দের অনেকেই আশ্রয় নিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির। ইউরোপীয় প্রভুদের কাছে এইভাবেই তাদের বক্তব্য বোধগম্য হত। ইংরেজি ভাষায় এই সামান্য 'দখল' নিয়েই কিন্তু মুৎসুদ্দিরা যথেষ্ট পরিমাণে ধনার্জন করতে পেরেছিলেন—যা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাঁদের নবীন নাগরিক অভিজাতশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করল। ইংরেজি শিক্ষা—আমাদের মতো ঔপনিবেশিক দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের যা প্রায় অপরিহার্য উপাদান বলা চলে—এইভাবেই তার শুরু। এর পেছনে প্রধান অনুপ্রাণনা ছিল ব্রিটিশ বণিক্ এবং শাসকদের সেবা করার এবং আর্থিক লাভের। এই অনুপ্রাণনা ক্রমে বাড়তে থাকল—আরো প্রবল হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজি শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনা থেকেই শুরু হলো ইংরেজিশিক্ষার প্রসার। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণিত হলো তার মাত্রা।

ইতিমধ্যে বিহার এবং উড়িষ্যাতেও যৎসামান্য ইংরেজি শিক্ষা চালু করার চেষ্টা চলছিল। ১৮৪৪-এ স্থাপিত পাটনার সরকারী কলেজটি তুলে দেওয়া হল ১৮৪৭ সালে। ১৮৫৬ সালে আবার চেষ্টা করা হল একটি কলেজ স্থাপনের, কিন্তু আবারও তা ব্যর্থ হল, 'জনগণের অনীহার কারণে'। ১৮৪১ সালে স্থাপিত কটকের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টি ১৮৬৩ রূপান্তরিত হল একটি মাধ্যমিক কলেজে। আসামের ব্যাপারটা কিন্তু একটু অন্যরকম। ১৮৭৩ অবধি কিছুই পড়ানো হত না আসামের স্কুলে। ইংরেজি শিক্ষার এই প্রথম পর্বে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়পর্বেরও বেশ দীর্ঘ সময় জুড়ে বাঙালি আর অসমীয়ার মধ্যে কোনো প্রভেদই করা হত না।

১৮১৭ থেকে ১৮৫৭-এই চল্লিশ বছরে হিন্দু কলেজ, ডাফ স্কুল ও কলকাতার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি পাঠক্রম যাঁরা সম্পূর্ণ করেন তাঁদের সংখ্যা মোটামুটিভাবে ১২০০ (অর্থাৎ বাৎসরিক গড় হিসেবে ৩০ জন করে)। এদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন বাঙালী। দশ থেকে তেরো বছরে এক এক প্রজন্ম

(বিদ্যার্থীর), এই হিসেবে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের এই তিনটি বা চারটি প্রজন্ম ; এবং তারই সঙ্গে ঐতিহ্যসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ উদারচেতন পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কয়েকজন বিদ্বান্ (যথা বিদ্যাসাগর)— এঁরাই বাংলার সমাজজীবনে বেশ একটা নাড়া দিয়েছিলেন, যার অভিঘাত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমী উদারনৈতিকতার প্রেরণায় এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বুদ্ধিজীবীরা যে-প্রবল গতিশীল উৎসাহের সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকার্যে তাঁদের উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, উনিশ শতকের পরবর্তী-অর্ধের বিশ্ববিদ্যালয়জাত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা কদাচিৎ-দৃষ্ট। সে-প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি।

আঠেরো শতকের শেষপাদ থেকে, ইংরেজি শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্য ও উপযোগিতা যতই বাড়তে লাগল, ততই ক্রমশ অবনতি হতে থাকল ঐতিহ্যসম্মত শিক্ষার। বাংলায় সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান নবদ্বীপের ক্রমাবনতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের নিম্নোক্ত প্রতিবেদনই তার প্রমাণ :

১৮১৮ : উইলিঅম্ ওআর্ড : ৩১টি টোল, ৭৪৭ জন পণ্ডিত

১৮৩০ : এচ. এচ. উইলসন : ২৫টি টোল, ৫৫০ জন পণ্ডিত

১৮৩৫ : উইলঅম অ্যাডাম : উইলসনের হিসেব অনুমোদন করেন

১৮৬৪ : ই. বি. কাওএল্ : ১২টি টোল, ১৫০ জন পণ্ডিত

নবদ্বীপের টোল আর পণ্ডিতদের সংখ্যা এইভাবে কমে আসার কারণ বিবিধ। প্রথমত, ব্রাহ্মণকুল, যাঁদের মধ্য থেকে প্রায় এককভাবে পণ্ডিতদের নেওয়া হত, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁদেরই আগ্রহ ক্রমশ কমে আসতে লাগল। দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকদের ভাষায় শিক্ষালাভের ক্রমবর্ধমান বাজারদর এবং মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন জমিদাররা সংস্কৃত শিক্ষার আর্থিক পোষকতা ও নৈতিক সাহায্য যোগাতে গররাজি হলেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র খুব সুনির্দিষ্টভাবেই নবদ্বীপ থেকে সরে আসছিল কলকাতায়। দেখা গেল এমনকি গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও তাঁদের সন্তানদের নবদ্বীপের টোলের বদলে কলকাতার ইংরেজি শিক্ষালয়ে পাঠাতেই অধিকতর আগ্রহী। নবীন জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষাই যে এই আগ্রহের একমাত্র কারণ তা নয়, আসল কারণ হল ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের তাগিদ। এই কারণেই, অর্থাৎ চাকরির উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্যই, কলকাতার

প্রতিষ্ঠাপিত সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করতে হল। এবং তার জন্ম লড়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

বস্তুত ব্রিটিশের অধীনে প্রায় সমস্ত রকম চাকরিতে বাঙালীদের অধিকার ছিল প্রায় একচেটিয়া। ১৮৩০-৪০-এর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা আমূল সংস্কারপন্থী হিসেবে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ, যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত, এমনকি যাঁরা নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী, তাঁরাও প্রত্যেকে ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগী—ব্যবসায়, বাণিজ্যে এবং প্রশাসনে। ১৮৫৬-৫৭ পর্যন্ত সরকারী কাজকর্মে শিক্ষিত বাঙালীদের প্রায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা আভাস পাওয়া যাবে নিচের তথ্যগুলি থেকে :

সরকারী চাকরি : ভারতীয় ও প্রাদেশিক ১৮৫৬-৫৭

বিভাগ	মোট	বাঙালী	ইউরোপীয়	ভারতীয় (বাঙালী ব্যতিরেকে)
অর্থ, স্বরাষ্ট্র, সামরিক, পি-ডবলু-ডি জনশিক্ষা (পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌শন)	২৩৯	১১৭	১০০	১২
বাংলা সরকারের সচিবালয়	১২৭	৬৫	৫৯	৩
সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত	৪৮	৩৪	১১	৩
সদর রাজস্ব পর্ষৎ ..	৯৫	৫৮	২৫	১১
মহাগাণনিক (Accountant-General)-এর কার্যালয়	২০৫	১১১	৯০	৪
নয়টি বিভাগ ...	৭১৪	৩৮৫	২৮৬	৩৩

মনে রাখা দরকার ভারতীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির দপ্তর তখন সবই ছিল কলকাতায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরির এই হিসেব থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের ধারার একটি হদিশ মেলে। উঁচুতলার মোটা মাইনের সমস্ত চাকরিই সংরক্ষিত ছিল

ইংরেজদের জন্য আর মাঝামাঝি ও নিচুতলার প্রায় সমস্ত পদে অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় শিক্ষিত বাঙালীদের অধিকারই ছিল বেশি। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এই ধরনের অর্থনৈতিক উৎসাহ বিহার আসাম ও উড়িষ্যায় দেওয়া হয়নি। পূর্বভারতে বাংলার এই প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে যে এত শ্লথগতি, তার একটা কারণ সম্ভবত তাই।

১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত এই শেষ ৪৩ বছর বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষাপর্ব। প্রবেশিক পরীক্ষার ২৪৪ জন পরীক্ষার্থীর সীমিত সংখ্যা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। ১৮৮৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৩০০০। অর্থাৎ ২৫ গুণ বেশি। ১৮৫৮-র প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩। ১৮৮৯-এ গিয়ে তার সংখ্যা হল ১১৬৫। অর্থাৎ ৮০ গুণ বেশি। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ এই ২৩ বছরে গ্রাজুএটদের সংখ্যা বেগে গিয়ে দাঁড়াল ১৭১২। এর মধ্যে ১৪৯৪ জন বাঙালী। বাকি ২১৮ জন ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী, তার মধ্যে বিহারী আসামী এবং ওড়িয়ারাও আছেন। ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষা চালু হয় ১৮৬১ সালে। পরবর্তী কুড়ি বছরে, অর্থাৎ ১৮৮১-তে এফ্. এ. পাসের সংখ্যা ৪৭২৪, যার মধ্যে প্রায় ৩৮০০ জন বাঙালী। এম্. এ. পরীক্ষা প্রথম হয় ১৮৬১-তে, কিন্তু ১৮৬৩ সালে মাত্র ৬ জন পাস করে। ১৮৮১-তে মোট এম্-এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২৩, তার মধ্যে ৩৪৪ জন বাঙালী। ম্যাট্রিক্ পাস, এফ্. এ পাস এবং 'অ-সম্পূর্ণকারী'দেরও (non-finishers) বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র ১৮৮১ পর্যন্ত ১৭১২ জন গ্র্যাজুএটের কর্ম-সংস্থানের দিকে এবার তাকানো যাক্ :

সরকারী চাকরি	:	৫২৮
ব্যক্তিগত চাকরি	:	১৮৭
বেকার	:	৬৩৫
অজানা	:	৩২০
মৃত	:	৪২
		১৭১২

অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুএটদের প্রায় একতৃতীয়াংশ ১৮৮১ সালেই বেকার। এই হারে বেড়ে থাকলে শতাব্দীর অন্তে গ্র্যাজুএটদের মোট সংখ্যা নিঃসন্দেহে ৫০০০-এর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছিল এবং বেকারী-রেখাও নিশ্চয়ই আরো ঋজু হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষিতদের বাজারদরের পড়তিভাব এবং চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে

পড়ায় অনেকেই আইন, চিকিৎসা কিংবা শিক্ষকতার স্বাধীন বৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ল। উকিল আর শিক্ষকদের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে উঠল যে ১৮৭৫-৭৬ সালের মধ্যে এই বৃত্তিদুটিতেও জায়গা পাওয়া ভার হয়ে উঠল। অর্থনৈতিক সুযোগও আর রইল না তেমন। এই সময় সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয় যে আইনবিদ্ ও অন্যান্য শিক্ষিত লোকেরা, গ্রাম বা শহরের সম্পত্তি বা ব্যবসা থেকে যাঁদের অর্থোপার্জনের বিকল্প উপায় আছে, তাঁদের অবসর প্রচুর এবং তাঁরাই আকৃষ্ট হচ্ছেন রাজনীতির দিকে, চাইছেন রাজনীতিবিদ্ হয়ে উঠতে। বস্তুত ভারতের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক মঞ্চের—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের আগে ও পরে—প্রধান কুশীলবদের অধিকাংশই আইনবিদ্। যেমন, ১৮৯৩-৯৫-এ বঙ্গীয় আইন সভার ছ-জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে তিন-জন আইনবিদ্ (বাঙালী)। দুজন জমিদার (তার মধ্যে একজন হলেন পাটনা ডিভিশনের দ্বারভাঙার মহারাজা) আর অন্যজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৫-৯৭ এবং ১৮৯৭-৯৯-এ সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই ছিলেন আইনবিদ্। আধুনিক ওড়িশ্যার নির্মাতা নামে খ্যাত মধুসূদন দাস নির্বাচিত হয়েছিলেন ওড়িশ্যা থেকে, বিহার থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন শালিগ্রাম সিং। এঁরা দুজনেই আইনবিদ্।

বিহার ওড়িশ্যা বা আসামের শিক্ষিতদের মধ্যে তখনো কোনো চাকরি-সংকট দেখা দেয়নি—যেমন দিয়েছিল বাংলাতে। বিহার আর উড়িষ্যার ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাস হল পাটনা কলেজ আর কটকের রাভেন্‌শ কলেজের ইতিহাস। উভয় কলেজই স্থাপিত হয় উনিশ শতকের ষাটের দশকে। ১৮৬৩-তে পাটনা কলেজ স্থাপিত হওয়ার পরেও, ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, দেখা গেল, 'স্কুলের শিক্ষা থেকে কলেজের শিক্ষার প্রতি বিহারের দেশীয়দের মনোভাব বেশি বিরূপ।' বিহারের সবকটা কলেজ মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ১৯০০ সালে ছিল ২০৫। আর ১৮৯৮ সালে কলকাতার শুধু প্রেসিডেন্‌সি কলেজেরই ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬১। রাভেন্‌শ কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল ৯৭, সফল এফ্. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২। ১৯০৫ সালে বি.এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২। আসামের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। ১৮২৬ এ আসাম দখল করার পর তাকে বাংলা দেশেরই একটা অংশ হিসেবে, এবং অসমীয়াকে বাংলার একটা উপভাষা হিসেবে দেখা হতে লাগল। ১৮৭৩-এর আগে আসামের স্কুলে বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষাই শেখানো

হতো না। অসমীয়া ভাষা তার স্বাভ্য অধিকার লাভ করল ১৮৭৩ সালে। অসমীয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রথম প্রজন্মটির শিক্ষা প্রধানত কলকাতায় এবং শিক্ষিত বাঙালীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। উনিশ শতকের শেষ পাদেও উচ্চশিক্ষার বিস্তার আসামে একান্তই শ্লথগতি। ১৮৯৯-১৯০০-তে মাত্র একটি আর্টস্ কলেজ ছিল সেখানে—ছাত্র সংখ্যা তিরিশ। জ্যেষ্ঠ অসমীয়া পণ্ডিতরা সকলেই বাংলা দেশের কোনো-না-কোনো—প্রধানত কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও কুচবিহারের ভিক্টোরিআ—কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের এই সংকটে আরো একটা লক্ষণীয় দিক হল উচ্চশিক্ষায় 'অপচয়ের' সুউচ্চ অনুপাত। যেমন ১৯০২-৭ সালে ভারতের সমস্ত কলেজ মিলিয়ে ১৮০০০ ছাত্রের মধ্যে সফল গ্রাজুএটদের বাৎসরিক পাসের সংখ্যা মাত্র ১৯৩৫। তার মানে, শতকরা ৮৮ জনই মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, পাঠক্রম সাফল্যজনকভাবে শেষ না করেই। শুধু তাই নয়, খোদ শিক্ষাব্যবস্থাটাই ছিল অনুৎপাদক। এই অর্থে অনুৎপাদক যে তা আর্টস্-এর দিকে খুব বেশিরকমে একঝোঁকা। গোটা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান চারটি অনুষদে (faculty-তে) গ্রাজুএট ছাত্রদের শতকরা অনুপাত এইরকম: আর্টস্ ৮৫, বিজ্ঞান ২, চিকিৎসাবিজ্ঞান ৯, এন্‌জিনিআরিং ৪। আর্টস্ গ্রাজুয়েটদের মধ্যে যারা এক বা একাধিক বিজ্ঞানবিষয় নিয়ে পাস করেছিল তাদের শতকরা অনুপাত এইরকম: কলতাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬, মাদ্রাজ ৪৬, বোম্বাই ৩৪, এলাহাবাদ ২৫। বিজ্ঞানশিক্ষার এই চরম অবহেলনের কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অনুসৃত নীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে নীতি তারা গ্রহণ করেছিল, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন তাতে আদৌ অনুভূত হয়নি।

শাসক-শাসিতের সংযোগরক্ষাকারী,'দোভাষী' হিসেবে এবং এদেশে পশ্চিমী বুর্জোয়া উদারপন্থী চিন্তাধারার অগ্রসারক হিসেবে আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের যে-ভূমিকা, তার গঠনকল্পে এই আর্টস্-অভিমুখীন শিক্ষার অবদান অনেকখানি। ঠিক সেইটাই ছিল সকলের অভীপ্সা। সেই কারণেই চালু করা হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা, যার লক্ষ্য ছিল, মেকলের সেই ঐতিহাসিক উক্তিতে, এমন এক শ্রেণী বানানো 'যার বর্ণ এবং রক্ত ভারতীয়ের, কিন্তু রুচি, অভিমত, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ইংরেজের।' ইংরেজি উদারপন্থার 'সর্বাপেক্ষা অলংকৃত অভিব্যক্তি' মেকলে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতি বহুলাংশে ভারতের প্রতি তাঁর এই উদারপন্থী মনোভাবেরই পরিচায়ক। 'ব্রিটিশ শাসনের

শেষ পর্যন্ত এই মনোভাব ছিল অ্‌...' মেকলের নিকট-আত্মীয় ট্রেভেলীয়ন ভারতে ব্রিটেনের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আরো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি চাইবেই। এবং এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দুটো রাস্তা তাদের সামনে খোলা : হয় 'বিপ্লব' নয় 'সংস্কার'। 'সংস্কার'-পন্থা অবশ্যই ব্রিটিশ শাসকদের কাছে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষিত করে তোলাই এই পন্থাকে সফল করার প্রকৃষ্টতম উপায়। কেননা, ট্রেভেলীয়নের মতে, 'শিক্ষিত শ্রেণী স্বভাবতঃই আমাদের আঁকড়ে থাকবেন। এঁরা জানেন যে আমাদের আশ্রয়চ্যুত হলে ঐ-আদর্শের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন অসম্ভব।' এবং ইউরোপীয় জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব তাঁরা সহজেই বুঝবেন, যেহেতু তাঁদের নিজেদের স্থিতিশীলতার স্বার্থেই ভারতের মাটিতে 'ইউরোপীয় রীতিনীতিকে স্বভাবগত করে তোলা' প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসককুলের এই প্রত্যাশা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বেশ ভালভাবেই পূর্ণ করেছেন।

এই নীতিকে পরিপূর্ণভাবে সফল করার জন্য শিক্ষা—বিশেষত উচ্চশিক্ষা—হল কঠোরভাবে নির্বাচিত। উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণীগুলি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণগুলির সঙ্গেই তার গাঁটছড়া বাঁধা হল। বাংলা দেশে তো ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর বৈদ্য—এই তিন সমৃদ্ধিশালী উচ্চবর্ণ হিন্দুর একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হলো শিক্ষা। বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী, বণিক ও কারিগর-বর্ণগুলি এবং কৃষকেরা প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রায় কিছুই উৎসাহ দেখাত না। যে সামান্য আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা গেল, তাও টিঁকলো না বেশি দিন। শিক্ষিত মহলে এই বাস্তবজ্ঞানের সম্পাত ঘটল যে বর্ণগত ফারাকের সেতুবন্ধ হিসেবে সম্পদ বা শিক্ষা কোনোটাই যথেষ্ট নয়। ১৮৬৯-৭০ সালে প্রতিবেদিত হয়েছিল যে বণিক, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি যেসব শ্রেণীর জীবননির্বাহের স্বয়ংস্বতন্ত্র উপায় আছে তারা ক্রমশ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহ হয়ে উঠছিল। গত দশ বছরের ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডার কিংবা বাংলার কলেজগুলি সম্পর্কে পূর্বতন প্রতিবেদনগুলিতে সফল পরীক্ষার্থী-তালিকায় এইসব শ্রেণীর ও বর্ণের লোকেদের সন্তানদের নাম বিরলদৃষ্ট। স্বাধীন জীবননির্বাহে সক্ষম এই সব শ্রেণীর লোকদের সন্তানেরা ডিগ্রি, সাম্মানিকতা বা অন্য কোনো কলেজীয় বিশিষ্টতার জন্য পরীক্ষায়

বসার তাগিদ অনুভব করে না। শতকের শেষ অবধি এই অবস্থা রইল অপরিবর্তিত।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বা তাদের সৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরা কেউই জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। এমনকি বিদ্যাসাগরের মতো এতো বড়ো একজন শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজসংস্কারকও চাইতেন শিক্ষাকে উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে। ১৮৫৯-এ (১৯শে সেপ্টেম্বর: ১৮৫৯) বাংলা সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি: "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বাংলাদেশে শিক্ষা-বিস্তারের সর্বোত্তম—এবং হয়ত একমাত্র—উপায় হিসেবে সরকারের উচিত উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার করেই ক্ষান্ত থাকা।" মনে রাখতে হবে, শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাঙালী 'শিক্ষিত'দের মধ্যে বিদ্যাসাগরের অভিমতের মূল্য সরকারের কাছে ছিল সর্বাধিক। মেকলের বহুকথিত 'পরিস্রাবণ তত্ত্ব' (filtration theory) অতএব নেহাৎই মিথ্যে। ইংরেজি শিক্ষা পরিস্রুত হয়ে আদৌ নিম্নগামী হয়নি। গ্রামাঞ্চলের তার অনুভূমিক গতি সীমিত এবং উল্লম্ব (vertical) বিস্তার খুব বেশি রকমে বাধাপ্রাপ্ত, এই 'বাছাই-করা' নীতির দরুণ।

এইভাবেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জন্ম, পরিপুষ্টি এবং আকারধারণ। যে ভূমিকা এঁরা বেছে নিলেন, তাতে করে মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ট্রেভেলীয়নের স্বপ্নই হলো বাস্তবায়িত। 'বিপ্লব' নয়, 'সংস্কারে'র আদর্শকেই তাঁরা বরণ করে নিলেন সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এবং রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তিরও শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে। ট্রেভেলীয়নের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এঁরা ব্রিটিশ শাসকদের ছত্রচ্ছায়েই এই উন্নয়ন এবং বন্ধনমুক্তির কাজ সারতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। উনিশ শতকের সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত সংস্কার আন্দোলন এবং এমনকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও ইতিহাস থেকে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। খুব বেশি গভীরে না গিয়ে, কয়েকটি প্রধান বিশিষ্ট উপাদানকে বেছে নিয়ে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করব।

উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনের কোনো কোনোটা বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত হয়ে ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। আর, মঞ্চে তাড়াতাড়ি আবির্ভাবের দৌলতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এইসব আন্দোলন একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন। এসব আন্দোলনের সামাজিক মূলবস্তু এবং চরিত্র

কি ? রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহবিরোধী এবং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের সপক্ষে আন্দোলন ; হিন্দুধর্মবিরোধী এবং খ্রীস্টধর্ম-সমর্থক তরুণ ডিরোজিও-পন্থীদের আন্দোলন ; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ;—এ সবেরই উদ্ভব উচ্চশ্রেণীর এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা থেকে। দুর্নীতিগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধঃপতিত ক্রিয়াকলাপ থেকেই এসব সমস্যার সৃষ্টি। অন্যান্য শ্রেণীর সমস্যাবলীর ধারেকাছে তা কদাচিৎ পৌছয়। সুতরাং এইসব আন্দোলনের উদ্ভব বিস্তার-অভিঘাত একান্তই দুর্বল। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের গতি হল উষরবুদ্ধি অহমিকায়, এবং হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তা শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মেরই আবেষ্টনের মধ্যে একটা' উপসম্প্রদায়ের মর্যাদা পেল—আর পাঁচটা উপসম্প্রদায়েরই মতো। অতএব উচ্চশ্রেণী এবং উচ্চবর্ণের চৌহদ্দির মধ্যকার এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের সামগ্রিক সামাজিক লাভ সামান্যই, যদিও ব্রিটিশ উদারপন্থী বুর্জোয়া শাসকদের ক্রোড়চ্ছায়ে আমাদের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা লড়াই করেছিলেন ভালই। যে-ঝড় উঠল এর ফলে, উনিশ শতকের শেষ পাদে উদ্ধত নব্যহিন্দুয়ানীর উত্তালগর্জনে তার রেশ অনেকটাই গেল মিলিয়ে।

সমাজসংস্কার আন্দোলনের মতোই, আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম জন্মভূমি এবং বিস্তারকেন্দ্র বাংলাদেশ। 'পেশাওয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত' জনমত নির্ধারণ করতেন তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা। এবং আশির দশকে 'দেশের কণ্ঠস্বর ও মস্তিষ্ক' ছিলেন বাঙালী শিক্ষতশ্রেণী। এই কণ্ঠস্বর কি সুরে বাজত, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৬ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্‌ধৃত করছি : "ইংলণ্ডের মহারানী এবং জনগণের শাসনে সুসভ্য হইয়া অদ্য আমরা এইস্থানে সম্মিলিত হইয়াছি এবং কোনো প্রকার বাধাব্যতিরেকেই আপনাপন চিন্তার অর্গল উন্মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি। ব্রিটিশ শাসন, একমাত্র ব্রিটিশ শাসনেই ইত্যাকার ঘটনা সম্ভব (উচ্চরোল হর্ষধ্বনি)। এই কংগ্রেস কি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অথবা বিদ্রোহ লালনের প্রতিষ্ঠান (চিৎকার—না না) ; নাকি উক্ত সরকারের স্থিতিশীলতার ভিত্তিভূমিতে আরো একটি প্রস্তরখণ্ড যোজন (চিৎকার—হ্যাঁ, হ্যাঁ) ?"

এইভাবেই সত্য হয়েছিল ট্রেভেলিয়নের ভবিষ্যদবাণী। ইংরেজিশিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির দিশা খুঁজলেন

ব্রিটিশ শাসকদেরই আঁকড়ে থেকে, তাঁদেরই ছত্রচ্ছায়ে। গত শতকের শেষ পর্যন্ত, এমনকি বর্তমান শতকের প্রথম পাদেও, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এই আত্মীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি।

ব্যর্থ হল মেকলের ভবিষ্যদ্‌বাণী। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা দোভাষী হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের 'রুচি অভিমত নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ঠিক ইংরেজের মতো হল না'। তাঁরা হয়ে পড়লেন 'দো-আঁশলা' শ্রেণী—মধ্যযুগ আর আধুনিকযুগের এক বিচিত্র মিশ্রণ। পায়ের জোরে টিঁকিয়ে রাখা সামন্ততন্ত্রের এক প্রভাবশালী সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশেই যেহেতু তাঁদের বৃদ্ধি, সেইহেতু মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৩৬ সালে তাঁর পিতাকে মেকলে লিখেছিলেন যে 'আর তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলার মর্যাদাবান্ শ্রেণীর মধ্যে মূর্তিপূজকের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে শূন্য'। দুর্ভাগ্যবশত মেকলের এই পূর্বাভাষের একশো তিরিশ বছর পরেও মর্যাদাবান্ ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীগুলিতে পৌত্তলিকের সংখ্যা ভয়ংকর রকমের বিশাল। যতো দিন গেল, মধ্যযুগীয় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল উনবিংশ শতাব্দীতে—যে যুগকে আমরা নাম দিয়েছি 'রেনেসাঁসের যুগ'। জাতিভেদ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভেদপ্রবণতা, মূর্তিপূজা, বহু-ঈশ্বরবাদ, গোঁড়ামি—এইসব মধ্যযুগীয় ব্যাপারগুলোর একটি অথবা অপরটির কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলেন 'আধুনিক' বুদ্ধিজীবীরা, যাদের ইংরেজি শিক্ষার ওজন বেশ ভারী। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরা বহুদিন ধরে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারেননি। আর সম্ভবত এই দ্বন্দ্বের বোঝা আজও, স্বাধীন ভারতের এই পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার মধ্যেও, তাঁদের অন্তত একটা বড়ো অংশের ঘাড়ে চেপে রয়েছে।*

* লেখাটি Frontier সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়: 'The Role of Bengali Intellectuals—1800-1900' (29. 1. 72.). পরে 'সীমানা' নামে উক্ত পত্রিকার নির্বাচিত কয়েকটি রচনার অনুবাদ-সংকলনে (জুন ১৯৭২) বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ আমি করিনি। 'সীমানা'র অনুবাদ সামান্য সংশোধন করেছি মাত্র। —বি. ঘোষ

প্রমাণপঞ্জী

Ramcomul Sen : *English Bengali Dictionary*, Vol, 1, Calcutta 1834, Introduction.

J. N. Sarkar & J. C, Jha : *A History of Patna College*. Patna 1968.

The New Calcutta Directory_1856, III Section.

Bengal Directory & Calcutta Directory 1840 to 1856.

Convocation Address : Calcutta University: vol. I (1854-79) vol. II (1880-94)

Krishna Chandra Ray : 'Higher Education and the *Present Position of* the Graduates etc. (Hindoo Patriot, 23 Oct. 1882).

General Report of Public Instruction in Bengal, 1904-5.

W. Broth : General Report of Public Instruction in Assam, 1900-1901 (Shillong 1901)

Gopal Ch Dutt : 'The Educated Natives of Bengal' (Bethune Society Proceedings 1869).

অতিরিক্ত তথ্য

(ক)

ইংরেজি আর্টস কলেজ ১৮৮৫-৮৬ খ্রীঃ

প্রদেশের নাম	কলেজের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
১। মাদ্রাজ	১। ৩০	১। ২৬৮৮
২। বোম্বাই	২। ৮	২। ১০৪১
৩। বাংলা দেশ	৩। ২৬	৩। ২৯৯৮
৪। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	৪। ১৩	৪। ৪৪৮
৫। পঞ্জাব	৫। ২	৫। ৩০৭
৬। মধ্যপ্রদেশ	৬। ৪	৬। ৭৯
৭। বর্মা	৭। ১	৭। ২০
	মোট কলেজ ৮৪	ছাত্র ৭৫৮১
১৮৮৪-৮৫	ঐ ৭৮	ঐ ৬৭৮০

(Syed Mahmood : A History of English Education in India, 1781 to 18 93
Aligarh 1 895.

(খ)

বি. এ. ও এম. এ. পাস ছাত্রসংখ্যা

		বি. এ.	এম. এ.
১। মাদ্রাজ	১৮৮৬-৮৭ :	১৫৮	৩
	১৮৯১-৯২ :	৩১৬	৬
২। বোম্বাই	১৮৮৬-৮৭ :	৮১	৮
	১৮৯১-৯২ :	১৩২	৬
৩। বাংলা দেশ	১৮৮৬-৮৭ :	৩৬৯	৬৩
	১৮৯১-৯২ :	২৭৩	৪৬
৪। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	১৮৮৬-৮৭ :	৬৬	৬
	১৮৯১-৯২ :	১১২	১৫

৫। পাঞ্জাব	১৮৮৬-৮৭ :	২৪	×
	১৮৯১ ৯২ :	৪৫	২
৬। মধ্যপ্রদেশ	১৮৮৬-৮৭ :	১৩	১
	১৮৯১-৯২ :	১৯	৪

—সৈয়দ মামুদ-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(গ)

বৃত্তিশিক্ষার কলেজ ১৮৮১-৮২/১৮৮৪-৮৫

			আইন	চিকিৎসা	এঞ্জিনিয়ারিং
মাদ্রাজ	১৮৮১-৮২ :	কলেজ	১	১	১
		ছাত্র	১১২	৭৬	৯
	১৮৮৪-৮৫ ·	কলেজ	১	১	১
		ছাত্র	১২৭	১১৬	১৯
বোম্বাই	১৮৮১ ৮২ ·	কলেজ	১	১	১
		ছাত্র	১৩৬	২৮৩	১৫১
	১৮৮৪-৮৫ :	কলেজ	১	১	১
		ছাত্র	১৮০	৩৭০	১৮৪
বাংলা দেশ	১৮৮১-৮২ :	কলেজ	৭	১	১
		ছাত্র	২৭০	১১৭	১৭০
	১৮৮৪-৮৫	কলেজ	৭	১	১
		ছাত্র	১২৫	১৩২	১৪৯

—সৈয়দ মামুদ-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(ঘ)

মুসলমান ছাত্রসংখ্যা/স্কুলে-কলেজে/১৮৮৬-৮৭ ও ১৮৯১-৯২

		মোট মুসলমানদের শতকরা অংশ	আর্টস কলেজ	বৃত্তিশিক্ষা	উচ্চ-বিদ্যালয়
মাদ্রাজ	১৮৮৬-৮৭ :	৬·৩	ছাত্র ৫০ (১·৬%)	ছাত্র ৪ (১·১%	ছাত্র ৩৪৫০ (৫·২%)
	১৮৯১-৯২ :	(১৮৯১ সেন্সাস)	ছাত্র ৫৬ (১·৫%)	ছাত্র ১১ (১·৭%	ছাত্র ৩৮১৪ (৫·৩%)

বোম্বাই ১৮৮৬-৮৭ : ১৬.৩ | ছাত্র ২৫ (২.৬%) | ছাত্র ১০ (১.৪%)
| ছাত্র ১৬৫৭ (৪.৪%)
১৮৯১-৯২ : ছাত্র ৩৫ (২.৬%) | ছাত্র ৯ (১.৮%)
| ছাত্র ২১১৭ (৪.৯%)

বাংলা দেশ ১৮৮৬-৮৭ : ৩২.৯ | ছাত্র ১৩৮ (৪.৩%) | ছাত্র ৬৩ (৪.৫%)
| ছাত্র ২২,২৭১ (১২.১%)
১৮৯১-৯২ : | ছাত্র ২৯৯ (৫.৭%) | ছাত্র ৩৭ (৩.৫%)
| ছাত্র ২৭,৪৬১ (১৩.৫%)

—সৈয়দ মামুদ-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

পরিশিষ্ট ৩

উড়িষ্যার প্রথম এন্‌ট্রান্স-পাস বাঙালী বাবু

এই সময়ে কাছারিতে একদিন শোনা গেল একজন বাঙালীবাবু এন্‌ট্রান্স পাস করে বালেশ্বরের ইংরেজি স্কুলের থার্ড মাস্টার হয়ে এসেছেন। এর আগে এন্‌ট্রান্স পাস কথাটা বালেশ্বরে অজানা ছিল। হেডমাস্টার ও সেকেণ্ড মাস্টারেরা এন্‌ট্রান্স পাস করা ছিলেন না। মনে পড়ছে এর আগের বছর হতে এন্‌ট্রান্স পাস করার বেওয়াজ আরম্ভ হয়েছিল। কাছারির আমলারা ভাবলেন ইংরেজিতে এনট্রান্স পাস যে করতে পারে সে না জানি কোন্ মহাপুরুষ। কাছারি বন্ধ হওয়ামাত্র সমস্ত উকিল, মোক্তার ও মামলতকার, সেরেস্তাদার পেশকার ও অন্যান্য আমলারা কেউ পাল্‌কীতে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, অধিকাংশ পায়ে হেঁটে গিয়ে মাস্টারের বাসাবাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। মাস্টারের বাসাবাড়ি ইংরেজি স্কুলের নিকট দামোদরপুর গ্রামের পথের ধারে ছিল। বাসাবাড়িটি সাত পাঁচ বলতে একটি ঘর, সেই ঘরের একটি কোণের দিকে অর্ধেক দেওয়াল দেওয়া রান্নাঘর। প্রবেশদ্বার একটি, সামনে একহাত চওড়া বারান্দা, ঘরটিকে ঘর বা ঝুপড়ি যা ইচ্ছে নাম দেওয়া যেতে পারে। মাসিক ভাড়া বোধহয় আট আনার মধ্যে হবে। মাস্টারবাবুর বাসার সামনের ছাঁচতলা হতে সাধারণের চলাচলের রাস্তা অবধি জনতায় পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে মাস্টারবাবু মুশকিলে পড়লেন। অভ্যাগতদের বসতে বলবেন আসন তো দূরের কথা, জায়গা কোথায়? লোকেদের দেখে মাস্টারবাবুর মনে বোধকরি কিছু গর্ব হয়েছিল।

আধময়লা একটি ছিটের কোর্তা গায় দিয়ে আর হাঁটুঢাকা একটি থান কাপড় পরে গম্ভীরভাবে বারান্দায় টহল দিতে লাগলেন। দর্শকেরা দেবদর্শন করার তুল্য তাঁকে একদৃষ্টে দর্শন করলেন। মাস্টারবাবুর বয়স, উনিশ-কুড়ির মধ্যে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বুকের পাঁজরা হাড় গোনা যায়। চেহারা কিছু অসুন্দর, তা হোক কত গুণ? মানুষ তো আর রূপে বিকোয় না, গুণে বিকোয়। তিন-চার দিন অবধি মাস্টারের দরজায় ভিড় জমেছিল, তারপরে ক্রমশ কমে গেল।

পরের বছর বালেশ্বর গভর্নমেণ্ট ইংরেজি স্কুল হতে একজন ছাত্র এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হল। তাঁর নাম ছিল রাধানাথ রায়। কবিবর রাধানাথ রায় ছিলেন বালেশ্বর জেলার সর্বপ্রথম এনট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।*

'আত্মচরিত' ফকীরমোহন সেনাপতি, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

পরিশিষ্ট ৪

বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যবিত্ত বাঙালী

বাঙালী বিদ্যোৎসাহীরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বিদ্যার ডিগ্রিকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই বিষয়ে Sir Henry Sharp ৬ মার্চ ১৯২৫, লণ্ডনের 'রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস'-এ একটি ভাষণ (paper) দেন। সোসাইটির জার্নালে (April 17,1925) এই ভাষণটি প্রকাশিত হয়। হেনরি শার্প ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন এবং বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় University Acts তাঁরই পরিকল্পনানুযায়ী গৃহীত হয়েছে। কাজেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাঁর ভাষণটির শিরোনাম 'The Development of Indian Universities'. ভাষণের সূচনাতে তিনি বলেন :

"The University in India is an affair not only of educational, but also of economic and political interest. It is a cause of self-congratulation to the Government as a

* রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর। উৎকল নিবাসী বঙ্গীয় কায়স্থ। প্রথমে বাংলায় কবিতা লিখতেন। পরে ওড়িয়াতে কবিতা লিখে বিখ্যাত হন। 'মহাযাত্রা' নামক মহাকাব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

whole, of some anxiety to the guardians of the public purse and of deep distrust to those who are nothing but disaster in the extension of learning. Its buildings serve as a prominent adornment for the cities, its councils as a convenient platform for the budding politician and its organisation as a subject of keen debate for the legislatures. Above all, *it is the pride and darling of the middle class.* The lad of this class in Bengal learns from his cradle to look towards the Senate House of Calcutta as a Mecca which will secure him his Passport to Paradise. Paradise may mean in the end a thriving practice in law or medicine, a High Court Judgeship or a responsible post in the administration of the country. Or it may mean a clerkship of £40 a year. Any-way it means something, presents endless possibilities and is intensely alluring. Hence the University has attained surprising popularity. In 1914, Bengal, with a population equal to that of the United Kingdom, contained likewise an equal number of University students."

(বাঁকা অক্ষর বর্তমান লেখকের)

পরিশিষ্ট ৫

গবেষণার মান ও 'ডক্টর' ডিগ্রি

'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিশেষ করে শেষ অধ্যায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' ডিগ্রিধারীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যে কেউ-কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কোনো মন্তব্য কোনো লেখকই সর্বজনপ্রযোজ্য মনে করেন না। যোগ্য 'স্কলার' অবশ্যই অনেকে আছেন। সাধারণত আধুনিক গবেষণার অতিদ্রুত অধোগামিতা লক্ষ্য করেই এই মন্তব্য করা হয়েছে। এটা কেবল আমাদের দেশে নয়, ইয়োরোপ ইংলণ্ড আমেরিকাতেও এই লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। আমার মতামতের সমর্থনে

The Times Literary Supplement পত্রিকার সাম্প্রতিক অভিমত উদ্ধৃত করা হল :

" ··Comments in the *Times Literary Supplement* were explicit enough.

"Here are parts of the warning or diatribe. 'The doctoral thesis is too often approved, written, accepted and even published without in any way, adding to, the sum of knowledge. Twenty or thirty years ago it was something of a rarity in this country. All that is now changed. As in the sciences, so in the humanities, the doctorate has become an important qualification for almost any worthwhile teaching or research job. .. Tangible results are demanded by the hard-headed people who make appointments and promotions in the academic world or give grants, and tangible results are more and more taken to mean publications in question. The present trend is a deplorable one, it clogs the libraries and the periodicals with unwanted and uninspired written matter ; it debases standards and blocks our access to the sort of writing which really does add something to our knowledge or experience. It penalizes the truly original but slow-germinating worker.'

"If the situation in England is 'deplorable', here it is disastrous. And since thesis-writers love to see themselves in print—a bonanza for publishers with an eye on the main chance—'publish or perish' has changed into 'publish and perish'. It is ironic that while in the West the bluff has been found out, here in the name of raising standards, we are bent upon repeating the folly, till the doctorate comes down to the level of B. A. Pass. The monkey and the parrot die hard in man.···"

[B. N. Prasad : Doctor or Disease ? *The Statesman*, January 18, 1978]

পরিশিষ্ট ৬

উনিশ শতকের গ্রন্থাগার

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দান অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে স্থাপিত এরকম প্রাচীন গ্রন্থাগারের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন কলকাতার 'জাতীয় গ্রন্থাগার' (১৮৩৬)। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি নানারকম বিবর্তন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান 'জাতীয় গ্রন্থাগারের' রূপ নিয়েছে। এ ছাড়া মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ পাঠাগার (১৮৫২)—আগের নাম মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি, কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৮), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯), শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩), শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭৪), তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮২), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি (১৮৮৩), বালি সাধারণ গ্রন্থাগার (১৮৮৫), চৈতন্য লাইব্রেরি (১৮৮৯), আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (১৮৯১), আগের নাম 'কটেজ লাইব্রেরি', বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১) প্রভৃতি উল্লেখ্য পাঠাগার। এরকম গ্রন্থাগার আরও অনেক আছে বাংলা দেশে। এগুলির ইতিহাস এবং গ্রন্থতালিকা সংকলিত হলে প্রকৃত গবেষকরা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন। সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও, শিক্ষা ও গবেষণাপ্রধান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থাগারের উল্লেখ এখানে করা হয়নি। অথবা অনেক প্রাচীন পরিবারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথাও বলা হয়নি।

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থাগারের এত প্রসার হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষিত ব্যক্তিরা, এমন কি পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান গবেষকরাও, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্পদের খোঁজ রাখেন না। সামগ্রিক বিষয়ানুগামী গ্রন্থতালিকা (Bibliography) ছাড়া খোঁজ রাখা কোনো অনুসন্ধানীর পক্ষে সম্ভবও নয়।

আমরা এখানে কলকাতার কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের উল্লেখ করছি। চৈতন্য লাইব্রেরি (পৃষ্ঠা ১১০-১৪ দ্রষ্টব্য), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, ভারতী পরিষদ, মদনমোহন লাইব্রেরি (১৯২০) প্রভৃতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-তালিকা আমি স্বচক্ষে দেখে বিস্মিত হয়েছি, কারণ এগুলির প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকার সম্ভার যে-কোনো গবেষকের কাছে আকর্ষণীয়।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি

১৮৮৩

ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে বে-সরকারী ইংরেজ মহল যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন উত্তর কলকাতার কয়েকজন যুবক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ জনগণের মধ্যে প্রচার করতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে ১৬ জুন ৩নং রাধামাধব গোস্বামী লেনের দোতলায় ঘর ভাড়া করে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রথম সম্পাদক), আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকমল দাস এবং আরও অনেকে। প্রথম সভাপতি ছিলেন গোপাললাল মিত্র। প্রথম মাস তিনেক কোনো বই যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। নামমাত্র মূল্যে বা বিনা মূল্যে ৩৩ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তৎকালের প্রখ্যাত লেখকরা তাঁদের লেখা বই দান করেন। এক বছরের মধ্যে সদস্যসংখ্যা বেড়ে যায় এবং গ্রন্থসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮৫ খানি। ছোট ঘরে স্থানের অভাবে ১৫ মে ৩নং রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়।

১৮৯৩

দশ বছরের মধ্যে গ্রন্থ আর সদস্যসংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি নিজস্ব বাড়ি কেনার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ৬ নভেম্বর পাশেই একটি জমি কেনা হয় এবং ১৮৬০ সালের সোসাইটি অ্যাক্টের ২১ ধারানুসারে গ্রন্থাগার রেজেস্ট্রি করা হয়।

১৮৯৯

গ্রন্থাগারের দুই স্তম্ভ সভাপতি গোপাললাল মিত্র ও সম্পাদক উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে ২৯ এপ্রিল ও ১১ অক্টোবর লোকান্তরিত হন। পরের বছরে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রন্থাগারের বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। সেই দুর্দিনে হরিবল্লভ বসু ৫৭নং রামকান্ত বোস স্ট্রীটে (বর্তমানে বলরাম মন্দির) তাঁর বাড়িতে বিনা ভাড়ায় স্থান দিয়েছিলেন। এই বছরেই গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারে সর্ববিধ সাহায্য করেছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বিশ্বম্ভর মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, উপেন্দ্রনাথ সাউ, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত এবং আরও অনেকে।

১৯০১

১ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ২৫।১ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। কম্বুলিয়াটোলা বয়েজ রীডিং ক্লাব ও জোড়াসাঁকো লাইব্রেরি এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয় (১৯০৪)।

১৯৩৩

১৫ জুন থেকে ২০ জুন গ্রন্থাগারের 'সুবর্ণ জয়ন্তী' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্জিলিং থেকে আশীর্বাণী পাঠান। অধিবেশন উৎসবে আসেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় এবং আরও অনেক সুখ্যাত সাহিত্যিক।

১৯১৫

এই বৎসরে গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়িটি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট দখল করেন। কত অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে গ্রন্থাগারকে ২২নং লক্ষ্মী দত্ত লেনের ভাড়া বাড়িতে সরিয়ে আনতে হয়। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট বর্তমান জায়গাটি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করেন (১৯৩৯) বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৪০ আগস্ট মাসে ২ কে. সি বোস রোডের নিজস্ব বাড়িতে গ্রন্থাগার স্থিতিলাভ করে।

কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট ১৮৮৪

উত্তরপশ্চিম কলকাতার একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম মণিলাল মজুমদার, রাজশেখর বসু, হরিদাস মিত্র অক্ষয়কুমার ঘোষ। প্রথমে 'রিডিং-রুম অ্যাণ্ড লাইব্রেরি' বলা হত, পরে ১৮৮৷ সালে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার সময় নাম হয় 'কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট'। ১৯১৷ সালে ইনস্টিটিউটের নতুন গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়। ইনস্টিটিউটের সং যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার এন. এন. ঘো (ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক), কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হেমচন্দ্র মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় ভগব শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতী পরিষদ ১৮৯০

১৮৯০ সালের ২৯ নভেম্বর শ্যামবাজার এলাকার কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র তাঁদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একটি গ্রন্থাগার শুরু করেন। ৮৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমানে বিধান সরণি)-এর একটি ঘরে এর উদ্‌বোধন হয়, নাম 'অ্যালবার্ট লাইব্রেরি'। প্রথম উদ্যোক্তা ও সভ্য—ক্ষেত্র গুপ্ত, সতীশ গুপ্ত, কালী পাণ্ডে, নলিনবিহারী মিত্র, তারাপদ সেন এবং আরও কয়েকজন।

প্রথম তিন বছরে দুবার জায়গা বদল করে লাইব্রেরি একবার আসে ৯১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, তারপর ঐ রাস্তারই ৮৭ নম্বর বাড়িতে। ১৮৯৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলিস ইনস্টিটিউশন-এর (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) হলে। সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রধান বক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই এই বিখ্যাত সভাটি হয়েছিল।

এই সময়েই সিকদারপাড়ায় 'যমুনা লাইব্রেরি' গড়েছিলেন বিখ্যাত অভিধান সংকলক সুবলচন্দ্র মিত্রের দুই ভাই—নন্দ মিত্র ও অক্ষয় মিত্র। ১৮৯৪ সালে দুটি গ্রন্থাগার মিলে তৈরি হল 'অ্যালবার্ট-যমুনা লাইব্রেরি'। পৃষ্ঠপোষক হলেন শোভাবাজারের মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সভাপতি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সি. আর. উইলসন এবং সহ-সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন। উইলসনের চেষ্টায় গ্রন্থাগারটি ক্রমশই উন্নত হয়, নতুন নাম দেওয়া হয় 'কর্নওয়ালিস ইউনিয়ন ক্লাব অ্যাণ্ড লাইব্রেরি', এবং গ্রন্থাগারটি উঠে আসে ১৩৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। ১৮৯৭ পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি এখানেই ছিল। নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন কুচবিহার, ময়ূরভঞ্জ ও দিনাজপুরের মহারাজা এবং ঢাকার নবাব বাহাদুর। আর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাংলার লেফটানাণ্ট-গভর্নর স্যার ই. আর. বেকার, স্যার রোপার লেথব্রিজ, স্যার এ. পেডলার, রেভারেণ্ড জে. মরিসন, রেভারেণ্ড এইচ. ওয়াইটহেড, ফাদার লাফোঁ, এইচ. আর. জেম্‌স্‌, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেন্দ্রলাল সরকার।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকে গ্রন্থাগারের অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে। বারকয়েক জায়গা বদল করা হয়—৮৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, তারপর

ক্ষেত্র গুপ্তের বাড়িতে, ১২৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। কর্মীরা চিরদিনই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতেন। মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, গণেন্দ্রনাথ মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ইত্যাদির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯১৭ সালে গ্রন্থাগার তার বর্তমান বাড়িতে (৬, আর. জি. কর রোড) উঠে আসে। তখন থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এর সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইউনাইটেড রিডিং রুম্‌স

১৯১৬ সালের রিপোর্ট থেকে এই পাঠগারের ইতিহাস সংকলন করা হল:

'The present Library was formed by the amalgamation of two old and sister Institutions—The Calcutta Reading Rooms and the Ahiritola Reading Rooms. The former founded on the initiative of late Babu Rajendra Lal Mitter as far back as 1872, was the pioneer institution of its kind in the Northern Division of the town, and counted amongst its members distinguished men like the late Ramesh Chandra Mitter, the late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, the late Maharaja Kamal Krishna Bahadur, the late Raja Digambar Mitter, the late Mr. W. C. Bonnerji, Rash Behari Ghosh, and Gurudas Banerjee.

(3)

"The Ahiritola Reading Rooms owed its origin to the indefatigable exertions of a number of educated energetic men of the locality. It was established in 1891 and within a few years of its existence its promoters were able to provide a decent Library with a free Reading Room for public use. A plot of land was acquired

at the junction of Nimtolla Ghat Street and Gour Laha Street, with a view to endow it with a local habitation of its own. Eventually it was decided to amalgamate the two Libraries existing in the same locality and the 'United Reading Rooms' was the result of such amalgamation…

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৮২

স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যানুরাগী যুবকের প্রচেষ্টায় 'তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি' ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৭৯ সাল থেকে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলতে থাকে। প্রথম উদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র। তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের প্রথম সম্পাদক এবং হেমচন্দ্র ঘোষ প্রথম গ্রন্থাগারিক।

১৮৮৭ সালে পাঠাগারের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর তিনি পাঠাগারের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা এবং সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলি' পত্রিকা পাঠাগারে বিনামূল্যে দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ এই পাঠাগারের সঙ্গে আজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্তমানে পাঠাগারটি নিজের নামের রাস্তার উপর, ১১ বি তালতলা লাইব্রেরি রো-তে, নিজের দ্বিতল গৃহে অবস্থিত।*

---

* 'ভারতী পরিষদ' গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী শ্রীনিমাই ঘোষ এই পাঠাগারগুলির তথ্য সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। —বি. ঘো.

নির্ঘণ্ট